অবধূত-সংবাদ

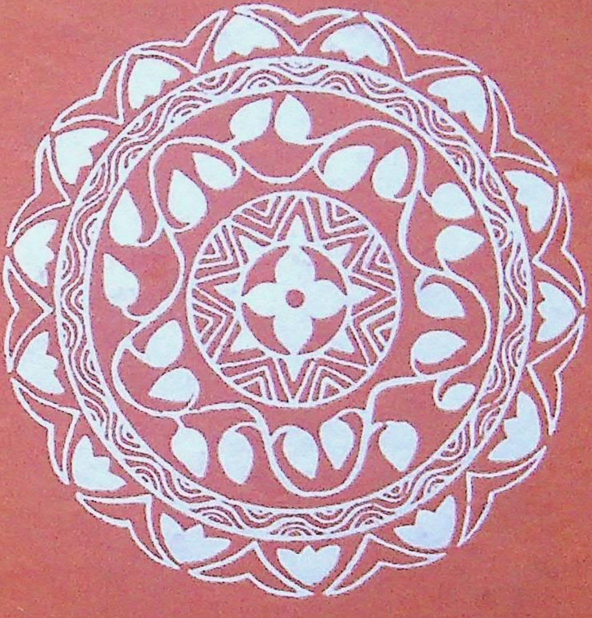

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অবধূত-সংবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত— একাদশ স্কন্ধ

সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়

(মূল, বঙ্গানুবাদ এবং টীকাসম্মত ব্যাখ্যা)

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল :
প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৯০
দ্বিতীয় সংস্করণ : জন্মাষ্টমী ১৪০৩

সর্ব্বস্বত্ব :
শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক :
শ্রীবিভূতি ভূষণ সরকার
পি ৮২ সি আই টি রোড,
স্কিম নং ৬ এম
কলিকাতা-৭০০০৫৪

মুদ্রণে :
অবিনাশ রায়
শান্তি প্রেস
১ নারিকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড
কলিকাতা-৭০০০১১

প্রাপ্তিস্থান :
প্রকাশকের নিকট

শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
বাগানিয়া পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৩

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

উৎসর্গ

আমার জীবনের প্রতি ক্ষণে যাঁর অফুরন্ত স্নেহপরশে ধন্য হয়েছি

ও

স্বতঃস্ফূর্ত্ত আশীর্ব্বাদে পুষ্টিলাভ করেছি

সেই প্রাণসর্ব্বস্ব পরমারাধ্য পিতৃদেবকে—

'মাধব'

আকৃতি

'অবধূত-সংবাদ' শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে একাদশ স্কন্ধের সপ্তম, অষ্টম ও নবম—এই তিনটি অধ্যায়ের সংবাদ। শ্রীএকাদশস্কন্ধকে শ্রীগোবিন্দের ললাটদেশ বলা আছে। ললাটে ভাগ্যরেখা আঁকা থাকে প্রবাদ আছে। ভাগ্যরেখা অর্থাৎ অদৃষ্টরেখা। অদৃষ্ট বলতে বুঝায় যা দেখা যায় না। শ্রীএকাদশের সংবাদ হচ্ছে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদ যার অপর নাম উদ্ধবগীতা। এই ভাগবতীয় সংবাদও তেমনি অদৃষ্ট—যাকে দেখা যায় না, ছোঁওয়া যায় না। তবে ভাগ্যবানের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত দৃষ্টিতে এটি ধরা পড়ে। এই ভাগ্যবান কারা? শ্রীগুরুকৃপায় যাদের প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে সেই ভাগ্যবান জনে দেখে। কি দেখে? ভগবানের তত্ত্বকে দেখে মানে অনুভব করে, উপলব্ধি করে, আস্বাদন করে। কারণ 'দৃশ্' ধাতুর একটি অর্থ হয় 'জ্ঞান'।

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ বক্তা আর তাঁর পরমপ্রিয় সখা শ্রীউদ্ধবজী শ্রোতা ও প্রশ্নকর্ত্তা। উদ্ধবজী তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। তাই ভগবান প্রাণ খুলে নিজের তত্ত্বকথা তাঁর কাছে বলেছেন। প্রাজ্ঞ শ্রীমান্ উদ্ধব সেটি প্রেমভরে গ্রহণ করে শুধু ধন্য হয়েছেন তাই নয় আস্বাদনে ভরপূর হয়ে গিয়েছেন। মধুসূদনের মধুচক্র থেকে মধু ঝরে ঝরে পড়েছে আর উদ্ধবজী লুব্ধ মধুকরের মত সে রস আকণ্ঠ পান করেছেন। ভগবান নিজের লীলাকথা নিজে বলতে পারেন না কিন্তু তত্ত্বকথা বলতে তো তাঁর কোন অসুবিধা নেই। কারণ তাঁর দুর্ব্বোধ তত্ত্ব জগতে জানাবার জন্যই তো গোলোক বৈকুণ্ঠ হতে তাঁর অপ্রাকৃত তনুকে এই প্রপঞ্চ জগতে আবির্ভূত করিয়েছেন। এ কথা শ্রুতিস্মৃতি প্রসঙ্গে বলা আছে।

হরিকথারসামোদী শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীদশমের নব্বই অধ্যায়ে প্রাণভরে শ্রীগোবিন্দের ঐশ্বর্য্যময়ী ও মাধুর্য্যময়ী লীলাকথা শ্রবণ

করিয়েছেন এবং নিজের কৃপাপ্রভাবে সে লীলারস আস্বাদন করিয়েছেন যাতে মহারাজ পরীক্ষিৎ সে রসপানে বিভোর হয়ে আছেন। হঠাৎ শ্রীশুকদেবের চমক লাগল—তাই তো, লীলারসের আস্বাদন তখনই মধুর হতেও অতি সুমধুর হবে যখন হৃদয়ে তত্ত্বের অববোধ হবে। তাই কথা সমাপ্তির কিছু আগে এই তত্ত্বকথা আরম্ভ করেছেন। রাজার কাছ থেকে শ্রীশুকদেব বিদায় নেবেন। মহারাজের অন্তিমকাল প্রায় এগিয়ে এসেছে—সাত দিন পরমায়ুর প্রায় পরিসমাপ্তি। শ্রীশুকদেব তাই বিদায় নেবার আগে মহারাজের চিত্তটিকে তত্ত্বের বাঁধনে বেঁধে দিয়ে গেলেন। হৃদয় যেন এতটুকু বিচলিত না হয়। কে কার পুত্র, কে কার পিতা—এ সংসার মায়ার খেলা—আসা যাওয়া শুধু দুদিনেরই খেলা। শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখের উক্তিটি উদ্ধবজীর কাছে—শ্রীশুকদেব সেটিকে মহারাজের হৃদয়ে ভাল করে গেঁথে দিয়ে গেলেন।

ত্বং তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্‌ বিচরস্ব গাম্॥

—ভাঃ ১১।৭।৬

মহারাজের চিত্ত প্রস্তুত। তাই অন্তিমকালে স্নেহময়ী জননীর আগমনেও চিত্ত বিচলিত হয় নি এতটুকু। শ্রীশুকদেব মহারাজকে তৈরী করে দিয়ে সভা ত্যাগ করেছেন। এটি শ্রীগুরু শ্রীশুকদেবের রাজার প্রতি অপার করুণা।

এই ভগবদুদ্ধবসংবাদের অন্তর্গতই এই অবধূত সংবাদ। এতে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে। অবধূতজী যিনি দত্তাত্রেয় ঋষি (শ্রীস্বামিপাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় মন্তব্য করেছেন) জীবনে চব্বিশ জন গুরুর কাছে যা যা শিক্ষা করে তাঁদের সকলকে গুরুপদে বরণ করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এটি আমাদের মত প্রাকৃত রসে মজা চিত্তের কাছে পরম উপকারী। উপদেশবাক্য গ্রহণ করে হৃদয়ে বসাতে না পারলেও কানে শুনলেও লাভ আছে। উপদেশ মত আচরণ করা কঠিন তবু জানতে আপত্তি কি?

আমার ভাগবতধর্মের আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ পরম ভাগবত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয়ের শ্রীমুখে যখন ভাগবতী কথা অমৃতবাণী শুনবার সৌভাগ্য হয় তখন তাঁরই কৃপা-প্রেরণায় ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়েছে শ্রীগৌরগোবিন্দকে তো জীবনে ভালবাসতে পারলাম না কিন্তু তাঁর কথারসে যেন রুচি জাগে। হরিকথাকে যেন ভালবাসতে পারি। শুনেছি এই হরিকথাতে রুচি হলে আর সব কিছুতে অরুচি হয়। সাধুভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে প্রাণের অসংখ্য সভক্তি প্রণতি নিবেদন করে এইটিই প্রার্থনা যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও বুঝতে পারি হরিকথা ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগছে না।

সর্ব্বোপরি আমার ইহলোকের হৃদয়সর্ব্বস্ব পরমারাধ্য পিতৃদেব এবং ইহলোক পরলোক দুই লোকের বন্ধু, ত্রাতা, সুহৃদ্, পরমাত্মীয় সর্ব্বস্ব দেবতা আমার শ্রীগুরুমহারাজের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে তাঁদের কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি নিরন্তর।

'অবধূত-সংবাদ' অর্ঘ্যখানি শ্রীগুরুমহারাজের অপার কৃপার দান। দানে বস্তু পেলে আনন্দ হয় বটে কিন্তু তাতে আমিত্বের লেশ থাকে না। কারণ রোজগার করা বস্তু তো নয়। তাই এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার আমিত্বকে সম্পূর্ণ বিলয় করে যেন ধন্য হতে পারি। কারণ কথা মূলে শ্রীঅবধূতজীর, তিনি একজন সন্ন্যাসী—বলেছেন ভগবান শ্রীগোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষ যদুমহারাজের কাছে। আর এই প্রাচীন ইতিহাস স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলছেন উদ্ধবজীর কাছে। কাজেই এতে আমার নিজস্ব কিছু নেই। তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি। আমার বুদ্ধিতে বস্তুর প্রতিফলনে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। কারণ আধার অনুযায়ী বস্তুর প্রকাশ হয়। তাই সহৃদয় সুধীসমাজের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তাঁরা যেন নিজগুণে ত্রুটি সংশোধন করে এই কথারস আস্বাদন করেন তাহলে কৃতকৃতার্থ হব।

পরিশেষে 'সার্ভিস্ প্রিণ্টার্স' প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম শ্রদ্ধাভাজন

শ্রীযুক্ত রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি অশেষ যত্ন স্বীকার করে গ্রন্থমুদ্রণ ব্যাপারে তাঁর নিজের কাজ মনে করে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে করেছেন।

"রবীন্দ্র-নিকেতন"
বাগানিয়াপাড়া
শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া

অলমিতি—
শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থিনী
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণায় 'অবধূত-সংবাদ' গ্রন্থের দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশিত হলেন। কিন্তু এর মূলে যাঁর অনবদ্য অকুণ্ঠ অবদান তিনি হলেন আমার পরম ভক্তিভাজন অগ্রজপ্রতিম মহাবদান্য ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ সরকার মহোদয়। তাই তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীগৌরগোবিন্দ শ্রীচরণে তাঁর এবং তাঁর পরিবারবর্গের দীর্ঘজীবন, অটুট্ স্বাস্থ্য ও শান্তিসমৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

আর যিনি পরম করুণা করে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন—তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে কত কষ্টস্বীকার করেছেন সেই ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় মহাশয়কে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই—তাঁর এবং তাঁর পরিবারবর্গের দীর্ঘজীবন, শান্তি সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

অবধূত সংবাদ গ্রন্থখানি শিক্ষামূলক। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদ প্রসঙ্গের অন্তর্গত তিনটি অধ্যায়।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
বাগানিয়া পাড়া, রবীন্দ্র নিকেতন

শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থিনী—
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

শ্রীমদ্ভাগবত—একাদশ স্কন্ধ

১। সপ্তম অধ্যায় ॥ গুরু—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত। ১
(মোট আট জন)

২। অষ্টম অধ্যায় ॥ গুরু—অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুমক্ষিকা. হরিণ, মীন, পিঙ্গলা। ১২৪
(মোট নয় জন)

৩। নবম অধ্যায় ॥ গুরু—কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী, শরকার, সর্প, উর্ণনাভি, পেশকৃৎ কীট। ২০১
(মোট সাত জন)

৪। সংযোজন ২৮৯

৫। ঘরের কথা ২৯৩

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

শ্রীশ্রীললিতমাধবনাটকম্ (বঙ্গানুবাদ)
ছয় গোস্বামী ও বাবাজী মহারাজ
রায় রামানন্দ মিলন
নবযোগীন্দ্র সংবাদ
কে আমি
লীলাশ্রী

একাদশ স্কন্ধ । সপ্তম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ ।

যদাত্থ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে ।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্ব্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥
ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্য্যমশেষতঃ ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ১
কুলং বৈ শাপনির্দ্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ ।
সমুদ্রঃ সপ্তমেহ্যেনাং পুরীঞ্চ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ২

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

সপ্তম অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি আত্মজ্ঞান সিদ্ধির জন্য শ্রীঅবধূতজী যে আটজন গুরুর কাছে শিক্ষার বিষয় বলেছেন—সেই প্রসঙ্গটি শ্রীউদ্ধবজীর কাছে বলছেন ।

ভগবান বললেন, হে মহাভাগ, তুমি যা অনুমান করেছ তা সবই সত্য । আমি সেইটিই সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করেছি । আর ব্রহ্মা, শিব ও লোকপালগণ সকলেই চাইছেন আমি নিজ ধামে ফিরে যাই ।

পৃথিবীতে আমি দেবতাদের সকল কাজই নানাভাবে সমাধা করেছি । যেজন্য ব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হয়ে আমার নিজের অংশ বলদেবের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলাম । ১

আর সাত দিন পর এই যদুকুল পরস্পর যুদ্ধ করে ব্রহ্মশাপ রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাবে এবং সমুদ্রও দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করবে । ২

॥ টীকাসম্মত ব্যাখ্যা ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের একাদশ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই তিন অধ্যায়ে অবধূতসংবাদটি বলা হয়েছে । এটি শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদের অন্তর্গত । বক্তা মূলে স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রোতা বা প্রশ্নকর্ত্তার আসনে বসেছেন শ্রীগোবিন্দের

পরম প্রিয় সখা শ্রীউদ্ধবজী। মাঝে মাঝে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীউদ্ধবজী। এতে বক্তা শ্রীগোবিন্দের পক্ষে কথা বলার সুবিধা হয়েছে। বাছুর বাঁটে মুখ দিয়ে মধ্যে মধ্যে ঠোক্‌রালে গাভীর দুধ যেমন ভাল করে পানায় এও সেইরকম। পূর্ব্বপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—ভগবান ইঙ্গিত করেছেন যে তিনি প্রকটলীলা সংবরণ করবেন। যদুকুলের (কৃষ্ণভগবানের নিজের বংশ) ওপর ব্রহ্মশাপ কৃষ্ণইচ্ছাতেই ঘটেছে। উদ্ধবজী এ ইঙ্গিতে আকুল হয়ে পড়েছেন। কোটি প্রাণপ্রিয় শ্রীগোবিন্দচরণে নিবেদন করছেন—'হে কেশব, তোমার চরণকমল ত্যাগ করে এক্ষণও প্রাণধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তোমার ধামে তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে চল। তোমার সঙ্গে তোমার ধামে গেলে আমার মায়াতরণ হবে এজন্য আমাকে নিয়ে যেতে বলছি না কিন্তু তোমার বিরহ সহ্য করে থাকতে পারব না বলে এ কথা বলছি।' ভগবান উদ্ধবজীর এ কথা শুনে আদর করে তাকে বলতে লাগলেন,—'হে মহাভাগ, তুমি যা বললে তা ঠিক। সকলেই ইচ্ছা করেন যে আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি। ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি অংশভাগে এই ভূলোকে অবতীর্ণ হয়েছি।

যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ।

—ভাঃ ১১।৭।১

শ্রীশ্রীজন্মলীলা প্রসঙ্গেও শ্রীশুকদেব বলেছেন—ভগবানের বাক্য

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥

—ভাঃ ১০।২।৯

ভগবান যোগমায়ার প্রতি এই আদেশ করলেন, 'আমি অংশভাগে দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হব আর তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে।

ভগবান বলেছেন আমি অংশভাগে অবতীর্ণ হব। এই 'অংশভাগ' কথাটি এখানে ব্যাসকূট। ভগবান শ্রীগোবিন্দ অংশ-অবতীর্ণ অর্থাৎ

তিনি অংশাবতার। তিনি পূর্ণ পূর্ণতম ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন নন—এ রকম অর্থ নিলে হবে না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের পরিভাষা বাক্য আছে—

‘এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।’

—ভাঃ ১।৩।২৮

ভগবানের যত যত অবতার সূতমুনি গণনা করেছেন তাঁরা কেউ বা স্বয়ং ভগবানের অংশশক্তির প্রকাশ কেউ বা তাঁর কলাশক্তির প্রকাশ। কিন্তু কৃষ্ণভগবান হলেন স্বয়ম্। অর্থাৎ তাঁর প্রকাশের জন্য অন্য কোন ভগবৎস্বরূপের অপেক্ষা নেই। তাঁর থেকেই সকলের প্রকাশ। তাঁর অনন্যাপেক্ষি রূপ। এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বত্র নিতে হবে। কারণ পরিভাষা তাকেই বলে এক জায়গায় বাক্যটি থেকে যদি সর্ব্বত্র তার প্রয়োগ হয়। যেমন গৃহের এক জায়গায় প্রদীপ থাকে কিন্তু সেই প্রদীপের আলোতে গৃহের সর্ব্বত্র আলোকিত হয়। তাই কৃষ্ণচন্দ্র যে অংশশক্তি বা কলাশক্তি নন কিন্তু তিনি যে পূর্ণ পূর্ণতম এইটিই স্থির সিদ্ধান্তিত হল। দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গিয়েছে। ভগবান বলছেন, ‘আমি অংশ অর্থাৎ বলদেবের সঙ্গে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছি (অংশেন পদটি এখানে সহার্থে তৃতীয়া—অংশ অর্থাৎ বলদেবের সঙ্গে) যদুবংশের ওপর ব্রহ্মশাপ হয়েছে। তাঁরা পরস্পর বিগ্রহ করে ব্রহ্মশাপরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাবে এবং সাতদিন পরে সমুদ্রও দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করবে।

এখানে ভগবানের বাক্যে ‘শাপনির্দ্দগ্ধম্’ বলতে যদুকুল ব্রহ্মশাপে নিঃশেষে দগ্ধ হবে এ অর্থ নয়। কিন্তু নির্গত হয়েছে দগ্ধ যার থেকে এইরকম অর্থ করতে হবে। কারণ যদুবংশীয়গণের দহন সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা সবাই সচ্চিদানন্দময় তনু। শ্রীদ্বারকামন্দিরে শ্রীকৃষ্ণবিবাহোৎসবে ষোল হাজার এক শত আট মহিষীর পাণিগ্রহণকালে একা কৃষ্ণই যে ষোল হাজার এক শত আট ঘরে প্রবেশ করেছেন তা নয়, মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন সকলেই ষোল হাজার একশ আট ঘরে প্রবেশ করেছেন। তাতেই বুঝা যাচ্ছে সকলেই চিন্ময়স্বরূপ। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করলেন—“শাপনির্দগ্ধমিত্যনুকরণাভিপ্রায়ম্। বস্তুতস্তু

শাপেঽপি নির্গতং দগ্ধং দাহো যস্মাৎ তথাভূতং সৎ নঙ্ক্ষ্যতি অদর্শনমেব প্রাপ্স্যতীত্যর্থঃ।" নির্দগ্ধ করছে এটি বলা হয়েছে অনুকরণাভিপ্রায়ে অর্থাৎ দহনের মত যেন অনুকরণ করছেন। নির্দগ্ধ হলে যেমন হয় তেমনি দেখাবে। 'নঙ্ক্ষ্যতি' পদে সকলকে বিনাশ করবেন এ অর্থ নয়। এখানে 'নশ্' ধাতুর অর্থ বিনাশ নয়। 'নশ্' ধাতুর অর্থ হল অদর্শন। অর্থাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে যাবে। কিন্তু বিনাশ হবে না। এইরকম সিদ্ধান্ত হলে সাত্বত সংহিতার মর্য্যাদা রক্ষা হয়। সাধনসিদ্ধ ভক্ত ধ্রুবই যদি এই দেহ ত্যাগ না করে উর্দ্ধলোকে যান তবে নিত্যপার্ষদ এঁরা কেমন করে দেহ ত্যাগ করবেন? নিত্যপার্ষদের আসাযাওয়া ভগবদিচ্ছায়। লীলাবতার যে এ জগতে অবতীর্ণ হন তা তাঁর নিজের ইচ্ছায়। এ জগতে তাঁরা আনন্দ করতে আসেন। অসুরবধ প্রভৃতি কাজ অজুহাত মাত্র। শাস্ত্র বলেছেন—

স্বয়ং ভগবানের অবতার হয় যেই কালে।
আর আর অবতার তাতে আসি মিলে॥

স্বয়ং ভগবান তিনিই যাঁর কোন কারণ নেই। যিনি অনাদিরাদি অর্থাৎ যিনি অনাদি ও আদি দুই-ই। অনাদি অর্থাৎ তাঁর কোন আদি অর্থাৎ কারণ নেই আর আদি কারণ সকলের কারণ তিনিই। বাক্‌পতি ব্রহ্মা স্তুতি করে বলেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

—ব্রহ্মসংহিতা ৫।১

স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ বলা আছে—

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং রূপং তদুচ্যতে।

অর্থাৎ যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান শব্দের তাঁহাতেই সত্তা॥

স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর যত যত অবতার আছেন সকলেরই কারণ আছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান। এই স্বয়ং ভগবান আসবার সময়

যেমন ছল করেছেন, যাবার সময়ও তেমনি ছল করতে হবে। যে জাল ছড়িয়েছেন তাকে গুটিয়ে নিতে হবে তো। যদুবংশের ওপর ব্রহ্মশাপ তাই ছলমাত্র। সাতদিনের দিন সমুদ্র দ্বারকানগরী প্লাবিত করবে। চারিদিক আবরণ করবে কিন্তু মধ্যে গ্রাস করতে পারবে না। তাই ভগবানের আলয়টি যেমন আছে তেমনি থাকবে। কারণ পরে বলা আছে—'বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়মিতি'। ১-২

যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ।
ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ॥ ৩
ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে।
জনোঽভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে॥
ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্॥ ৪

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

হে সাধো! যখন আমি এই লৌকিকী লীলা সংবরণ করব তখন জগতের আর কোন মঙ্গল থাকবে না এবং অচিরে এ জগৎ কলিরাজের অধীন হবে। ৩

তাই হে ভদ্র! তোমাকে বলি আমি এ লোক পরিত্যাগ করলে তুমি আর এখানে বাস করো না। কলিযুগে লোকেরা অত্যন্ত অভদ্ররুচি হবে। তখন তুমি আত্মীয়স্বজন সকলের প্রতি স্নেহশূন্য হয়ে সব কিছু পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আমাতে মনোনিবেশ করে সমদৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করবে। ৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবজীকে 'সাধো' বলে সম্বোধন করলেন। সাধু অর্থাৎ নির্মলচিত্ত। ভগবান বলছেন—'দেখ উদ্ধব, আমি যখন এই লোক ত্যাগ করে যাব তখন সকল মঙ্গল নষ্ট হয়ে যাবে। আর মঙ্গল বলে কিছু থাকবে না। জগৎ অমঙ্গলে পূর্ণ হবে। কলির তিরস্কার আরম্ভ হবে। কলির চর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যে জগৎ পূর্ণ হবে। সৎভাবের মধ্যে অসৎভাব প্রবেশ করবে। অতএব হে উদ্ধব, তোমার আর এখানে বাস করা উচিত হবে না। অর্থাৎ আমি যেখানে নেই, সেখানে তুমিও থেকো না। হে ভদ্র (মঙ্গলস্বরূপ), সমস্ত জন অভদ্ররুচি হবে। অর্থাৎ ভগবৎবিরোধী রুচি পাবে।' এইটিই অমঙ্গলচিহ্ন। কারণ ভগবান ছাড়া আর যা কিছু তারই নাম অমঙ্গল।

এরপরে ভগবান উদ্ধবজীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করছেন। 'ত্বন্তু'—এখানে 'তু' পদের দ্বারা ভগবান ভিন্ন প্রক্রম আরম্ভ করলেন। বলছেন—'উদ্ধব, আমার সঙ্গে তো তোমার যাওয়া হবে না। তোমাকে থাকতে হবে। তবে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করবে। কোথাও একজায়গায় বাস করবে না।' উদ্ধবজী যদি প্রশ্ন করেন, এই মায়াময় জগতে দ্রব্যের এত বিভিন্নতা, এখানে সমদৃক্ হওয়া কি করে সম্ভব হবে? তার উত্তরে ভগবান বলছেন—'উদ্ধব, জগতের বস্তুর উচ্চাবচ অবস্থা আছে। অর্থাৎ কোনটির উৎকর্ষ কোনটির বা অপকর্ষ বলে মনে হয়। কিন্তু তুমি তো বুদ্ধিমান, তুমি বিচার করে নেবে। বুঝে নেবে যে ও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কিছু নয়। জাগতিক বস্তুর ভালোমন্দের কোন দাম নেই। তারা সকলে একই জাতি। মায়া উপাদানে প্রতিটি বস্তু গড়া। কাজেই কোনটিকে গ্রহণ করা চলবে না। যেমন মাটির বাসনের দোকানে কলসী, হাঁড়ি, সরা, আম, কলা, আতা, কমলালেবু, হাতি, ঘোড়া সবই মাটির তৈরী। বুদ্ধিমান বিজ্ঞজন এর কোনটিতেই লোভ করে না। কারণ তারা জানে এ সবই মাটির তৈরী, অতএব ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু শিশু যে অজ্ঞ কিছু বুঝে না সে ঐটি নেবার জন্য বায়না ধরে। আবার না পেলে কাঁদে। তেমনি জগতের তাবৎ বস্তু সবই মায়ার অধিকারে। তাই তুমি এই কথা মনে করে সমদৃক্ থাকবে। কোনটিতেই গ্রাহ্যবুদ্ধি করবে না।'

শ্রীজীবপাদ বলেছেন—উদ্ধবজীকে ভগবান রেখে যাচ্ছেন কারণ ভগবানের উপদেশ মুনিদের উদ্ধবজীই দান করবেন। উদ্ধবজীই তাঁদের এ উপদেশ গ্রহণ করাবেন। উদ্ধবই এই কাজ পারবেন। তাই ভগবান তাঁর ওপর এ ভার দিলেন। কারণ ভগবানের চেয়ে উদ্ধব কিছু ন্যূন নন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যদুবংশ তো ব্রহ্মশাপগ্রস্ত, তাহলে উদ্ধবজীও তো সে গণ্ডীর মধ্যে পড়েন। তবে তাঁকে রাখা হচ্ছে কেন? ভগবানের ইচ্ছায় উদ্ধব থাকলেন। তাঁর ইচ্ছায় সব হয়। ভগবান যদিও মুহূর্ত্তের মধ্যে দানবকুলকে ধ্বংস করতে পারেন তবু ভক্তচিত্তবিনোদনের জন্য বিবিধ ক্রিয়া করেন। ব্রহ্মাও ভগবদ্দর্শনের আগে পর্য্যন্ত তপস্যার ক্লেশ সহ্য

করেছেন। ভগবদ্দর্শনের পর আর কারও কোন ক্লেশ নেই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবজীকে বলছেন—'উদ্ধব, প্রিয়সখে, এই অবতারে আমি সকলের মনের বাসনা পূরণ করেছি। রুক্মিণী প্রভৃতির বিবাহপ্রসঙ্গে, বাণাসুর এবং অন্যান্য অসুর বধ করে, বন্ধু আত্মীয় মিলন প্রসঙ্গে, ইন্দ্রপ্রস্থ মিথিলা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের ফলে ভূতলবাসী ভক্তদের যে আমাকে দর্শন করবার অভিলাষ ছিল তা প্রায় পূরণ করেছি। আবার পৃথিবীর অধোদেশে যেমন সুতলে বলিরাজের দ্বারে দ্বারী হওয়ায়, যমপুরীতে দেবকীমায়ের ছ'টি সন্তান যারা আমার অগ্রজ তাদের আনতে গিয়ে, গুরুপুত্র মধুমঙ্গলকে আনবার সময় সেই পৃথিবীতলবাসী ভক্তদের দর্শন দানে তাদের বাসনা পূরণ করেছি। আবার ঊর্দ্ধে, স্বর্লোকে অদিতি-মায়ের গর্ভে, দেবপিতা কশ্যপ প্রজাপতির ঐরসে আবির্ভূত হয়ে, পারিজাতহরণ প্রসঙ্গে, ভূমাপুরুষের কাছ থেকে ব্রাহ্মণবালককে আমার প্রসঙ্গে সেই সেই লোকবাসী ভক্তদের আমাকে দর্শনের অভিলাষও পূরণ করেছি। কিন্তু বদরিকাশ্রমবাসী নর-নারায়ণ প্রভৃতি মহামুনীন্দ্রদের আমাকে দর্শন করবার যে ঔৎসুক্য সেটি সফল হয় নি। এখন একশত পঁচিশ বছরের আমার প্রকটলীলা সংবরণ করব। এই লীলা সংবরণ করবার পর আমার অসমাপ্ত কাজ আমার পরমপ্রিয় সখা উদ্ধবদ্বারে সম্পাদন করব। কারণ এ উদ্ধব তো কম নন। এ উদ্ধব আমারই তুল্য। সুতরাং আমারই প্রতিমূর্তি।' মুনিদের কাছে ভগবান উদ্ধবকে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। বদরিকাশ্রমবাসী নরনারায়ণ প্রভৃতি বৈরাগী ঋষিকে তাদের মত উপঢৌকন দিতে হবে তো। জ্ঞানবৈরাগ্যের কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধব তাদের কাছে যাবেন। এইগুলিই ভক্তিরত্ন। উপদেশ-দ্বারে জ্ঞানবৈরাগ্য নিয়ে উদ্ধব যান। কিন্তু উদ্ধবের হৃদয় তো প্রেমে পরিপূর্ণ। জ্ঞানবৈরাগ্য রাখবার জায়গা কোথায়? উদ্ধব যে জ্ঞান-বৈরাগ্য নিয়ে যাবেন সে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রেম হতে ভিন্ন নয়। প্রেম থেকেই তা তৈরী হয়েছে। কারণ বলা আছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
—ভাঃ ১।২।৭

ভগবান বাসুদেবে ভক্তি গাঢ় হলে আপনা থেকেই ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞান-বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়। এ জ্ঞানবৈরাগ্য লাভের জন্য ভক্তের আলাদা করে চেষ্টা বা কষ্ট করতে হয় না। বরং যারা শুধু শুষ্ক বৈরাগ্য চায় তাদের চেয়ে প্রেমিকভক্ত তাড়াতাড়ি বৈরাগ্য পায়। অহৈতুক জ্ঞান অর্থাৎ এটি শুষ্ক জ্ঞান নয়। এ হল ভক্তিসঞ্জাত জ্ঞান। ভক্তি এখানে জননী। তাঁর থেকে জ্ঞানবৈরাগ্য পুত্রের জন্ম হয়। পেটে অন্ন পড়লে যেমন ক্ষুধা চলে যায় তেমনি ভজন-অন্ন পেটে পড়লে অন্য বস্তুতে অর্থাৎ প্রাকৃত রুচি চলে যায়। গোবিন্দে রুচি জন্মায়। অর্থাৎ ভজন করলেই বৈরাগ্য হবে। গোপরামারা বলেছেন—ভগবানের অধরামৃতের আস্বাদন 'ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাম্।' 'ইতররাগ' অর্থাৎ কৃষ্ণেতর আসক্তিকে ভুলিয়ে দেয়। শ্রীমতী রাধারাণী বলেছেন—'ইতররসালিতৃষ্ণাহর'—গোবিন্দ-অধরামৃত গোবিন্দ ছাড়া আর যত বিষয় আছে তার প্রতি তৃষ্ণা অর্থাৎ আসক্তিকে হরণ করে। ভজন-অন্নে গোবিন্দে রুচি জন্মায়। অর্থাৎ ভজন করলেই বৈরাগ্য হবে। ভগবান উদ্ধবকে জ্ঞান বৈরাগ্য গ্রহণের ইচ্ছা অর্থাৎ জিঘৃক্ষা দিলেন। ভগবানের বিরহে উদ্ধবের প্রাণ বাঁচে না কিন্তু তাঁর ইচ্ছায় উদ্ধবের প্রাণ বেঁচে থাকবে। ভগবান বলেছেন, আমার কাছে থাকবে কিন্তু কেউ দেখবে না। ভগবান উদ্ধবের আগে উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা জাগিয়ে পরে উপদেশ দান করেছেন।

শ্রীগোবিন্দ বলছেন—'উদ্ধব দ্বারকাবাসীর ওপর তোমার দুই জাতীয় স্নেহ। একটি হল আমার সম্পর্কহীন জ্ঞাতি সম্বন্ধে আর দ্বিতীয়তঃ আমার সম্পর্ক নিয়ে তাদের সঙ্গে প্রিয়তা। দেহসম্বন্ধে যে প্রিয়তা তা তুমি অনায়াসেই ত্যাগ করতে পারবে। কারণ তুমি তো জ্ঞানী। কিন্তু আমার সম্বন্ধ নিয়ে যে প্রিয়তা তা ত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেহ-সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমার সম্বন্ধ নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ কর। এ সম্বন্ধ

গোবিন্দের সম্বন্ধ। গোবিন্দ ভুললে তবে সে সম্বন্ধ ভুল হবে। নতুবা ভুল হবে না। দেহসম্বন্ধ ত্যাগ কর। সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন বস্তুর নিন্দা করে না।' ভগবান উদ্ধবের হৃদয়ে জিঘৃক্ষা জাগিয়েছেন, তার ফলেই উদ্ধব প্রশ্ন করেছেন—এ জগতে সমদৃষ্টি কি করে হবে?

উদ্ধবজীর প্রশ্নের তাৎপর্য্য হল—এই গুণদোষপূর্ণ বিষম লোকে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া কি করে সম্ভব? তার উত্তরে ভগবান বললেন—৩-৪

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্॥ ৫

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

মন, বাক্য, চক্ষু এবং শ্রবণেন্দ্রিয়াদির দ্বারা এই জগতের যা কিছু গ্রহণ করা যায় সবই মনোময় ও মায়াময়রূপে গ্রহণ করে নশ্বর বলে জানবে। ৫

গৃহ্যমাণ এই জগৎকে মায়াময়, মনোময় এবং নশ্বর বলে জানবে। শব্দাদি পঞ্চবিষয়ে কোথাও দোষ আবার কোথাও গুণ। তাহলে সমদৃষ্টি হওয়া কি করে সম্ভব? ভগবান বললেন—'সমদৃষ্টি হওয়া কি করে সম্ভব জান? জগতের সকল বস্তুকে নশ্বর বলে জানবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—'তৎ সর্ব্বং জাগরে মায়াময়ং মায়াকল্পিতত্বাংশেন তুল্যমেব। স্বপ্নে মনোময়ং মনঃ কল্পিতত্বাংশেন সর্ব্বং তুল্যমেব।'

সবই মায়াকল্পিত অতএব সবই সমান। এইভাবে সমদৃষ্টি আসবে। যেমন বাজীকরের একশ টাকা বা হাজার টাকা পাওয়া দুইই সমান কারণ দুটিই মনঃকল্পিত। কোনটিরই সত্তা নেই। দুটিই অল্পক্ষণস্থায়ী। কারণ মনের প্রাসাদ গড়ে তোলার কোন সত্তা নেই। মায়াকল্পিত এবং মনঃকল্পিত বস্তু দুইই মিথ্যা। কিন্তু মায়াকল্পিত বস্তু তবু হাতে ছোঁওয়া যায় এবং ব্যবহারও করা চলে কিন্তু মনঃকল্পিত বস্তু হাতে ছোঁওয়াও যায় না ব্যবহারও করা চলে না। স্বপ্নে মনের কল্পনা মাত্র। যা কখনও প্রত্যক্ষ করা হয় নি এমন বস্তুও স্বপ্নে দেখা যায়। সত্য বস্তুর স্বপ্নও সত্য। মায়াময় ও মনোময় দুইই নশ্বর। স্বপ্নকল্পিত টাকার থলি যেমন ছোট বা বড় দুইই সমান, গুণ বা দোষের সত্তাই নেই। শ্রোতার কাছে দুইই সমান। ভোক্তার কাছে দুইই মিথ্যা। হেতু হল মায়াময়ত্ব। তাই ভগবান বললেন—৫

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্।
কর্মাকর্মবিকর্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা॥ ৬

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

গুণ এবং দোষবুদ্ধি যার আছে তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হবেই এবং সেই বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষের কর্ম অকর্ম ও বিকর্ম এই ভেদজ্ঞানের বিষয় যে ভ্রম তাও গুণ ও দোষযুক্ত। ৬

নানাবিষয়াকার জ্ঞান বিক্ষিপ্ত মনেই হয়ে থাকে। চোখে সরষে ফুল যেমন নানা দেখা যায়। এই ভ্রমই গুণদোষকে তৈরী করে। নানা দর্শনেই গুণদোষ দেখা যাবে। যে ভ্রম নানার বাচক তাই গুণদোষের বাচক। ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতু-উপাখ্যানে বলা হয়েছে—'বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।' হাঁড়ি, কড়া, ঘট, কলসী, সরা—এ সবই বাক্যের প্রকারভেদ মাত্র। কোনটিই সত্য নয়। এর মধ্যে মৃত্তিকাই শুধু সত্য। কারণ মাটি দিয়েই এ সব গড়া। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—'গুণং ভজত ইত্যুৎকৃষ্টঃ অয়মর্থো দোষং ভজত ইতি নিকৃষ্টঃ।' অজ্ঞান পুরুষেরই এইরকম ভ্রম হয়। জ্ঞান তার নেই তা নয়। কিন্তু জ্ঞানের বিরোধী অবস্থা জানে কিন্তু বিরূপ। যে যা তাকে তাই বলে জানা নয় বিপরীত বলে জানা। যেমন লালকে কাল বলে জানা। মৃত্তিকাকে জল বলে জানা। প্রকৃত জ্ঞানের চেহারা হল 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'—এই জ্ঞান যে লাভ করতে পেরেছে তার আর বিষম দৃষ্টি হবে না। এ জগতে যা কিছু আছে সবই দোষ। তবে দোষ বললে জীব নেবে না তাই তার মধ্যে এক দিককে গুণ বলে দেখান হয়েছে মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গুণ নয়। দেবী পার্ব্বতীর অভিশাপে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এতে দেখান হয়েছে ভগবদ্দর্শনের পরেও শিবনিন্দা করলে পতন হয়। ভগবদ্দাস বড় নির্ভীক। শিব মহান্। তাই নিন্দাও মাথা পেতে নিয়েছেন। জগতের

যেখানেই জন্ম হোক্ অসুর বা দেবতা দুইই সমান। অভিশাপ ও বর একই উপাদানে গঠিত। জগতের সুখ বা দুঃখ দুইই ত্রিগুণ-গঠিত। কাজেই তার পার্থক্য হবে কেমন করে? দুইই সমান। সবই দুঃখ। তবে যে আমরা সুখ বলে দেখি পুত্রপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি তা কেবল চোখের রং মাত্র। মায়াজাতবস্তু কখনও সুখের হতে পারে না। বাজীকরের টাকায় যেমন বড়লোক হওয়া যায় না। মায়ার দেওয়া দেহ ইন্দ্রিয় নিয়ে জীব বিষয় ভোগ করছে। এগুলি হল পাত্র। ভোগের উপকরণ। যেমন বাটিতে করে খেতে হয়। সুখসাগরের অংশ জীব আজ মায়ার উপকরণ নিয়ে সুখ ভোগ করছে। বিধির এমনই বিড়ম্বনা। দোকানদার যেমন খারাপ মাল ভুলিয়ে খদ্দেরকে গছিয়ে দেয়। অর্থপ্রাপ্তির পেছনেই থাকে অর্থনাশের আশঙ্কা। পুত্রপ্রাপ্তির পেছনেই থাকে পুত্র হারানোর ব্যথা। যে অর্থের সুখ ভোগ করে না সে দারিদ্র্যের দুঃখও ভোগ করে না। মায়া তার পাকা হাতের রং লাগিয়েছে। কাপড় ছিঁড়ে গেল তবু মায়ার রং গেল না। চুরাশি লক্ষ জন্ম এমন কি মানুষ জন্ম পর্য্যন্ত কেটে গেল কিন্তু রং গেল না অর্থাৎ প্রাকৃত রুচি গেল না। এ জগতের অভিশাপ ও বর দুইই মিথ্যা। বিজ্ঞের দৃষ্টিতে তাই বৈষম্য হয় না। মায়াময় জগতে বর তো থাকবে না। তাই অভিশাপ ও বর একই। চিনি দিয়ে ধামাই তৈরী হোক্ আর পাখাই তৈরী হোক্—দুইই এক। শিশু তার অজ্ঞ দৃষ্টিতে পার্থক্য করতে পারে কিন্তু বিজ্ঞ দৃষ্টিতে তো দুইই এক। তাই চিত্রকেতু বললেন—'গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কোহনুগ্রহঃ। কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বেতি।'

এখন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উদ্ধবজীর পক্ষ থেকে প্রশ্ন তুলছেন, বেদ যে বিধিনিষেধ বলেছেন সে বিধিনিষেধে তো গুণদোষের কথা বলা হয়েছে। এ তো অজ্ঞানের ভ্রম নয়—এটি বেদের বিধান। এ তো অভ্রান্ত। তার তো ভ্রম হয় না। বেদবিহিত হল কর্ম। বিহিতের অকরণ হল অকর্ম আর নিষিদ্ধ কর্ম করার নাম বিকর্ম। তাহলে বেদ

কী প্রকারে ভ্রমশূন্য হবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও অর্জুনসখাকে বলেছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

—গীতা ২।৪৫

শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে প্রায়শ্চিত্তবিধানে বলা হয়েছে অবিদ্যাযুক্ত জীব বেদের কর্মকাণ্ডের অধিকারী। গুণদোষদৃষ্টি তাদের পক্ষে বলা হয়েছে। তাদের জন্যই কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম ব্যবস্থা। ৬

তস্মাদ্‌যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাং ।
আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥ ৮
দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে ।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ ॥ ৯
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ ।
পশ্যন্‌ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥ ১০

শ্রীশুক উবাচ ।

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ ।
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরচ্যুতম্‌ ॥

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

অতএব চিত্তকে সমাহিত করে এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করে এই জগৎকে আত্মাকে অর্পিত এবং সেই আত্মাকে আমাতে বিস্তৃত দেখবে। ৭

সকল শরীরের আত্মস্বরূপ এবং জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত এবং আত্মানুভূতিতে সন্তুষ্ট হলে আর কোনপ্রকার বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হবে না। ৮

যাঁরা গুণদোষবুদ্ধির অতীত অর্থাৎ মুক্তপুরুষ তাঁরা যে দোষযুক্ত কর্ম থেকে নিবৃত্ত হন তা দোষবুদ্ধিতে নয় কিংবা বিহিত কর্মের যে অনুষ্ঠান করেন তাও গুণবুদ্ধিতে নয় কিন্তু বালকের মত প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করেন। ৯

সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃৎ শান্ত ও জ্ঞানবিজ্ঞান নিশ্চয় হয়ে এই বিশ্বকে আমার স্বরূপরূপে দর্শন করলে আর বিপদে পড়বার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ১০

শ্রীশুকদেব বললেন, হে মহারাজ, মহাভাগবত উদ্ধব ভগবানের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে অচ্যুতকে প্রণাম করে তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য বলতে আরম্ভ করলেন।

ভগবান বলছেন, উদ্ধব, এই সব যত নানা দৃষ্টি সব মনঃকল্পনায়। এ সব ত্যাগ করে আমাতে জগৎ দেখ। ভোগ্য সর্ব্বদা অধীন আর ভোক্তা সর্ব্বদা স্বাধীন। নিজেকে ভোক্তা ভাবলেই গর্ব্ব হবে। নিজেকে ভোক্তা ভেব না। আত্মাকে আমাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে অধীন দেখ তাহলে আর কোন অসুবিধা হবে না। এইভাবে বিচরণ কর।

আত্মা ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য। জগৎকে ভোগ্য অর্থাৎ অধীন এবং আত্মাকে স্বাধীন করে ভাবতে শিখলে আত্মা আর জগতের পেছনে ছুটবে না। আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে নিয়ন্তা এবং নিজেকে নিয়ম্য করে দেখতে হবে। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের তাৎপর্য্য হল 'তৎ' নিয়ন্তা, 'ত্বম্' নিয়ম্য। আচার্য্য অদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমুখে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তস্য ত্বম্' অর্থাৎ তাঁর তুমি—ভগবানের তুমি—অর্থাৎ তিনি প্রভু তুমি দাস, তিনি অংশী তুমি অংশ—এই ব্যাখ্যা শুনে শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমানন্দিত হলেন। গীতাবাক্যও এরই অনুরূপ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

—গীতা ১৫।৭

ভোগ্যবস্তুর মধ্যে যে উচ্চাবচ অবস্থা আছে তা দেখবার দরকার নেই। জীবাত্মাকে পরমাত্মার অনুগত করে দেখতে হবে। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব জীবকে মায়া ভুলিয়েছে। মায়ার এমনই প্রভাব যে জীবকে অসম্ভাবনা ও বিরুদ্ধভাবনা করিয়েছে। শাস্ত্রে অবিদ্বান্ বলতে তাকেই বুঝানো হয়েছে যার ব্রহ্মজ্ঞানাদি লাভ হয় নি। গোবিন্দের চরণ বুদ্ধি দিয়ে ছুঁতে হবে তবে মায়া ছাড়বে।

প্রহ্লাদজী যখন নৃসিংহভগবানের স্তুতি করেন তখন বলেছেন—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥

—ভাঃ ৭।৯।১১

ভগবান তাঁর নিজস্বরূপে পূর্ণ। তিনি অবিদ্বানের পূজা গ্রহণ করেন না। তাহলে কি বিদ্বানের পূজা গ্রহণ করেন? অবিদ্বান্ পদের অর্থ হল যে

জানে না? কি জানে না? ভগবানকে ভজে যে ভগবান ভিন্ন প্রাকৃত বস্তু চাইতে নেই একথা জানে না। তারা ভগবানকে ভজে কিন্তু প্রাকৃত বস্তু চায়। তবে ভগবান যে অবিদ্বানের পূজা গ্রহণ করেন সেটি নিজ প্রয়োজনে গ্রহণ করেন না। করুণা করে গ্রহণ করেন। বিদ্বান তাদেরই বলা হবে যাঁরা কৃষ্ণ বুঝেন। ভগবানকে সুখী করলে আমি সুখী হব। বিদ্বানের পূজা ভগবান নিজের প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করেন। রসখনির অভাববোধের মত। কারণ শ্রীমন্ নিত্যানন্দজীর স্বরূপ সম্বন্ধে পদকর্ত্তা লোচনদাস বলেছেন—

রসরত্নখনি তবু কাঙ্গাল রসের।
অদ্ভুত চরিত আমার শ্রীনিতাইচাঁদের॥

মহাজন আস্বাদন করেছেন—

রসখনির এই তো স্বভাব।
পূর্ণ হয়েও মানে অভাব॥

আতরের দোকানদার যেমন খরিদ্দারকে আতর মাখিয়ে নিজেও সৌরভ ভোগ করে ভক্তও তেমনি ভক্তি-আতর গোবিন্দকে মাখিয়ে নিজে সে সুখ ভোগ করে। এর এমনই স্বভাব যে গোবিন্দকে সুখী করতে গেলে নিজে সুখী হয়েই যায়। এখানে ভক্তের প্রেমই কর্ত্তৃত্ব করে। ভক্তের প্রেম পূর্ণকাম ভগবানেরও ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। ভগবান বলেছেন—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
—গীতা ৯।২৪

আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং সকলের ওপরে আমিই প্রভুত্ব করি।

আরও বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ —গীতা ৯।২৬

পাতা, ফুল, ফল, জল যে আমাকে ভক্তি মাখিয়ে দেয় আমি তা খাই।

ভগবানের পূর্ণত্বকে বজায় রেখে পূর্ণমাত্রায় ক্ষুধা সৃষ্টি করে। ভক্তের প্রেমের এ এক অচিন্ত্য শিল্প। ভগবান ব্রজের সখা শ্রীদাম সুদামের

উচ্ছিষ্ট ফল যখন ভোজন করেছেন সে অবস্থাতেও তিনি পূর্ণ। অবিদ্বান্ পূজা করে কিন্তু সে পূজাকে ভক্তি বলা চলে না। ভগবানে অনন্যমমতা প্রেমসঙ্গতা হলে তবেই তাকে ভক্তি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের লেখনীতে তাই উত্তমাভক্তির লক্ষণ ফুটেছে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্য যে-কোন বাসনা ত্যাগ করে জ্ঞান কর্মকে পরিহার করে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের নাম উত্তমাভক্তি। এখন এই উত্তমাভক্তি যে গোবিন্দ-বশীকারিণী তার প্রমাণ কী?

ভগবান পূর্ণ হয়েও যে অপূর্ণ থাকেন এই অপূর্ণতা তাঁর ভক্তের উত্তমাভক্তিই সৃষ্টি করে। যার ফলে তিনি উত্তমাভক্তির অধীন হয়ে পড়েন। তাই এই অপূর্ণতা। উত্তমাভক্তির বশীকরণের প্রমাণ। ভগবানের যে অপূর্ণতা এটি অভিনয় বা ভক্তকে ঠকানোর ব্যাপার নয়। সর্ব্বত্র ঠকানো আছে কিন্তু ভজনে ঠকানো নেই। তা যদি থাকত তাহলে ভগবানের বাক্য—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ —গীতা ৪।১১

যে আমারে যৈছে ভজবে
আমি তারে তৈছে ভজব।

এ বাক্য সার্থক হত না। ভগবৎস্বরূপে পূর্ণতা এবং অপূর্ণতা দুইই সমকালীন অর্থাৎ যুগপৎ সত্য। পরস্পরবিরোধী গুণের যুগপৎ মিলন একমাত্র ভগবৎস্বরূপেই সম্ভব। অবিদ্বান্ পূজা করতে চায় না, পূজা পেতে চায়।

ভগবান দেখেন অবিদ্বান্ নিজে পূজা পেতে চায় কিন্তু তিনি যদি তাদের পূজা গ্রহণ না করেন তাহলে তারা পূজা পায় না তাই করুণা-পরবশ হয়ে অবিদ্বানের পূজা গ্রহণ করেন। নিজে পূজা পাবে লোভে অনন্যগতি হয়ে অবিদ্বান্ পূজা করতে যায়। ভগবান বিম্বস্থানীয়।

বিম্বকে না সাজালে যেমন প্রতিবিম্ব সাজে না তেমনি ভগবানকে না সাজালে প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবও সাজবে না। তাই অবিদ্বানের এই প্রয়াস। বৈদিক কর্ম না করলে দেবতারা বিঘ্ন করবে। 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্'—এই জ্ঞান যারা লাভ করেছে সেই জ্ঞানবানের বৈদিক কর্মে স্পৃহা থাকে না। তাদের ফলপ্রাপ্তিতে আসক্তি নেই। সুখে দুঃখে সমান দৃষ্টি। জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত যে সে বেদবিহিত ত্যাগের অধিকারী। এইটিই বেদতাৎপর্য্যজ্ঞান—

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ —গীতা ১৫।১৫

সকল বেদমন্ত্র আমাকেই প্রতিপাদন করছে। আমিই বেদান্তকৃৎ আমিই বেদবিৎ।

ব্রহ্মা সমগ্র বেদকে মনীষার দ্বারা তিনবার ঈক্ষণ করে এইটিই নিশ্চয় করেছেন যে বেদের তাৎপর্য্যনিশ্চয়জ্ঞান হল পরমাত্মা হরিতে রতি। বেদতাৎপর্য্যনিশ্চয় হল জ্ঞান আর তদর্থানুভব হল বিজ্ঞান। বৃক্ষের সুশীতল ছায়া কর্মহারিণী (কর্মে বাধা দেয়) হলেও তার মাদকতা আছে। তা না হলে কর্মক্লান্ত মানুষ তার তলায় বসে মজবে কেন ? বিষয়ভোগে তুষ্টি হয় না কিন্তু ক্ষণিক সুখবোধ হয়। আয়ু-রবি অস্তাচলে যাবার আগে গোবিন্দ ভজে যেতে হবে। আমরা জীব প্রাকৃত রসে উন্মত্ত হলাম। মহাকাল রাজ্য গ্রাস করল। বিষয়সুখ পরকালের দুঃখ বোধ করে। পরমাত্মার আস্বাদ পেলে তবে অতুষ্টচিত্ত তুষ্ট হয়। এই পরমাত্মার আস্বাদনকারী যাঁরা তাঁরা বেদবিহিত কর্মত্যাগের অধিকারী। তাঁরা কর্মত্যাগ করলেও দেবতারা তাঁদের বিঘ্ন করেন না। দেবতাদের পাওনা হবিঃ তো তাঁরা দান করেন না, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও করেন না তবে দেবতারা বিঘ্ন করেন না কেন ? ভগবান বললেন—

দেবান্ ভাবয়তাঽনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ —গীতা ৩।১১

এই যজ্ঞদ্বারা মানুষ ইন্দ্রাদি দেবতার সংবর্ধনা করে এবং দেবতাগণও বৃষ্টি

প্রভৃতির দ্বারা জীবকে শস্য উৎপাদনের দ্বারা অনুগ্রহ করেন। এইভাবে পরস্পরের ভাবনা দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ হয়।

এরই নাম সংসার চক্র। দেওয়া-নেওয়াই সংসারচক্র। যে ব্যক্তি পরমাত্মার আস্বাদ লাভ করেছে সে ব্যক্তি সব জীবের দেবতাদেরও আত্মভূত অর্থাৎ পরমপ্রিয়। তারা দেবতাকৃত বিঘ্নের দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। স্বামিপাদ টীকায় বললেন—

'তস্য হ দেবা নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হেষাং স ভবতীতি।'

কারণ জ্ঞানী তখন দেবতার আত্মভূত অর্থাৎ দেবতার স্বরূপ হয়ে যায়। নিজের স্বরূপে কেউ বিঘ্ন করে না। কর্মকাণ্ড যারা বিধান করে দেবতারা তাদের বিঘ্ন ঘটায় না। বিষয়ের অন্ধতায় দেবতাদের মাৎসর্য্য হয়। ভগবানের চরণসেবীকে দেবতারা বিঘ্ন করলেও তারা অভিভূত হয় না। ভগবানের নিজজন বিঘ্নের মাথায় পদাঘাত করে। দেবতারা অজ্ঞ নন। বিপদ্ দিয়ে তাঁরা ভক্তজনকে ভজনের আনুকূল্য করেন। বিপদ্ দিয়ে তাঁরা সেবা করেন। তাঁরা জানেন ভগবান তুষ্ট হলে সকলের তুষ্টি।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

—ভাঃ ৪।৩১।১৪

তরুর মূলদেশে জলসেক করলে যেমন শাখাপ্রশাখা, পত্র পুষ্প পল্লব সব আপনাআপনি প্রফুল্লিত হয়, উদরপূর্ত্তি হলে যেমন সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, তেমনি শ্রীগোবিন্দ হলেন সকলের মূল—তাঁর শ্রীচরণমূলে ভজন-জলসেক করলে শাখাপ্রশাখার মত অন্যান্য দেবতাসকলে তৃপ্তি লাভ করেন।

বিপদ্ হল কষ্টিপাথর। যতই সিঁড়িতে পা দেওয়া যায় ততই গোবিন্দের কাছে পৌঁছান যায়। প্রহ্লাদ যত বেশী বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন ততই তাঁর গোবিন্দবিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। ভজনশীলের বিপদ্ গোবিন্দবিশ্বাসে সহায়তা করে। ভগবান উদ্ধবজীকে উপদেশ দান করছেন—"আমাতে চিত্ত অর্পণ করে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে জগতে বিচরণ

কর। বালক যেমন প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করে মুক্তপুরুষও তেমনি বালকের মত স্বভাবে কাজ করেন। দূষ্যকর্ম থেকে নিবৃত্ত হন দোষবুদ্ধিতে নয় কিংবা বিহিত কর্মের যে অনুষ্ঠান করেন তাও গুণবুদ্ধিতে নয়। এই বালকস্বভাব অবলম্বন করে তুমিও সেইভাবে আচরণ কর।" ৭-১০

মহাভাগবত উদ্ধবজীকে ভগবান এইভাবে আদেশ করলে শ্রীঅচ্যুত-চরণে প্রণাম করে উদ্ধবজী তত্ত্বজিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন।

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

যোগেশ যোগবিন্ন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ ॥
ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্ব্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ ॥ ১১

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তত্ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্ ॥ ১২

সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোঽন্যং বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপিনানুচক্ষে।
সর্ব্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ ॥ ১৩

তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যং।
নির্ব্বিণ্ণধীরহমু হ বৃজিনাভিতপ্তো নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৪

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব বললেন, হে যোগেশ! হে যোগবিন্ন্যাস! হে যোগাত্মন্! হে যোগসম্ভব। আমার পরম মঙ্গলের জন্য যে সন্ন্যাসলক্ষণ অর্থাৎ ত্যাগের উপদেশ আমাকে করলে, হে ভূমন্! তোমার অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ে যারা অত্যন্ত আসক্ত তাদের পক্ষে ঐরূপ কামনা ত্যাগ অত্যন্ত দুষ্কর বলেই আমার মনে হয়। ১১

আমি অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি তাই তোমারই মায়ায় রচিত যে পুত্র পৌত্র প্রভৃতি তাদের সঙ্গে আমার আত্মার সম্বন্ধ ঘটিয়ে 'অহং মমাভিমানে' আসক্ত হচ্ছি। তাই তুমি যে বিষয় বললে সেটি যাতে আমি সহজে সাধন করতে পারি, হে ভগবন্! সেইভাবে দয়া করে উপদেশ কর। ১২

ভগবান যদি বলেন, উদ্ধব! আমি তোমাকে সংক্ষেপে বললাম তুমি কিন্তু অন্যের কাছে বিস্তার করে বলবে—এই আশঙ্কায় উদ্ধব বলছেন, হে ঈশ, স্বপ্রকাশ, সত্যস্বরূপ আত্মা যে তুমি, তুমি ছাড়া আত্মার উপদেষ্টা দেবতাদের মধ্যেও কাউকে দেখতে পাই না। কারণ ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেহধারী বিষয়েতে অর্থবুদ্ধিযুক্ত। তাই সকলেই তোমার মায়াতে মুগ্ধ

হয়ে আছে। ১৩

অতএব পাপে আমার চিত্ত অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছে। তাই অত্যন্ত নির্ব্বিঘ্ন হয়ে সেই অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠবাসী অনবদ্য অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নরসখা নারায়ণ তোমার শরণাগত হচ্ছি। ১৪

শ্রীউদ্ধবজী স্তুতিপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানকে সম্বোধন করে বলছেন—হে যোগেশ! অর্থাৎ যোগ বলতে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এই তিনটিকেই বুঝায় তাই সকলেরই ঈশ্বর তুমি অতএব যোগবিন্যাস অর্থাৎ যোগে আমি অনধিকারী হলেও তুমি নিজের প্রভাবে আমার প্রতি সেই যোগ উপদেশ কর। হে যোগাত্মন্ যোগস্বরূপ অর্থাৎ তুমি নিজেই যোগ। তাই তোমাকে যদি আমি পাই তাহলে সকল যোগই আমার পাওয়া হবে—এইটিই উদ্ধবজীর বাক্যের তাৎপর্য্য। যত রকমের যোগই থাকুক কিন্তু এর মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। তাই ভক্তিযোগের দ্বারা যেভাবে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে জানা যায় এমনটি আর অন্য কিছু দিয়ে জানা যায় না। একথা ভগবান গীতাবাক্যেও অর্জুনকে বলেছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

—গীতা ১৮।৫৫

একমাত্র ভক্তিদ্বারাই ভগবানের স্বরূপ এবং ভগবানের বলতে যা কিছু তাঁর ধাম লীলা পরিকর সব সম্যক্‌রূপে জানা যায়।

তাই উদ্ধবজীর বক্তব্য হচ্ছে ভক্তিতেই যদি তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় তাহলে সেই ভক্তিযোগই আমাকে উপদেশ কর। শ্রীমান্ উদ্ধব বলছেন—'আমার মনে হয় জীবের পক্ষে কামনা বাসনা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। জীব বিষয়াসক্তি কিছুতেই ছাড়তে পারে না। কারণ সেটি আমি নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারছি। তোমার দুস্তরা মায়া জগতে এমনভাবেই বিস্তার করা আছে যে আমিও তার ফাঁদে পড়ে গিয়েছি। তাই তোমারই মায়াবিরচিত যে আমার দেহ এবং দেহসম্পর্ক যাদের সঙ্গে

আছে সেই স্ত্রী পুত্র বিষয় বৈভবে আমি মুগ্ধ হয়ে মজে আছি। সে বিষয়াবেশ আমার কিছুতে কাটে না। তাই তোমার শ্রীচরণে আমার একান্ত প্রার্থনা তুমি আমার সেই বিষয়াবেশ কাটিয়ে তারপর আমাকে জ্ঞানাদি উপদেশ কর। কারণ চিত্তে যতক্ষণ বিষয়াবেশ থাকবে ততক্ষণ তোমার দেওয়া উপদেশ আমি গ্রহণই করতে পারব না। তুমি বললে বলতে পার, আমার কাছে উপদেশ চাইছ কেন? আরও তো কত দেবতা আছে। তার উত্তরে কি বলি শোন—তুমি যে সত্যস্বরূপ, আত্মস্বরূপ। তাই তুমিই একমাত্র এই আত্মোপদেশ করতে পার। আর কেউ এমন কি কোন দেবতার পক্ষেও এ উপদেশ করা সম্ভব নয়। কারণ ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে সকল দেহধারীই তোমার মায়াতে মুগ্ধ হয়ে আছে। কাজেই যে নিজেই মায়ায় মুগ্ধ সে আবার অপরকে মায়াতরণের উপদেশ করবে কি করে?'

'হে ভগবন্! তুমি একমাত্র মায়ার অতীত স্বরূপ, তাই তোমার চরণে শরণাগতি নিচ্ছি।' ভগবান যদি বলেন, 'উদ্ধব! এমনও তো দেখা যায় বহু গুণের অধিকারী হলেও তার দুরাচারত্ব যায় না। আমার স্বরূপ যদি সেই রকম হয় তাহলে তুমি আমার চরণে শরণাগতি নিয়েও তো কিছু আশা করতে পারবে না।' উদ্ধব এই আশঙ্কা করে বলছেন, 'তুমি তা নও—এইজন্যই তো তোমাকে অনবদ্য বলে সম্বোধন করেছি। আবার যদি বল এমনও অনেক আছে যাকে সেবা করলেও ফলের সময় ফল দেয় না—ফল বিনাশ পায়। তুমি কিন্তু সেরকম নও। কারণ তুমি অনন্তপার অর্থাৎ কাল এবং দেশের অতীত স্বরূপ তুমি—অন্ত নেই বলে কালের অতীত, আর পার নেই বলে দেশের অতীত। আবার অকৃতজ্ঞ যে সে ফল দেয় না। কিন্তু তুমি যে সর্ব্বজ্ঞ তাই অকৃতজ্ঞ নও। তুমি রক্ষণে অসমর্থ তাও বলতে পার না কারণ তুমি যে ঈশ্বর। তুমি সবই করতে পার। অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠে তোমার বাস—তাই স্থান হিসাবেও সেটি সর্ব্বোত্তম। সুতরাং কোন দোষই তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তুমি বলতে পার, উদ্ধব! তোমার এ নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) কোথা থেকে এল? তার

উত্তরে বলি—আমি বিষয়-জ্বালায় জ্বলে মরছি। দুঃখের আগুন আমাকে অহরহ দগ্ধ করছে। যে অগ্নিতে দগ্ধ হয় সে যেমন নিজেকে বাঁচাবার জন্য শীতল আশ্রয় খোঁজে, আমার অবস্থাও তাই। তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুমি নারায়ণ অর্থাৎ নারস্য (মহৎস্রষ্টাদিপুরুষসমূহস্যাপি) পরমাশ্রয়, তুমি পরম কৃপালু কারণ তুমি নরসখা, নরমাত্রকে অনুগ্রহ করবার জন্যই তোমার আবির্ভাব এ জগতে। তাই তুমি কৃপা করে আমাকে উপদেশ কর! যাতে আমি "আমি আমার" এই অভিমান থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই তোমার পাদপদ্মেই শরণ নিলাম।' ১১-১৪

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ॥ ১৫

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥ ১৬

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্॥ ১৭

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া॥ ১৮

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরং।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥ ১৯

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ॥
অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ং।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মবিৎ॥ ২০

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

শ্রীভগবান বললেন, এ জগতে মানুষই একমাত্র লোকতত্ত্ববিচক্ষণ। তাই মানুষই আত্মা দ্বারা বিষয়বাসনা থেকে আত্মাকে উদ্ধার করতে পারে। ১৫

আত্মাই আত্মার হিতাহিত বিষয়ে গুরু। বিশেষ করে মানুষের তো বটেই। আত্মাই একমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা মঙ্গল লাভ করতে পারে। ১৬

সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রে যারা বিশারদ সেই সব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান আমাকে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষরূপে দর্শন করে। ১৭

একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ এবং অপদ প্রভৃতি পূর্ব্বসৃষ্ট

বহু শরীর আছে—কিন্তু এর মধ্যে পুরুষ (মানুষ) শরীর আমার সবচেয়ে প্রিয়। ১৮

যারা পুরুষ (মানুষ) শরীর পেয়েছে তারাই গৃহ্যমান গুণ, রূপ হেতু ও লিঙ্গ দ্বারা অনুমানে ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে আমি সেই আমাকে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। ১৯

এই বিষয়ে মহাতেজস্বী যদু এবং অবধূতের সংবাদ—যেটি প্রাচীন ইতিহাসে আছে সেটি উদাহরণরূপে দেখাচ্ছি।

একদিন ধর্মপ্রাণ যদুমহারাজ নির্ভয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে কোন এক তরুণ সুপণ্ডিত নিপুণদৃক্ অবধূত ব্রাহ্মণকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন। ২০

উদ্ধবজীর প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বললেন, "উদ্ধব, যত রকমের জীব আছে তার মধ্যে একমাত্র মানুষেরই বিচারবুদ্ধি আছে যা দিয়ে সে আত্মাকে উদ্ধার করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী এ বিবেক-বুদ্ধি পায় নি। কাজেই মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী আত্মাকে উদ্ধার করতে পারে না। জীব অর্থাৎ মানুষই আত্মাকে উদ্ধার করতে পারে। এখানে জীব বলতে মনুষ্যদেহধারীকে বুঝতে হবে। আত্মার গুরু হল আত্মা। হিতে প্রবৃত্তি আর অহিতে নিবৃত্তি করান গুরুর কাজ। এরই নাম গুরুত্ব। মনুষ্যদেহধারীই গুরুপদাশ্রয় করে। পশুদেহের কোন গুরু নেই। তারা নিজেরাই নিজেদের গুরু। পশুদেহে আত্মাই আত্মার গুরু। মনুষ্যদেহে বিশেষ বিবেক আছে যা অন্য কোন পশুদেহে নেই। এই বিবেকের বলেই সে আত্যন্তিক কল্যাণ অর্থাৎ শ্রেয়ঃ লাভ করতে পারে। আত্যন্তিক কল্যাণ কি সেটি বেছে নিতে হবে। বাজারে আলু পটোল কিনবার সময় বেছে নেওয়া হয় আর পরমার্থের বেলায় বেছে নেওয়া হবে না? পরমার্থও বেছে নিতে হবে। অন্য দেবতার ভজনে ক্লেশ বেশী অথচ ফল অল্প। সে ফল দুঃখময় তাও আবার অশাশ্বত। শ্রীভগবান বলেছেন—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

—গীতা ৭।২৩

যাদের অল্পবুদ্ধি তাদের আরাধনালব্ধ ফল স্থায়ী হয় না। কারণ সে ফলের অন্ত আছে কাজেই বিনাশী। দেবতাদের যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা দেবতাদের লাভ করেন আর যাঁরা আমার উপাসনা করেন তাঁরা আমাকেই পান। এই দুই উপাসনাতেই ক্লেশ সমান কিন্তু ফলের অনেক তারতম্য। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা মোক্ষরূপ অনন্ত ফলের অধিকারী হয়ে থাকেন। কৃষ্ণ উপাসনার ফল কিছু দেরীতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু যে ফল পাওয়া যায় সেটি শাশ্বত এবং নিশ্চিত। ভগবান বললেন—

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।

—গীতা ৪।১২

মনুষ্যলোকে কর্মজনিত ফল শীঘ্র লাভ হয়।

কৃষ্ণভজনের যে কর্ম তা কর্ম নয়। এর নাম নৈষ্কর্ম। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলেছেন—'ভক্তিরস্য ভজনম্। তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুষ্মিন্নেব মনংকল্পনম্—এতদেব নৈষ্কর্ম্যম্।' ভগবানের নাম, রূপ, গুণ লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন—এসব কর্মের মত দেখতে হলেও কর্ম নয়—একে কর্ম বলা যাবে না। কর্ম হল কয়লা, তার ময়লা যায় না কিছুতেই। কয়লাকে জল দিয়ে ধুলে বা সাবানজলে ধুলে দুধ দিয়ে ধুলেও তার কাল রঙ্ কিছুতে যাবে না কিন্তু অগ্নিস্পর্শমাত্র যেমন তার কাল রঙ্ দূর হয়ে রাঙা হয়ে যায় তেমনি ভগবানরূপ অগ্নির স্পর্শ পেলে কর্মকয়লারও ময়লা ছুটে যায়। কর্মকয়লা ফলরূপ দাগ লাগায়। কর্ম যদি গোবিন্দ সম্পর্কিত হয় তাহলে আর দোষ থাকে না। নৈষ্কর্ম থেকে যে সিদ্ধি তা দেরীতে ফলে বটে কিন্তু একবার এ ফল পেলে আর হারাতে হয় না। এটি নিশ্চিত ফল। ফল না দিয়ে তিনি কিছুতেই থাকেন না। ভগবান কৃতজ্ঞ। কাজেই ফলদান তিনি অবশ্যই করবেন।

ব্রহ্মা শিব যাঁর আজ্ঞা বলে চলেন—

‘সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। —ভাঃ ২।৬।৩১

সেই ভগবান ফল নিশ্চিত দান করেন। গোবিন্দকে ভজন জানাতে হয় না। তিনি সব জানেন।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

—গীতা ১৩।১৪

ভজন তাঁকে জানাতে হলেই বিপদ। গোবিন্দ যে কথা বলেন না এ পরম দয়া। গোবিন্দ কথা বললেই বিপদ। ছেলে বড় হলে যৌন বিকারে বিকৃত হলে যেমন মায়ের সান্নিধ্যে থাকতে পারে না তেমনি বিষয় বিকার জীবকে এমনই বিকৃত করেছে যে সে গৌর গোবিন্দ সান্নিধ্যে যেতে পারে না। ভগবানের শিরঃ অর্থাৎ মস্তক সর্ব্বত্র পাতা আছে। মাথায় থাকে চিন্তা। সব বিষয়ে তাঁর চিন্তা আছে। প্রতিটি জীবের কাছে তিনি কান পেতে আছেন। কেউ যদি মনে মনে তাঁর নাম করে সেই মনের কাছে তিনি কান পেতে আছেন। প্রেমানন্দদাসজী বলেছেন—

“জাতিকুলাচারে কি করিবে তারে
সে হরি যে ভজে তারই—”

পুত্র যদি পিতামাতার সামনে যথেচ্ছ আচরণ করে তাহলে পুত্র-মমতায় পিতামাতা কিছু বলতে না পারলেও মনে প্রাণে ব্যথা পান, আবার পুত্র যদি অনুকূল আচরণ করে তাহলেও পিতামাতা সুখী হন। তেমনি জীব যদি নিজ প্রবৃত্তি বশে যথেচ্ছ আচরণ করে বিষয়সেবায় মগ্ন হয়ে থাকে তাহলে সর্ব্বপিতা গোবিন্দ ব্যথা পান আবার জীব যদি গোবিন্দসেবা করে অর্থাৎ অনুকূল আচরণ করে তাহলে গোবিন্দ সুখী হন।

কর্দম ঋষি যখন পত্নীকামনায় তপস্যা করেছিলেন তখন ভগবান তাঁকে বলেছিলেন—“ঋষি, আমার আরাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না।” গীতা-বাক্যেও ভগবান বলেছেন —

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ —গীতা ২।৪০

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলেছেন—এখানে অন্য কোন যোগ নিলে চলবে না—ভক্তিযোগ নিতে হবে। ভক্তিযোগে বিনাশ বলে কিছু নেই। যতটুকু করা যায় ততটুকুই ফল। কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগ মার্গ আরম্ভ করলে তার কোন ফল নেই। সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলে তবে তার ফল কিন্তু ভক্তিযোগ তা নয়। অজামিল তো একবার নারায়ণ বলেছিলেন—তার পরই তো তাঁর মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু তাঁর সেই নারায়ণ নাম উচ্চারণ তো ব্যর্থ হয় নি। তার ফল তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু জ্ঞান, যোগ বা কর্মে এমনভাবে ফললাভের হিসাব নেই। ভক্তিযোগের অল্প অনুষ্ঠানও মহৎ ভয় থেকে রক্ষা করে। মহৎ ভয় বলতে সংসার-ভয়কে বুঝাচ্ছে। যা যোগীন্দ্র মহারাজ নিমির সভায় বলেছেন—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥
—ভাঃ ১১।২।৩৫

ভক্তিযোগে কোন বিনাশ নেই। কর্মের অনুষ্ঠানে শতধা বিঘ্ন। যোগমার্গেও বহু অন্তরায়। নিখুঁতভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করলেও তার ফল স্বর্গ। কিন্তু সে স্বর্গভোগের অধিকার কতক্ষণ?

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। —গীতা ৯।২১

পুণ্য শেষ হলেই আবার মর্ত্ত্যে ফিরে আসতে হবে। নিখুঁতভাবে যোগ সাধনের ফল পরমাত্মসাক্ষাৎকার। নিখুঁতভাবে জ্ঞানসাধনের ফল ব্রহ্মানুভূতি। কিন্তু কৃষ্ণদাস অভিমানের আনন্দের কাছে এইরকম কোটি ব্রহ্মানুভূতিও তুচ্ছ হয়ে যায়। মহাজনবাক্য আছে—

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু রে
কোটি ব্রহ্মানন্দ তার আগে নয় এক বিন্দু রে॥

ভগবানের কথামৃতকে সাগর বলা আছে—এ আনন্দ প্রচুর আনন্দ—এ

আনন্দের ওজন কত? অন্বয়মুখে এ ওজন কত দেখান যাবে না কিন্তু ব্যতিরেকমুখে এ আনন্দের পরিমাণ বুঝান যেতে পারে। এ আনন্দের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ তৃণতুল্য জ্ঞান হয়। জ্ঞান বা যোগমার্গে অধিকারী নির্ব্বাচন করা হয়েছে। এ জগৎ এবং ও জগতের অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক—দুই লোকের সর্ব্ববাসনা নির্মুক্ত হয়ে বেদনিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম বর্জন করে নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা কর্ম অনুষ্ঠান করে শম, দম উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান ও শ্রদ্ধা লাভ করে তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হবে—এই আশয়ে 'অথ' শব্দ বসিয়ে আচার্য্য বেদব্যাস সূত্র করলেন—

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' —ব্রঃ সূঃ ১।১।১

এই জ্ঞানযোগে অধিকার তাই সহজ নয় বিশেষতঃ কলিজীবের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্রহ্মানন্দ বড় না কৃষ্ণানন্দ বড় বিচার হবে কি করে? অন্বয়ব্যতিরেকমুখে দেখাতে হবে। ভক্তিযোগ থেকে ব্রহ্মানন্দ লাভ করবার জন্য কেউ আগ্রহ করেনি। কিন্তু ব্রহ্মানন্দী ভক্তিরসে লুব্ধ হয়েছে। এর বহু দৃষ্টান্ত আছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাঽপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

—ভাঃ ১।৭।১০

ভগবান হরি এমনই গুণসম্পন্ন যে আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করে নিজ পাদপদ্মে ভক্তিরসে লুব্ধ করায়। তাই বলা হয়—

ব্রহ্মানন্দ হইতে কোটিগুণ লীলারস
আত্মারামে আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণবশ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণে আছে যে চন্দনমিশ্রিত তুলসী—তার গন্ধ যখন গন্ধবহ বাতাস নিয়ে সনকাদি ঋষির নাসিকায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে তখন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার—এই চতুঃসন যাঁরা আদি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল। তাঁরা ভক্তিরসে লুব্ধ হলেন।

তাঁদের দাস হতে বাসনা হল। তাও এ তো বৈকুণ্ঠনাথের শুধু চন্দন-মিশ্রিত তুলসীর গন্ধের প্রভাব। সমগ্ররূপ লাবণ্যের প্রভাব নয়। এর ওপরে বিগ্রহমাধুর্য্য, গুণমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য—এত মাধুর্য্য-সাগর যিনি সেই ভগবানকেই ভজতে হবে। ভগবানকে ভক্তির দ্বারাই ভজতে হবে। ভগবানও বলেছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

—গীতা ১৮।৫৫

ভক্তি দ্বারাই আমাকে সম্যক্‌রূপে জানা যায়—আমি কেমন, আমার স্বরূপ, আমার ধাম, লীলা, পরিকর সম্পূর্ণ করে জানা যায় একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারা। এই ভক্তি অঙ্গ যাজনে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনে কোন বাধা নেই। বিশেষ করে নামগ্রহণ বিষয়ে বলা হয়েছে—

খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয় রে।
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয় রে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অভিন্নতনু শ্রীনিত্যানন্দকে বলেছেন—

নয়নে দেখিবে যারে নামপ্রেম দিও তারে
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।

১০৮ শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করেছেন—

কোন বিধিনিষেধ দিও না নিতাই
আমার কলিজীব বড় দুঃখী—

কলিজীব মায়ার ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে নিরন্তর। মহাপ্রভু তাঁর নিজ চরণছায়ায় তাদের আশ্রয় দিয়ে শান্ত করেছেন। মহাপ্রভু মুকুন্দ বাসুদেবকে নিজ চরণরূপ আতপত্র দান করেছেন। এই নামোচ্চারণ বা ভক্তিঅঙ্গ যাজনের একমাত্র অধিকারী মনুষ্যদেহ। ভগবানকে লাভ করলে আর কিছু লাভ করার বাকী থাকে না।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

—গীতা ৬।২২

ভগবানের আরাধনা কখনও বিফল হয় না। মানুষই ইচ্ছা করলে

আত্মজ্ঞান লাভ করতে ও ভগবদ্দর্শন লাভ করতে পারে।

পশুশরীরে আত্মাই হিতাহিতজ্ঞানে গুরু। তাদের আর কোন গুরু নেই। পুরুষদেহে অর্থাৎ মনুষ্য দেহে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ভগবানের পক্ষ নিয়ে স্বামিপাদ তুলছেন—

“পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞানং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদ শ্বস্তনং বেদলোকালোকৌ মর্ত্যেনামৃতমীপ্সত্যেবং সম্পন্নোঽথেতরেষাং পশূনামশনা পিপাসে এবাভিজ্ঞানমিতি হীত্যাদি।”

কারণ শ্রুতি অনুগত না হলে ভগবানের বাক্যও গৃহীত হবে না। বুদ্ধ ভগবানের অবতার। ভগবান বলে তাঁকে সকলে প্রণাম করে কিন্তু তাঁর বাক্য ‘অহিংসা পরমো ধর্মঃ’ কেউ গ্রহণ করে নি। কারণ তা বেদানুগত নয়। বেদ বললেন—‘যজ্ঞে পশুমালভেত।’ কাজেই যজ্ঞে পশুহিংসার বিধান দিয়েছেন। তাই অহিংসা পরম ধর্ম হতে পারে না। কারণ বেদবহির্ভূত বাক্য পরম ধর্ম হবে কেমন করে? পরম ধর্ম কি—সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বললেন—

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥
—ভাঃ ১।১।২

যে ভক্তিধর্মে মুক্তিবাসনা পর্য্যন্ত নিরস্ত হয়েছে সেই ভাগবতধর্মই পরম ধর্ম—এইটিই আচার্য্য বেদব্যাস মন্তব্য করেছেন। শ্রীউদ্ধবজীর প্রশ্নের উত্তরে ভগবান ধর্মের লক্ষণ করেছেন—

ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ জ্ঞানং চৈকাত্ম্যদর্শনম্।
—ভাঃ ১১।১৯।২৭

অন্যত্র ধর্ম কাকে বলে বলা হয়েছে—যমদূতদের বাক্যে—

বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ —ভাঃ ৬।১।৪০

বেদাদিশাস্ত্রে অন্য ধর্মও বলা আছে—যেমন বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম—এ সবই

ধর্ম বটে কিন্তু ভাগবতে পরমধর্ম বলা হয়েছে। কেবল ধর্ম নয় যমরাজ যমদূতের কাছে পরমধর্মের লক্ষণ করলেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ —ভাঃ ৬।৩।২২

ভগবানে ভক্তিযোগই পরম ধর্ম। এখন ভক্তি কি বুঝতে হবে। এই ভক্তি কি বলতে গিয়ে বললেন—তন্নামগ্রহণাদিভিঃ। নাম 'গ্রহণ' পদের দ্বারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন সব বুঝাচ্ছে। চক্ষুর দ্বারা, কর্ণের দ্বারা, চিত্তের দ্বারা গ্রহণ—প্রহ্লাদজীও এই শ্রবণ কীর্ত্তনের কথাই বলেছেন।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসাপিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

—ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪

তাহলে দেখা যাচ্ছে শুদ্ধ ভক্তিযোগই পরম ধর্ম। ভক্তির মধ্যে যদি অন্য কোন কামনা মেশান থাকে তাহলে সেই ভক্তিকেও পরম ধর্ম বলা হবে বটে কিন্তু যদি কামনাশূন্য ভক্তি হয় তাহলে তার নাম হবে প্রোজ্ঝিতকৈতব। আচার্য্য বেদব্যাস এই প্রোজ্ঝিতকৈতব ভক্তিযোগকেই পরমধর্ম বলেছেন। কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণেতর বস্তু প্রার্থনার নামই কপটতা। এই আশয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

দড়িকে সাপ মনে করে দড়ি ভুলে গিয়ে ভয় হয়েছে। যার জন্য ভয় সেটি মিথ্যা কিন্তু সেই ভয়জনিত যে ঘাম দেহক্লান্তি তা কিন্তু সত্য। তেমনি জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই সত্য ভুলে জন্মমরণের ক্লেশ, কিন্তু এই জন্মমরণের ক্লেশরূপ ঘাম সত্য। গোবিন্দের অংশ জীব—এটি ভুল হয়েছে। তার ফলে ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত এই যে অভিমান জেগে উঠেছে সেটি

মিথ্যা। এক বিন্দু জলে আর এক বিন্দু মিশে ধারা তৈরী হয়—বিন্দু সিন্ধুর অংশ। কিন্তু এক বিন্দুতে তা বুঝা যায় না কিন্তু পর পর বিন্দু যোগে যখন তাতে ধারা নামে তখন দেখা যায় তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সাগরের দিকে। খাল, বিল, নদী পূর্ণ করে সাগরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সেই বিন্দু সার্থকতা লাভ করে। জীবও তেমনি গোবিন্দের অংশ। কিন্তু জীব রস কোথায় পাবে? সাধু গুরু বৈষ্ণবের কাছ থেকে রস নিয়ে গোবিন্দকে দেবে। এর নাম স্বরূপানুবন্ধি সেবা। গীতায় ভগবান বললেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ —গীতা ১৫।৭

শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবান বলেছেন উদ্ধবজীর কাছে—

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ। —ভাঃ ১১।১৬।১১

সূক্ষ্মবস্তুর মধ্যে আমি হলাম জীব।

জীবের প্রকৃতি পতিব্রতা রমণীর মত। পতিব্রতা রমণীর লক্ষণ—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে বিয়োগে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ জ্ঞেয়া সা পতিব্রতা॥

পতি আর্ত্ত হলে পত্নী আর্ত্তা, আনন্দিত হলে আহ্লাদিতা, পতিবিরহে পত্নী মলিনা কৃশা হয়, পতির মরণ হলে পত্নীরও মৃত্যু হয়—এইটিই পতিব্রতা রমণীর লক্ষণ। তাও তো পত্নী পতির অংশ নয়—সে ভাবনায় পতিকে প্রিয়বুদ্ধি করে তাতেই তার এই অবস্থা। এই পতিব্রতা রমণীর চেয়ে জীব আরও বেশী পতিব্রতা। কারণ জীব ভগবানের শক্তি এবং অংশ। এখন এই এই পতিব্রতাকে যদি ভূতে ধরে পাড়ার সকলেই জানে যে সে পতিব্রতা। কিন্তু তাকে ভূতে ধরলে সে প্রথমে নিজেকে ভোলে তারপর পতিকে ভোলে। তখন ওঝা ডেকে তাকে চিকিৎসা করতে হয়। জীবও পতিব্রতা নারীর মত। তাকেও মায়াভূতে ধরেছে। সাধু শাস্ত্র সবাই জানে জীব পতিব্রতা—সে গোবিন্দের অংশ। গোবিন্দভাবিনী জীব। তার মায়া-ভূত ছাড়াবার জন্য সাধু শাস্ত্র গুরু ওঝা ডাকা হল। তাদের প্রভাবে মায়া পিশাচী পলায়। জলবিন্দুর স্বরূপস্থ ধর্ম সিন্ধু-

সঙ্গম। কিন্তু বিন্দুতে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিন্দুর স্বভাব তার মনের মধ্যেই থাকে—কাউকে প্রকাশ করতে পারে না। তার মনে থেকে মনেই লুপ্ত হয়ে যায়। দরিদ্রের অভিলাষের মত।

"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।"

এই জলবিন্দুর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যদি বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু মিশিয়ে মিশিয়ে ধারা তৈরী করতে পারা যায়। বিন্দুসমূহের সংযোগে সে যখন ধারা নেবে তখন তার স্বভাববশে সিন্ধুর দিকেই গড়াবে। ভগবানের নামগ্রহণে তেমনি জীব বিন্দু ধারা নেবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ে গৌর বলে যেতে হবে। বলতে বলতেই দেখা যাবে জীব বিন্দু ধারা নিয়েছে। তখন তার স্বভাববশে গৌর গোবিন্দ পাদপদ্মের দিকেই গড়াবে। ভূতে ধরা পতিব্রতা নারী যেমন পতি পায় না, আগে তার স্বরূপবিস্মৃতি ঘটেছে পরে পতিবিস্মৃতি। জীবের বেলায় কিন্তু একটূ পার্থক্য আছে—জীবের আগে গোবিন্দবিমুখতা পরে স্বরূপবিস্মৃতি। তার ফলে বিপর্য্যয় দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। এখানে গোবিন্দবিমুখতার ফলে মায়ার আক্রমণ। ওখানে কিন্তু পতিবিস্মৃতির ফলে ভূতগ্রস্ত অবস্থা নয়—এইটিই তফাত। ভূতগ্রস্থা নারী পতি ছেড়ে অন্য পুরুষসঙ্গ কামনা করলে ভ্রান্তি। তখন তাকে সাবধান করতে হবে। গোবিন্দ ছাড়লেই ধর্ম, অর্থ, কাম বাঞ্ছা আসবে। শাস্ত্র যে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে তাতে জীবকে শাস্ত্রানুগত হতে হবে। সমস্ত বেদাদিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু ভগবান। তাই ভগবান বললেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।"

—গীতা ১৫।১৫

সর্ব্ববেদ বলতে কর্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড সকলকে বুঝাচ্ছে। কর্মকাণ্ড উপদেশের দ্বারা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ স্বর্গসুখ দিয়ে আনন্দের নেশা বাড়িয়েছে। সত্যব্রত মনুমহারাজের কাছে মৎস্যরূপী ভগবান যেমন ঘট, কলসী, ক্ষুদ্র জলাশয়, বৃহৎ জলাশয়, নদী,

অবশেষে সাগরে রাখবার জন্য আদেশ করলেন জীবের ধাতও তাই। পিঁপড়ে একটু চিনি পেলেই সন্তুষ্ট কিন্তু যতই উঁচুস্তরের জন্ম ততই আনন্দের নেশা বেশী। অবশেষে জীব যখন মানুষ দেহ পেল তখন তার আনন্দের মাত্রা সর্ব্বাধিক হল। সে তখন শাস্ত্ররূপ মনুকে বলল—'আমার জাগতিক কোন আনন্দে তৃপ্তি নেই। আমাকে গোবিন্দপাদ-পদ্ম-মাধুর্য্যসাগরে নিয়ে চল। জীব সেই মাধুর্য্যসাগরে থাকতেই অভ্যস্ত কিন্তু দুর্দৈববশে এই মায়ার জগতে এসে পড়েছে। কিন্তু জাগতিক আনন্দ-রূপ ক্ষুদ্র জলাশয়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সে সাগরে যেতে চায়। কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাই জীবের স্বরূপধর্ম। এ ছাড়া আর সব বিধর্ম। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এদের শাস্ত্র ধর্ম বললেও এ আপাতধর্ম, প্রকৃত ধর্ম নয়। পতিসেবা ভিন্ন অন্য পুরুষের সেবা ভ্রান্তি। পতিসেবা করলে তবে স্বরূপ প্রাপ্তি। তেমনি জীব যতক্ষণ গোবিন্দসেবা না করছে ততক্ষণ তার স্বরূপ প্রাপ্তি হচ্ছে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাই বললেন—

"প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে ভব নাশ পায়।"

ধর্ম, অর্থ, কাম কপটতা। এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত কপটতা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বললেন—

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।"

ধর্ম, অর্থ, কাম চেষ্টায় কৃষ্ণভক্তি মন্দীভূত হলেও থাকে। একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু মুক্তিবাঞ্ছায় কৃষ্ণভক্তি একেবারে অন্তর্হিতা হন। তাই একে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপটতা বলা হয়েছে। গোবিন্দসেবাই হল জীবকান্তার পাতিব্রতা। বেদব্যাসের দৃষ্টি এইখানে পড়েছে। তাই প্রোজ্ঝিতকৈতব বলতে মুক্তিবাঞ্ছাকে নিরস্ত করা হয়েছে। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামিপাদ বললেন—

"'প্র'শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।"

ভক্তিযোগের গরিমা এইখানে। সে কোথাও হাত পাতে নি। যদি গোবিন্দ তাঁর নিজের প্রয়োজনে কখনও হাত পাতেন তাহলে দেয়। ভক্তিযোগ দিতে চায়—নিতে চায় না। বেদ সারাংশ গীতা ভাগবত-

অনুগত বাক্য নিতে হবে। ভগবান উদ্ধবজীর কাছে বলছেন—মানুষ আত্মাকে দেখে ও আমাকে দেখে। মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞা দেওয়া আছে। শ্রুতি-অনুগত বাক্য ভগবান বলছেন কারণ শ্রুতিবাক্য না হলে ভগবানের বাক্যও নেওয়া চলবে না।

প্রতিটি জীবের মধ্যেই আত্মা আছে। কিন্তু কোথাও স্ফুট কোথাও বা অস্ফুট। শাক, ডাঁটা, ফল, ফুল এ সবে অস্ফুট চৈতন্য তাই তাদের হত্যায় ব্যথার অনুভূতি কম। কিন্তু মানুষ স্ফুটচৈতন্য তাই তার হত্যায় বেদনা বেশী। যাতে বেদনা যত বেশী তাদের হত্যায় তত বেশী পাপ। যত চেতনা কম তত ব্যথা কম। যত ব্যথা কম তত পাপ কম। মানুষের মধ্যে আবার যে জ্ঞানে ন্যূন তাকে হত্যা করলে পাপ কম। যে জ্ঞানে অধিক তাকে হত্যা করলে বেশী পাপ। জ্ঞানাংশে তারতম্য। পুরুষদেহ (মনুষ্যদেহ) সবচেয়ে স্ফুটচৈতন্য। মানুষে আত্মার খাঁটি চেহারা খোলে। মনুষ্যদেহের আত্মা প্রজ্ঞানের দ্বারা সম্পন্নতম হয়। প্রজ্ঞানের দ্বারাই হয়, ধনের দ্বারা হয় না। আগামী কাল কি করব—এটি মানুষই করতে পারে। লোকালোককে জানে অর্থাৎ স্বর্গ নরক জানে। লোক স্ফুট অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ আর অলোক অস্ফুট অপ্রকাশ অর্থাৎ স্বর্গ নরক মানুষই জানে। মর্ত্ত্যেন অমৃতম্ ঈপ্সতি। মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্মশীল এই দেহকে সাধন করে অমৃতকে পাবার অভিলাষ করে। জগতে এই মনীষারই দাম। এ জগতে ক্ষুধারই দাম, খাদ্যের কোন দাম নেই। ঘরভরা খাদ্য থাকলেও ক্ষুধা না থাকলে কোন কাজে লাগে না। শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবানের এই বাণীটি—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥ ভাঃ ১১।২৯।২২

এই শ্লোকটি ক্ষুধা জাগান বাণী। ভজনযোগ্য ক্ষুধা জাগিয়ে দেয়। কাণাকড়ি দিয়ে যদি কেউ একটাকা, একশ টাকা, হাজার টাকা, পরশমণি, চিন্তামণি রোজগার করতে পারে পর পর উৎকর্ষ। কাণাকড়ির চেয়েও অধম এই দেহ দিয়ে যদি অমৃতত্ব লাভ করতে পারা যায় তার চেয়ে

বুদ্ধিমত্তা আর নেই। কাণাকড়ির চেয়েও দেহ অধম কেন? কাণাকড়ির কিছুক্ষণ স্থিতি আছে, তাকে হাতে পাওয়া যায় কিন্তু এই দেহের স্থিতিকাল নেই। দেহকে হাতে পাওয়া যায় না। গোবিন্দভজন করবার জন্য উপদেশ দিতে হয় কিন্তু সংসার করতে উপদেশ দিতে হয় না। দেহ মিথ্যা—কারণ মূল উপাদান মায়া মিথ্যা। সত্যকে মিথ্যার দ্বারা, অমৃতকে মরণধর্মের দ্বারা রোজগার করতে হবে। ভগবদ্ভজনের বুদ্ধি মনুষ্যদেহ ছাড়া জাগে না। এই ধনের দ্বারা মনুষ্যদের সম্পন্নতম হয়। অন্য প্রাণীর ক্ষুধাপিপাসা জ্ঞান মাত্র আছে কিন্তু বিবেক বলে কিছু নেই। এ জগতে প্রাণিবর্গের মধ্যে এক দ্বি, ত্রি, চতুষ্পাদ বহুপাদবিশিষ্ট প্রাণী আছে কিন্তু সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যদেহ ভগবানের সবচেয়ে প্রিয়। কারণ মনুষ্যদেহেই একমাত্র গোবিন্দ সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়। গোবিন্দভজনযোগ্য এই দেহ দিয়ে আমরা বিষয় ভোগ করছি। জাগতিক ধন দিয়ে ধর্মকাজ করা হলে সে ধন সার্থক। গোবিন্দভজন করব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীব মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়। মহাজন বলেছেন—

সপ্তম মাসেতে যবে জননী জঠরে রে।
উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে ডাকিলে কাতরে রে॥

বলে হে দীননাথ, আমায় দয়া কর—এবার আমায় জনম দাও হে—এবার জন্মে তোমায় ভজব। কিন্তু

ভূমিষ্ঠ হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল রে।
প্রণব জঠর স্মৃতি অন্তর্হিত হইল রে॥

বার্দ্ধক্যে হরিভজন হয় না—

এলো রে বার্দ্ধক্য ঐ অতীব ভীষণ রে।
শুভ্র কেশ লোলচর্ম কোটরে নয়ন রে॥

যে ভিখারী ভিক্ষায় বের হয় সন্ধ্যাকালে সে ভিখারীর কি ভিক্ষা মেলে?
—শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের বাণী।

একক্ষণ ভগবদ্ভজনে এক কোটিরও বেশী রোজগার হয়। আমরা নিজেদের স্বার্থ বুঝি না। অজ্ঞ শিশু কালসর্পরূপ মৃত্যুকে যেমন স্নেহ-

ভরে আলিঙ্গন করে আমরাও তেমনি অজ্ঞ শিশুর মত বিষয়ভোগরূপ মৃত্যুকে নিত্য আলিঙ্গন করছি। মন আমাদের মায়ার আক্রমণে নিত্যই অসুস্থ। তাই বিচারের আঘাত নিত্য করতে হবে। এ মনুষ্যদেহ বিষয়ভোগের জন্য নয়। বিষয়ভোগের ফল কেবল দুঃখ। মানুষকে মরতেই হবে।

অদ্য বাব্দশতান্তে মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ। —ভাঃ ১০।১।৩৮

এ জগতে যারা সুখ চায় পরে তাদের জন্য দুঃখ তোলা থাকে। চব্বিশ ঘণ্টা হরিভজন করবার মত ভাগ্য আমাদের নেই। মনুষ্যদেহ বিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। স্বার্থ কি বুঝতে হবে। স্বার্থ—স্ব অর্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন। এখানে স্ব মানে বুঝতে হবে। স্ব মানে আত্মা। তার প্রয়োজন বুঝতে হবে। কিন্তু আমরা স্ব বলতে দেহকে বুঝে রেখেছি—তা কিন্তু ঠিক নয়। দেহ হল খাঁচা আর তার মধ্যে পাখী হল আত্মা। পাখীকে দানা দিতে হবে—এ দানা হল ভগবানের নাম—ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন—

হরিগুণকীর্ত্তনং হি আত্মনো ঘাসঃ।

মনুষ্যদেহকে মুক্তির দ্বার বলা হয়েছে। মনুষ্যদেহ জননী হয়ে মুক্তি সন্তানকে প্রসব করবে। নরতনু ভজনের মূল। ভজন বলতে কি বুঝায় প্রহ্লাদজী নবধা ভক্তি অঙ্গ যাজনে সব বলেছেন। আমরা মনে করি বটে সব বুঝি কিন্তু আমাদের বুঝবার মধ্যে গলতি আছে। সংসার যা একান্ত দুঃখময় তাকে সুখ বলে মনে করি। এ যেন নিমপাতার রসকে পেস্তার সরবৎ বলে মনে করা—সাদৃশ্য হল সবুজ রং। চুরাশি লক্ষ দেহ কৃমি কীট, স্থাবর জঙ্গম সব দেহ যে আমি হয়েছি এ কথা আমাদের মনে নেই। মনে থাকলে কাজ হত। আমরা তাহলে ভজনে প্রবৃত্ত হতাম। ভজনের জন্যই ভগবান মনুষ্যদেহ দান করেছেন। মনুষ্যদেহদানের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। একমাত্র ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্য যে কোন কাজই মানুষ করুক না কেন সবই অন্য দেহে করা হয়ে গেছে। আমরা জাতিস্মর নই, তাই মনে থাকে না। যারা জাতিস্মর

তারা স্বভাবতই ভজনানুরাগী হয়। আবার যদি সকলেই জাতিস্মর হত তাহলে সকলেই গোবিন্দভজন করে গোবিন্দপাদপদ্ম লাভ করত, তাহলে সৃষ্টিকাজ ব্যর্থ হয়ে যেত। সৃষ্টি লোপ পেত। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত। এর উপাদান প্রকৃতি। তাই সজাতীয়তা বোধে ইন্দ্রিয় কেবল প্রাকৃত বিষয়ভোগ করতে চায়। ইন্দ্রিয়, দেহ, মন, বুদ্ধি সবই মায়ার চর—এদের দিয়েই মায়ার বিরোধী কাজ করাতে হবে। মায়ার চরের দ্বারা মায়াধীশের কাজ করাতে হবে। নন্দবংশ ধ্বংস করবার জন্য চাণক্য তাঁর লোককে কর্মচারিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের দিয়ে নন্দবংশ কখনও রক্ষা হয় না, ধ্বংস হবেই। আমরা প্রাকৃত কথা দু ঘণ্টা করতে পারি কিন্তু আধ ঘণ্টা হরিকথা বলতে আলস্য হয়। এর কারণ কি? দেহ, ইন্দ্রিয় সব মায়ার রাজ্য, এগুলি সঙ্গে করে আনা হয়েছে। এ ছাড়া আর যা কিছু—ঘরবাড়ী, টাকাকড়ি, জমিজমা, স্ত্রীপুত্র সব পাতান সম্বন্ধ। দেহ, ইন্দ্রিয় চাণক্যের নিযুক্ত কর্মচারী অর্থাৎ মায়ার কর্মচারী। আমি নন্দবংশ তাই আমার রাজ্য রক্ষা করা কঠিন। নন্দবংশ ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু আমার তো ধ্বংস হলে চলবে না। মায়া কর্মচারী নিযুক্ত করেছে বটে কিন্তু সে কর্মচারীকে প্রভু করে পাঠায় নি। ভৃত্য করে পাঠিয়েছে। তাই তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। মায়ার অনুচর দিয়ে মায়াধীশের কাজ করিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সাধু, গুরু, বৈষ্ণব কানের কাছে চুপি চুপি বলে গেলেন মায়ার চরের দ্বারা মায়াধীশের কাজ করিয়ে নাও—এর দ্বারাই মায়া জয় হবে। এতদিন মায়ার কাজ করে করে কারাগারে থাকার মেয়াদই বাড়ান হয়েছে। সম্রাটের আগমনে সকল কারাবন্দী মুক্তি পায় এ জগতেও নিয়ম আছে। কিন্তু সম্রাটকে তো জোর করে আনা যাবে না। তিনি নিজের খেয়ালে আসবেন। শ্রীগোবিন্দ সম্রাটের সম্রাট—এই সম্রাটকে আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে উদয় করাতে পারলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি। এখন প্রশ্ন হতে পারে গৌর গোবিন্দ তো বলা হচ্ছে কিন্তু মায়ামুক্তির তো কোন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। মুক্তি হয়েছে কিন্তু বুঝা যাচ্ছে না। যাবার সময় বুঝা যাবে।

ঠাকুর হরিদাস সারাজীবন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সাধন করে শেষ সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা জানান—

হৃদয়ে ধরিব তোমার কমলচরণ
নয়নে হেরিব তোমার ও চাঁদবদন।
জিহ্বায় উচ্চারিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম
এইমত ইচ্ছা মোর ছাড়িব পরাণ।

শ্রীহরিদাস নির্য্যাণে ভীষ্মের নির্য্যাণ স্মরণ হয়। ভীষ্মের প্রার্থনা ছিল—

স দেবদেবো ভগবান্ প্রতীক্ষত্যাং কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহম্।
—ভাঃ ১।৯।২৪

এর চেয়েও হরিদাসের প্রার্থনা আরও বেশী। মহাপ্রভু বললেন—

হরিদাস তুমি যাহা কিছু মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥

গৌর তো নিজেকে ভগবান বলবেন না—তাই কৃষ্ণ পূরণ করবেন এই কথাই বললেন। নামের ফলে মুক্তি হয় এ তো সামান্য কথা—শ্রীমদ্ভাগবত বললেন নামাভাসে মুক্তি হয়। এ কথায় যদি কেউ আপত্তি করেন তার জন্য অজামিল সাক্ষিরূপে দাঁড়িয়ে আছেন। নামাভাসে যে মুক্তি হয় এ তো অর্থবাদ নয়। নাম করব বলে যে মনে করে তার পাপ-অন্ধকার দূরে পলায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অন্ধকাররাশির মত। এ কথা মিথ্যা নয়। কারণ শাস্ত্র তো ঘুষ খায় না—তাই তার মিথ্যা বলে লাভ কি? ভগবানের উদ্দেশ্যে যখন নাম উচ্চারিত হয় তখন তার নাম আর অন্য উদ্দেশ্যে যদি ভগবানের নাম করা যায় তার নাম নামাভাস। কয়লা যেমন অগ্নিস্পর্শে, অন্ধকার যেমন সূর্য্যস্পর্শে জব্দ হয় মায়া তেমনি মায়াধীশের সংস্পর্শে জব্দ হয়। নাম-সূর্য্যের উদয়ে পাপ-অন্ধকার নাশ পায়।

ভগবানের নাম চিন্ময়, ইন্দ্রিয় প্রাকৃত তাই তারা পরস্পর বিজাতীয়। বিজাতীয় স্পর্শ তাই প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে এত কষ্ট হয়। করা যায় না। ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা সবই চিন্ময়।

লীলার চিন্ময়ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

যস্তূত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ ॥
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥

—ভাঃ ১২।৩।১৫

লীলা চিৎ। গীতাসাগরে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ, অর্জুন উবাচ—এগুলি গীতা-বাক্য না হলেও সাগরে কলসীর জল মিশে যেমন সাগরের জল হয়ে যায়, তার যেমন পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, এও তেমনি। গীতা-সাগরে পড়ে এ বাক্যগুলিও গীতাবাক্য হয়ে গেছে। লীলা চিৎ বটে কিন্তু তার মধ্যে বক্তার 'আমি' ভাব খানিকটা ঢুকে যায় এবং যে অংশে ঢোকে সে অংশটি চিৎ হতে বাদ পড়ে—তাতে পরমার্থের হানি হয়। আর শুধু নাম করলে তার সবটাই খাঁটি চিৎ। এতে আর এতটুকু জল মেশান নেই। এতে কোন আমি মিশবে না। তাই পদ পদাবলী লীলাকীর্ত্তন অপেক্ষা শুদ্ধ নামকীর্ত্তনে অনেক বেশী লাভ। এই নামকীর্ত্তনের প্রশংসা করে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥

—শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক ১

মূর্খ যেমন পণ্ডিতের সান্নিধ্য সহ্য করতে পারে না, অসাধু সাধুর, কয়লা অঙ্গারের, অন্ধকার সূর্য্যের সান্নিধ্য সহ্য করতে পারে না, তেমনি জড় 'চিৎ'-এর সান্নিধ্য সহ্য করতে পারে না—দুটি পরস্পর বিরোধী বস্তু। তাই প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের নাম অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু স্পর্শ করা যায় না। মায়ার অস্ত্র দিয়ে মায়াকে জয় করতে হবে। মায়ার চর দিয়েই মায়া জয় করতে হবে। গোবিন্দ-দাসত্ব দরখাস্ত করলে চাকরি মিলবে নিশ্চিতই কিন্তু সেখানে কেউ দরখাস্ত করে না। এতো রূপক হল। গোবিন্দদাসত্বে কি পেটে দানা পড়বে? দানা তো রূপক হলে চলবে না।

মহাজন বলেন দানা পড়বে। গোবিন্দ ভজে না খেতে পেয়ে মরে গেছে এ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। অন্য কেউ যদি না খাওয়ায় গোবিন্দ নিজে এসে খাওয়ায়। 'ভক্তের জয়' গ্রন্থে অতুল প্রভু একটি প্রসঙ্গ তুলেছেন—ভক্ত গোপকে ভগবান নিজে এসে খাইয়েছিলেন। গোপ সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল কারণ দীক্ষাবিরহিত জীবন পশুর জীবন। আঠাশ দিন গোপ গোবিন্দকে ধ্যান করেছে। ধ্যানে আত্মীয়তা বাড়ে। ধ্যানে বস্তু ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হয়। মহাজন বলেছেন—বিগ্রহ বা চিত্রপটে ধ্যান ভাল হয় তার মধ্যে আবার চিত্রপটের করুণা সবচেয়ে বেশী। আঠাশ দিন উপবাসের পর যখন ভক্ত গোপের প্রাণ যায় যায় অবস্থা তখন সে এক অপূর্ব্ব সৌগন্ধ অনুভব করল। সে সৌগন্ধ কোন ফুলে সম্ভব নয়। এ সৌগন্ধের উন্মাদনায় ভক্ত নূতন প্রাণ পেল। তারপর গোবিন্দের করস্পর্শে গোপ সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করল। এ গোবিন্দের করস্পর্শ, ভক্তবাৎসল্যের করস্পর্শ, ভক্তরক্ষার করস্পর্শ। গোপের অন্ন গোপ (কৃষ্ণ) গ্রহণ করলেন। গোপে গোপ মিশে গেল। তখন দুই গোপ বৃন্দাবনে চলে গেল।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ষড়রিপুর দাসত্ব করে করে আমাদের জীবন গেল। তাদের অসংখ্য এবং রকমারী আদেশ (আদেশও নয়—দুর্নিদেশ অর্থাৎ যা পালনের যোগ্য নয়) এতদিন আমরা পালন করেছি কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় লব্ধবিবেক হয়ে জীব যদি তার স্বরূপে ফিরে আসে তাহলেই তার নিষ্কৃতির পথ হল। জীব তো স্বরূপে ভৃত্য। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাই দাসত্ব করাই তার স্বভাব। এর সারাংশ হল, মনুষ্যদেহ লাভ করবার পর আর বিলম্ব না করে গৌর গোবিন্দ বলে যেতে হবে। ভগবান বলছেন—মনুষ্যদেহেই জীব আমাকে অন্বেষণ করে, অন্য কোন দেহে তা সম্ভব নয়। এইজন্যই মনুষ্যদেহের গুরুত্ব।

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরং।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥ —ভাঃ ১১।৭।২৩

অত্র অর্থাৎ মনুষ্যদেহে মাম্ অর্থাৎ ঈশ্বরকে (আমাকে) মৃগয়ন্তি অর্থাৎ অন্বেষণ করে। এটি শ্রীভগবানের নিজের শ্রীমুখের বাক্য। অন্য কোন দেহে এটি হয় না। অন্য দেহ বলতে ওপরে বা নীচে কোথাও—দেবদেহ বা তির্য্যক্‌দেহ কোথাও ঈশ্বরানুসন্ধান নেই। তাই মনুষ্যদেহ পাবার পর হরিভজন না করে থাকা চলবে না। যে ব্যক্তি হরিভজন করে না—তাকে শ্রীমদ্ভাগবত বিস্তর তিরস্কার করেছেন। যে কোন অপণ্ডিত লোক নয়—ঋগ্বেদকর্ত্তা শৌনক ঋষি সূতমুনিকে ষাট হাজার ঋষির সামনে নৈমিষারণ্যে বলছেন—

শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
—ভাঃ ২।৩।১৯

ঋষি শ্রোতা বলায় বুঝা যাচ্ছে প্রতিপাদ্য বস্তুর গৌরব কতখানি। ঋষি অর্থাৎ যারা আর্ষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন। ত্রিকালদর্শী হলে তবে আর্ষ প্রজ্ঞা লাভ করা যায়। ত্রিকালদর্শিত্ব সাধনগম্য। অর্থাৎ প্রতি ঋষিই সাধক। নানাস্তরের সাধক আছেন। যাঁর সাধনের সীমা জীবাত্মা পর্য্যন্ত তিনি আত্মারাম সাধক। যাঁর সাধনের সীমা পরমাত্মা পর্য্যন্ত তিনি যোগী সাধক পরমাত্মসমাধি লাভ করেছেন। আবার যিনি নিরাকার ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সাধন করে ব্রহ্মসমাধি লাভ করেছেন তিনি জ্ঞানী সাধক। আবার যিনি সাকার সবিশেষ লীলাময় শ্রীভগবান পর্য্যন্ত সাধন করেছেন—ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি ভক্ত-সাধক। সকল প্রকারের সাধকই সেখানে উপস্থিত। সূতসভায় ঋষিদের তো এই মহিমা। মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় ঋষির মহিমা আরও বেশী। সেখানে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, (যাঁরা ভগবান রামচন্দ্রের মাথায় চরণধূলি দিয়েছিলেন) অত্রি, গৌতম, অগস্ত্য, পরশুরাম, পরাশর, ব্যাস দেবর্ষি নারদ আর যত ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি দেবর্ষি, মহর্ষি, সকলে উপস্থিত আছেন। এর দ্বারা বুঝান হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত সকলের পক্ষেই শ্রোতব্য! তাঁরা সকলেই তাঁদের নিত্য কর্ম পরিত্যাগ করেই ভাগবত শুনতে বসেছেন। তাতে প্রত্যবায় হবে না। শ্রবণে

অত্যন্ত আসক্তির ফলে যদি নিত্য কর্ম লঙ্ঘনও হয় তাতে প্রত্যবায়জনিত অপরাধ হবে না। কারণ ভগবান ধর্ম পরিত্যাগ করেই ভগবদ্ভজনের উপদেশ করেছেন।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

—গীঃ ১৮।২৬

এই প্রত্যবায়ে পাছে পাপ হয় এই ভয়ে অর্জ্জুন ভীত হলে ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন—

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

—গীঃ ১৮।২৬

এ প্রত্যবায়ে পাপ হবে না—তবু যদি তোমার কোন সংশয় থাকে তাহলে আমি সে পাপ হতে তোমাকে রক্ষা করব—কাজেই তোমার শোক করার কোন কারণ নেই। ভগবান এটি নিশ্চয় করে বলেছেন।

শাস্ত্রগত বিধিনিষেধের একমাত্র লক্ষ্য হল জীবকে গোবিন্দপাদপদ্ম পাইয়ে দেওয়া। জীব যাতে গোবিন্দপাদপদ্ম পায় এইজন্যই শাস্ত্রের এত বিধি এবং নিষেধবাক্য। মানুষ যাতে তা না লঙ্ঘন করে শাস্ত্র তার প্রতি কড়া নজর রাখেন। কারণ নিত্যকর্ম লঙ্ঘন করলে পাছে সে গোবিন্দপাদপদ্ম না পায় এই ভয়। আর এমন যদি হয় গোবিন্দভজনের (শ্রবণ কীর্ত্তনাদি) আবেশে নিত্যকর্ম লঙ্ঘন হল (নিত্যকর্মকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লঙ্ঘন নয়) তাহলে শাস্ত্র দেখে এ তো বাহবা। যার জন্য এত চেষ্টা তা যদি অনায়াসে হয়ে যায় তাহলে সে লঙ্ঘনজনিত অপরাধ শাস্ত্র নেয় না—কারণ ফল সে পেয়ে গিয়েছে। শাস্ত্রের এতে আনন্দই হয়। ভাগবতের শ্রোতারা সকলে শাস্ত্রকর্ত্তা, তাঁদেরও ভাগবত শ্রোতব্য। প্রথম ভাগবত সভায় ঋষিরা নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করেই সাতদিন ভাগবত শুনেছেন। সূত যখন বক্তা—দ্বিতীয়বারের ভাগবত সভা—তখন শ্রোতারা ঋষিরা নিত্যকর্ম পরিহার করেন নি। যজ্ঞকর্ম সমাধা করে অবসরে তাঁরা হরিকথা শুনেছেন। একহাজার বছরের যজ্ঞে তাঁরা ব্রতী কিন্তু যজ্ঞ ছলমাত্র, হরিকথাশ্রবণই প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাঁরা বলেছেন—

কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ ॥

—ভাঃ ১।১।২১

শৌনক ঋষি সূতমুনি বক্তাকে নিজের উৎকণ্ঠা, পরিপ্রশ্ন দ্বারা উল্লাস দিচ্ছেন যেমন মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে দিয়েছিলেন। মন্ত্রাত্মক হরি গদাগ্রজ যার কর্ণপথে নামরূপে প্রবিষ্ট না হন সে ব্যক্তি নরপশু এবং তাকে কুকুর, বিষ্ঠাভোজী বরাহ, উট এবং গাধা স্তুতি করে। শাস্ত্র কখনও খাতির রেখে কথা বলে না। সদ্বৈদ্য যেমন বিষফোড়ায় ছুরি না বসিয়ে পারে না তেমনি হিতৈষী শ্রীমদ্ভাগবত কড়া কথা বলেন। ভগবৎসম্পর্ক ছাড়লেই মৃত্যু। প্রশ্ন হতে পারে মৃত্যু তো সকলেরই আছে তবে আবার এ কথা কেন যে ভগবৎসম্পর্ক থাকলে মৃত্যু হবে না। মৃত্যু সকলেরই আছে সত্য—কিন্তু কোথাও মৃত্যুকে মৃত্যু বলে গণ্য করা হয়, কোথাও গণ্য করা হয় না। যেমন অর্থব্যয় করলে কোথাও বলা হয় খরচ করা হল, কোথাও বলা হয় খরচ নয় এ অর্থ তুলে রাখা হল। আয়ু যদি সংসারের কাজে খরচ করা যায় তাহলে আয়ু খরচ হল আর যদি গোবিন্দের জন্য আয়ু খরচ করা হয় তাহলে সে আয়ু খরচ করা নয়, সে আয়ু তুলে রাখা হল, অনন্ত পার্ষদ গতি লাভ করবে। আমরা নরকের জন্য আয়ু দান করি। বিচার যা কিছু মানুষেরই হবে। পশু যদি হিংসা করে তাহলেও সে যমালয়ে যাবে না। কারণ তাদের পক্ষে কোন বিচার নেই। জীব যেমন মানবজন্ম পেল অমনি তার ওপর বিচারের ভার এল। যে যে পরিমাণে আয়ু গোবিন্দে দান করে সে সেই পরিমাণে সাধু। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন—এই ভজন কাজে যত আয়ু খরচ হয় সে আয়ু তত জমা থাকে। সংসারের জন্য আয়ুদানের কোন মূল্য নেই। গোবিন্দভজনে আয়ু দিতে পারছি না বলে ছটফটানি তো আসে না—কাতরতা আসা উচিত। সংসারকে ফাঁকি দিয়ে গৌরগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করতে হবে। সংসার নাম করতে সময় দেবে না। সংসার যদি জানতে পারে গোবিন্দভজনে সময় ব্যয় করছে তাহলেই বিপদ। গরু যেমন গাড়োয়ানের তাগাদা

না পেলে একটু ঘুমিয়ে নেয়, আমাদেরও তেমনি সংসারের তাগাদা না থাকলেই প্রাণ ভরে গৌরগোবিন্দ নাম করে নিতে হবে। মহাজন তাই বলেন—'শ্বাসে শ্বাসে কহ কৃষ্ণ হরি।' দেবতারাও এই মনুষ্যদেহ বাঞ্ছা করে। ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত দেহই ভারতবর্ষে মানুষ হয়ে জন্মায়। শ্রীপ্রেমানন্দদাসজী মনঃশিক্ষার পদে বলেছেন—

ওরে মন! বৃথা কেন কর্মেরে দোষাও।
মানুষ উত্তম দেহ ভারতবর্ষেতে সেহ
ইহার অধিক কি বা চাও॥

দেবতারা বিষয়ভোগে এত মত্ত যে সংযমী হয়ে ভজন করতে পারে না। পশুরাও সংযমী হতে পারে না। সংযম জিনিষটি এত সুন্দর যে অসংযমী (যে নিজে সংযত হতে পারে না) সেও সংযমী দেখতে চায়। মানুষই পারে সংযমী হতে। আর ভগবৎ ভজনের মূলে সংযম প্রয়োজন। তাই ভজনের একমাত্র অধিকারী মানুষ।

ক্ষুধায় কাতর হয়ে কুকুর যেমন গৃহ হতে গৃহান্তরে গমন করে, কোথাও একমুষ্টি অন্ন পায় আবার কোথাও আঘাত পায়। কামনা-বাসনার ক্ষুধায় তাড়িত হয়ে মানুষও তেমনি রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়ের দ্বারে দ্বারে যায় এবং কোথাও এক কণা রূপাদি খাদ্য পায় আবার কোথাও প্রহার পায়। পুত্রলাভ খাদ্য পায় আবার পুত্রবিনাশ প্রহার পায়। অর্থলাভ খাদ্য পায় আবার অর্থবিনাশ প্রহার পায়। বাসনাই ক্ষুধা। ক্ষুধায় যেমন জীব চঞ্চল হয়, বাসনাতাড়িত হলে মানুষও চঞ্চল হয়। বাসনা না থাকলে চঞ্চলতা থাকবে না—স্থির হয়ে যাবে। সব তাগাদা বন্ধ হলে যখন কৃষ্ণভজনের খাঁটি আনন্দ উপলব্ধি করা যায় তখন বুঝা যায় শ্রীগুরুদেব কি কৃপা করেছেন কোন। তাগাদায় গুরুদেবের দান বুঝা যায় না। কৃষ্ণ কর্ণপথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হলে সব তাগাদা বন্ধ হয়। প্রশ্ন হতে পারে প্রবিষ্ট তো হচ্ছেন—কৃষ্ণকথা তো শুনছি তবে তাগাদা বন্ধ হচ্ছে না কেন? আমরা পাতলা কানে শুনি তাই কাজ হয় না। গাঢ় কানে শুনতে হবে। বিষয়বার্ত্তা যেমন গাঢ় কানে

শুনি তেমনি করে গোবিন্দকথা শুনি না। বিষ্ঠাভোজী বরাহ পশুবৃত্তিতে তা মানিয়ে যায় কিন্তু মানুষ হয়ে যদি আমরা বিষ্ঠা ভোজন করি তার চেয়ে ঘৃণার বস্তু আর কি হতে পারে? গোবিন্দকে বাদ দিয়ে যা কিছু সব বিষ্ঠা। দেহকে যতই সাজান যাক আমরা মড়া সাজাই। যদি বলা যায় দেহেই তো ভগবান আছেন কিন্তু ভগবানকে সাজানোর গহনা আলাদা আর দেহকে সাজানোর গয়না আলাদা। গোবিন্দকে বাদ দিয়ে আমরা বিষয় ভোগ করি তাই বিষ্ঠাই ভোজন করি। উট যেমন রসাল আম্রমুকুল ত্যাগ করে কাঁটা চিবোয়—মুখকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে, মানুষও তেমনি পরম রসাল ভগবদ্ভজন পরিত্যাগ করে বাসনাকণ্টক আঘাতে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে। গাধা যেমন বনে একা বেশ সুখে ছিল---কিন্তু সাধ করে নগরে এসে পরের ভার কাঁধে বয়ে নিজেকে সুখী মনে করে, মানুষও তেমনি একা মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে সাধ করে স্ত্রীপুত্র গ্রহণ করে এবং সারাজীবন তাদের ভারবহন করে নিজেকে সুখী ভাবে। পশুবৃত্তিতে তাদের স্বভাবে কেউ নিন্দা করবে না কিন্তু মানুষ যদি এরূপ করে তাহলে সে পশুদের দ্বারাও নিন্দার পাত্র হয়। মানুষ মায়ার বোঝা কাঁধে করে বেড়ায় কর্মের ফেরে কাঁধে বোঝা এসে গেছে উপায় নেই—কিন্তু তাতে যেন আমরা সুখী না হই। পরের বোঝা বয়ে নিজেকে সুখী মনে হলেই গাধার বৃত্তি হল। মানুষের পক্ষে তা উচিত নয়। এই মনুষ্যদেহ ভগবদ্ভজনের জন্য।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাক্য মনুষ্যদেহে আমাকে অনুসন্ধান করে কিন্তু জীবাত্মাকে অনুসন্ধান করে না। দীপিকাদীপন বললেন—'সাক্ষাৎ মাং মৃগয়ন্তি ন তু জীবম্।' এখানে জীবাত্মার অনুসন্ধানের কথা বলা হয় নি। জ্ঞানবাদী বলেন তারা আত্মাকে অনুসন্ধান করে। এ আত্মা কোন্ আত্মা? ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্য আছে—

"আত্মা বা অরে মৈত্রেয়ি দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই আত্মা কে? কোন স্বচ্ছ পদার্থ যেমন দর্পণ বা জল ছাড়া প্রতিবিম্ব দেখা যায় না—কারও হয়ত সত্তর বছর বয়স হয়েছে

কিন্তু সে জীবনে জল বা দর্পণ দেখেনি বলে তার প্রতিবিম্বও দেখতে পায় নি। জীবও তেমনি চুরাশি লক্ষ দেহ ঘুরছে কিন্তু 'আমি' কেমন তা দেখেনি। জীবের আমি দেখবার আয়না হল দর্শনশাস্ত্র। দর্শন ছাড়া আত্মজ্ঞান হয় না। শরীরটা যাকে আমরা দেখি এবং ভ্রান্তিবশতঃ 'আমি' বলে জানি সেটা কিছু নয় কিন্তু এর মধ্যে পরমাত্মা ভগবান আছেন বলে এর দাম ; কিন্তু

পরমাত্মা ভগবান যবে হবেন অন্তর্ধান
ভস্ম কীট কৃমি অবশেষ।

মহাজন পরমাত্মার অন্তর্ধান বললেন কিন্তু জীবাত্মার অন্তর্ধান বললেন না কারণ জীবাত্মার অন্তর্ধানে কোন প্রাধান্য নেই। জীবাত্মার অন্তর্ধানে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। পরমাত্মাই প্রেরক। সর্ব্বভূতে ভগবানকে লক্ষ্য করতে হবে। দূর থেকে কুঠারকে উঠতে পড়তে দেখে যেমন তার চেতন কোন প্রেরক আছে অনুমান করা হয় কারণ অচেতন কুঠার কাজ করতে পারে না তেমনি অচেতন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিও নিজে কোন কাজ করতে পারে না। তাদের কাজ করতে দেখে চেতন পরমাত্মার অনুমান করতে হবে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রযোজ্য আর পরমাত্মা হলেন প্রযোজক। শাস্ত্র জীবাত্মাকে জ্ঞাতব্য বলেন নি।

নিজে যদি নিঃশ্রেয়স পন্থা ভাল করে জানা থাকে তাহলে অজ্ঞ লোকদের আর কর্মমার্গের উপদেশ করবে না। তারা যদি কর্মমার্গের উপদেশ চায়ও তাহলেও দেবে না। যেমন সুচিকিৎসক রোগী চাইলেও তাকে অপথ্য দেয় না। এই হল ভাগবতের অনুশাসন। নিঃশ্রেয়স বলতে আত্যন্তিক মঙ্গলকে বুঝায়। আমার গীতাবাক্যে বলা আছে—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

—গীঃ ৩।২৬

যারা কর্মসঙ্গী, অর্থাৎ কর্মমার্গ যারা আরম্ভ করেছে তাদের বুদ্ধিভেদ ঘটাবে না অর্থাৎ তারা কর্মমার্গই অবলম্বন করেছে তারই অনুষ্ঠান করুক। কারণ

তাদের নিষেধ করলে কর্ম ছেড়ে দেবে অথচ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করবার অধিকার তখনও হয় নি কাজেই মাঝ থেকে তারা কিছুই করবে না, সবই ছেড়ে দেবে—তাই তাদের কোন উপদেশ করবে না কিন্তু নিজে যদি ভক্তিমার্গকে নিশ্চিত জেনে থাক তাহলে অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্মমার্গের উপদেশ কর না। ভাগবতের বাক্য কর্মসঙ্গী হতে ভিন্ন যারা তাদের পক্ষে প্রযোজ্য। শ্রুতি দুটি জিনিষের কথা বলেছেন—প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ। প্রেয়ঃ বলতে জাগতিক যা কিছু সম্পদ ছোটখাট প্রেয়ের কথা আমরা জানি বা বুঝি। কিন্তু এর চেয়েও বড় সম্পদ্ ইন্দ্রত্ব লাভ বা ব্রহ্মার পদ লাভ—এ সবই হল জাগতিক কল্যাণ। আর এর ওপরে অদুঃখ এবং অসুখ অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখ যার কাছে সমতা লাভ করেছে—স্বরূপানন্দের উপলব্ধি যে পেয়েছে সে শ্রেয়ঃ লাভ করেছে। শ্রুতি তারই নাম দিয়েছেন শ্রেয়ঃ। এরও ওপরে হল নিঃশ্রেয়স্। অর্থাৎ মুক্তির ওপরের আনন্দ। রাধাগোবিন্দের প্রেমসেবা প্রেমভক্তি। মুক্তি যে পেয়েছে সে স্বরূপানন্দে বিভোর কিন্তু প্রেমসেবার অধিক আনন্দ সে উপলব্ধি করতে পারে না। রোগী যেমন সুস্থ ব্যক্তির আনন্দ কল্পনা করে সুখী হয়। রোগীর কাছে সুস্থতাই চরম আনন্দ কিন্তু সুস্থ ব্যক্তি জানে এ আনন্দ তো তার স্বরূপেই আছে। এ আনন্দ অধিক নয়। আনন্দ অধিক হবে যদি সে আনন্দ নিত্য নব নবায়মান হয়। নিত্য নব নব ভোগ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে সুস্থ ব্যক্তির আনন্দ। তেমনি মুক্তব্যক্তির নিত্য নব নব ভোগ্য-বস্তুর প্রাপ্তি হলে তবে আনন্দ। জাগতিক কোন সম্পদই ভগবানের কৃপাপ্রাপ্তির চিহ্ন নয়। প্রহ্লাদকে যখন দেবর্ষিপাদ নারদ বললেন—"নরসিংহ ভগবান তোমাকে বিশাল রাজ্য দান করে গেছেন, অতএব তোমার ওপরে তার অসীম কৃপা"—তখন প্রহ্লাদজী তাঁর স্বাভাবিক দৈন্য বজায় রেখে বলেছেন—'এ কথা আর যে কেউ বলুক, হে গুরো! আপনি বলবেন না। কারণ আপনি তো জানেন ভগবানের রাজ্যদান কৃপার চিহ্ন নয়। নিজ সেবাদানই কৃপার চিহ্ন। প্রভু আমায় কৃপা করেন নি রাজ্য দিয়ে আমাকে বঞ্চনাই করে গেছেন।' অর্থপ্রাপ্তি কৃপার

চিহ্ন নয়। অবশ্য এমন অনেকসময় হয় অতি প্রয়োজনে অর্থপ্রাপ্তি হল তাতে ভগবানের করুণা বলেই গ্রহণ করতে হবে। তবে করুণার জাতিভেদ আছে। এ করুণা হল জাগতিক মর্য্যাদা বাঁচানোর মত করুণা। এ করুণা কৃষ্ণপাদপদ্ম পাওয়ার মত করুণা নয়। কৃষ্ণকৃপার চিহ্ন মহাজন বলেছেন—

কৃষ্ণকৃপার হয় এক স্বাভাবিক ধর্ম।
রাজ্য ছাড়ি করায় তারে ভিক্ষুকের কর্ম॥

কৃষ্ণভক্তির মহিমা বলতে গিয়ে শ্রীশুকদেব কত গরর করে বলেছেন—রাজর্ষি ভরত যে কৃষ্ণভজনের জন্য সব ত্যাগ করেছেন এটি উচিতই হয়েছে। কারণ মধুদ্বিট্ কৃষ্ণের সেবাতে যাদের চিত্ত অনুরক্ত হয়েছে তাদের পক্ষে মুক্তিও তুচ্ছ। দর্শন যাকে প্রেয়ঃ বলেছেন তা জাগতিক কল্যাণ হতে পারে কিন্তু একে আত্যন্তিক কল্যাণ বলা যাবে না। কারণ জগতের সম্পদ্ যত বৃদ্ধি পাবে ততই আত্যন্তিক কল্যাণের পথ রুদ্ধ হবে। ভগবৎবিস্মৃতিকারক জাগতিক কল্যাণ। জোনাকির আলো যেমন অন্ধকার দূর করে পথ দেখাতে পারে না বরং পথ আরও ধাঁধিয়ে দেয়—বর্ণনার জল দিয়ে যেমন চিঁড়ে ভিজবে না—সত্যকার জল চাই—তেমনি জাগতিক কল্যাণ কল্যাণ নয়। জাগতিক কল্যাণ ত্যাজ্য বলে বুঝা যাচ্ছে কিন্তু ত্যাজ্য হচ্ছে না। ত্যাজ্য বলে বুঝলেই কাজ হবে। রোগের উপলব্ধি হলে তবে তো চিকিৎসকের কাছে যাবে। রোগের লক্ষণ হল ভগবানে অরুচি এবং মায়িক বিষয়ে রুচি। সব নেশা বজায় থাক কারণ তা ছাড়া যাবে না—কিন্তু তার মধ্যেই গৌর বলতে হবে। শাস্ত্রের অনুশাসনে বলতে হবে। ঘরের ভেতরে যেমন বাইরের মহাকাশ ও মহাবায়ুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার জন্য ঘুলঘুলি রাখা হয়, তা না হলে ঘরের বদ্ধ আকাশ ও বদ্ধ বায়ুতে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, তেমনি আমাদের হৃদয়ঘরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বদ্ধ হয়ে আছে। ঘুলঘুলির মত কর্ণপথ দিয়ে বাইরে থেকে কৃষ্ণকে হৃদয়ঘরে ঢোকাতে হবে তবে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। কৃষ্ণের নিজের কোন কাজ নেই তবু জীবের প্রতি

দয়াতে কাজ বেছে নিয়েছেন। যেখানে দেখেন কেউ তাঁর কথা শুনতে বসেছে তখনই তিনি কান দিয়ে তাঁর হৃদয়ে ঢোকেন। পরমাত্মা ভিতরে থাকলেও জীবকে উন্মুখ করতে পারেন না। বাইরে থেকে কৃষ্ণ ভেতরে ঢুকে উন্মুখ করবেন। শাস্ত্র যা প্রেয় বলেছেন জ্ঞানীর বিচারে তা মঙ্গল নয়। নিজের জিনিষ বুঝে নিলে তবে কল্যাণ। নিজের ঘরে যেমন ভাবেই থাকা যাক তাতেই সুখ কিন্তু পরের ঘরে গয়না পরে থাকাতেও সুখ নেই। জীব মায়ার ঘরে মনুষ্যদেহরূপ গয়না পরেছে কিন্তু এ গয়না কতক্ষণ থাকবে ঠিক নেই। মায়া বড় খেলা জানে। কখন খেয়ালে কাকে কি গয়না পরায় কেউ বলতে পারে না। কৃমি, কীট, ছাগল, ভেড়া যা ইচ্ছা তাই দেহ দিতে পারে। মায়া ভালবাসে না। জীবকে কেবল ঘোরায়। কোথাও স্থির হয়ে বাস করতে দেয় না। তাই জাগতিক সম্পদ কোনটিই কল্যাণ নয়। আত্মজ্ঞানই প্রকৃত কল্যাণ। মনীষী ব্যক্তি পরান্নভোজিতার মোহ রাখে না। মায়ার সম্পর্কে আত্মা সুখী হয় না। যেমন মানুষ গরুর খাদ্য বিচুলি খায় না। মায়ার জগতে চিৎ খাদ্য নেই। আত্মা চিৎ, নাম চিৎ। আত্মাকে চিৎ-খাদ্য দিতে হবে। মানুষকে যেমন মানুষের খাদ্য দিতে হয়। মায়া জানে যে তার দেওয়া খাদ্য আত্মা খাবে না অথচ খাদ্য না দিলে ত আত্মা বাঁচবে না। আর তাকে চিরতরে এই মায়ার জগতে আটকেও রাখা যাবে না। মায়ার সব খাদ্যই পাঞ্চভৌতিক, তা জীবের (চিৎ) খাদ্য নয়। মায়া তাই জীবকে আটকানোর জন্য এক কৌশল করেছে। আগে জীবের স্বরূপ ভুলিয়ে দিল, অস্মৃতি ঘটাল। এখন তাকে যা দেওয়া যাবে সে তাই খাবে। জীবের স্বরূপ ভোলাল অর্থাৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলে গেল। পাঞ্চভৌতিক খাদ্য আত্মা খায় না। আত্মা উপবাসী থাকে। কিন্তু অস্মৃতির ফলে আত্মা নিজেকে উপবাসী বলে বুঝে না। গৃহাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন গৃহকেই 'আমি' বলে মনে করে। ক্ষুধা পেলে ঘরে চুণকাম করে তৃপ্তি পায়—আমরা দেহাবিষ্ট জীবও দেহকেই ঘর বলে মনে করি। তাই দেহকে সাজিয়ে, দেহকে অন্নজল খাদ্য দিয়ে 'আমার' ক্ষুধার নিবৃত্তি

করি। দেহকে খাদ্য দিয়ে আত্মা তৃপ্ত হল বলে মনে ভাবছে এটি ভ্রান্তি। দেহকে খাওয়ালে সাজালে আমার পেটে কিছু পড়ল না—এ হল প্রেয়ঃ-প্রাপ্তি—এ ভুল ভাঙলে তবে শ্রেয়োলাভ। আবার শ্রেয়ের ওপরে হল নিঃশ্রেয়স্। এই হল সর্ব্বোত্তম শ্রেয়ঃ। মনুষ্যদেহেই সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু মনুষ্যদেহ পাবার আগে পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু বা অসাক্ষাতে। জীবাত্মা অন্বেষ্টব্য নয়। কৃষ্ণপাদপদ্মই অন্বেষ্টব্য। জীবাত্মা অন্বেষক। মনুষ্যদেহ এই অন্বেষণের উপায় বা সাধন। যেমন বলা হয় আলো নিয়ে আমার সঙ্গে আয়—এখানে মনুষ্যদেহ হল আলো।

ভগবানকে অনুসন্ধান করানই সৃষ্টির তাৎপর্য্য। বিমুখ জীবকে উন্মুখ করানই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীব সুন্দর বস্তু ভোগ করতে চায়—চিরসুন্দর ভোগ করতে চায় কিন্তু জগতের কোন বস্তু চিরসুন্দর নয়। রূপাদিপঞ্চক যত ভোগ করা যায় ততই ভোগের বাসনা বাড়ে। প্রাকৃত পদ্ম মলিন হয়ে যায়। কিন্তু এমন পদ্ম কি নেই যা কোনদিন মলিন হবে না—আছে। কৃষ্ণচরণপদ্ম হৃদয়-সরোবরে উদয় করাতে পারলে সে পদ্ম কখনও মলিন হবে না। এ মাধুর্য্য নিত্য নব নবায়মান। জীবের প্রার্থনা রূপাদি ভোগ এবং সে ভোগ যেন চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু এ জগতে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও নিত্যরূপাদি পাওয়া যাবে না। জীব অমলিন রূপাদি চায় কিন্তু মলিন জগতে খুঁজছে। মহৎকৃপা হলে একক্ষণে নিত্যরূপাদির জ্ঞান হয়। তখন অনিত্যে সুখ ত্যাগ করে। গৌরগোবিন্দপাদপদ্মই একমাত্র অমলিন নিত্যমাধুর্য্যমণ্ডিত বস্তু। প্রতি দেহেই রূপাদিভোগের নেশা আছে। যত দেহের উন্নতি ততই নেশা বাড়ছে। এই যে ভোগের নেশার বৃদ্ধি এইটিই ঈশ্বরানুসন্ধানের দিক্। প্রকৃতির রূপাদিতে জীবের ক্ষুধা মিটবে না। ভগবান প্রকৃতির খাদ্য দিয়েছেন কিন্তু জীবের মধ্যে অতৃপ্ত ক্ষুধা দিয়েছেন। তাই জীব যতই ভোগ করুক তৃপ্ত আর কিছুতে হচ্ছে না। ভগবান জীবকে ভোগের এই অতৃপ্তি দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন যে একদিন এই নেশার মাত্রাবৃদ্ধিতে

আমাকে নিশ্চয়ই পাবে। জগতের রূপাদি অতিক্রম করে ইন্দ্রপদ ব্রাহ্মপদ কোন রূপাদিভোগেই জীবের ক্ষুধা মিটবে না। মাছকে বঁড়শী বিদ্ধ করে সে ব্যক্তি যেমন নিশ্চিন্ত থাকে—এ মাছ আমার হাতে আসবেই তেমনি ভগবান অতৃপ্তির বঁড়শীতে জীবকে গেঁথে নিশ্চিন্ত আছেন—একে নিজের কাছে একদিন না একদিন টেনে নেবেনই। মানুষদেহেই সাক্ষাৎ-ভাবে ভগবৎ অনুসন্ধান হয়, অন্য পশুপক্ষী দেহে তার আরম্ভ হয় অসাক্ষাৎভাবে।

জীব মিথ্যাবস্তুকে সত্য মনে করে তার পেছনে চুরাশি লক্ষ জন্ম ধরে ছুটছে। এর আর বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। মায়া জীবের এই ভ্রান্তি দেখে মনে মনে হাসে আর ভাবে—বেশ খেলা খেলেছি। এই ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলে মিথ্যাকে মিথ্যা বলে বোধ হবে বহু জন্ম ছুটবার পর। ভগবান বললেন—

> বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
> বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ —গীঃ ৭।১৯

বাক্পতি ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে স্তুতিপ্রসঙ্গে বলেছেন—

> অজ্ঞানসজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
> অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী॥
> —ভাঃ ১০।১৪।২৬

জীবের ভববন্ধ অর্থাৎ বন্ধন (মায়াকৃত) এবং তার থেকে মুক্তি এই দুইটিই বস্তুত নেই। অজ্ঞান থেকে এ দুটি সংজ্ঞার জন্ম। বস্ত্রকে ভূত প্রেত যা কিছুই বলা যাক্ না কেন সবই যেমন মিথ্যা, বস্ত্র বললে সত্য বলা হল। তেমনি জীবের বন্ধন বা মুক্তি যাই বলা যাক্ দুইই মিথ্যা। জ্ঞান হতে উৎপন্ন এ দুটি সংজ্ঞা নয়। তাই ব্রহ্মা বললেন—'অজ্ঞান-সজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ।' যে বস্তু যা তাকে তাই বলে জানার নাম জ্ঞান আর তাকে অন্যপ্রকার জানার নাম অজ্ঞান। অজ্ঞানকে জ্ঞান নয় বলা যাবে না। অজ্ঞান মানে জ্ঞানবিরোধী। জীবের বন্ধন বলে কিছু নেই। কাজেই মুক্তি বলেও কিছু নেই। যার বন্ধন আছে তারই মুক্তির

প্রশ্ন আসে। যেমন কারও যদি দন্তশূল থাকে তা সেরে যেতে পারে কিন্তু কারও যদি দন্তশূলই না থাকে তাহলে তার সারবারও কোন প্রশ্ন আসে না। ঘরের গরুকে অনেকসময় খুঁটিতে না বেঁধে খুঁটির কাছে রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু বাঁধা থেকে সে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে নিজেকে মুক্ত বলে ভাবতেই পারে না। নড়ে চড়েও দেখে না যে সে বদ্ধ নয়। নড়ে দেখলেই বুঝতে পারে যে সে বদ্ধ নয়। জীবও তেমনি নিজেকে বদ্ধ বলে মনে করে কিন্তু গুরু গৌর বলে একবার চেয়ে দেখে না যে সে বাঁধা নয়। সূর্য্যের কাছে যারা থাকে তাদের যেমন দিনরাত্রির কোন বিভাগ নেই—কিন্তু সূর্য্য থেকে যারা দূরে থাকে তাদেরই দিন-রাত্রির বিভাগ। তেমনি ব্রহ্মা বালগোপালকে বলছেন—তোমার পাদপদ্মরূপ সূর্য্য নিকটে যারা থাকে তাদের বন্ধন বা মোক্ষ বলে কিছু নেই কিন্তু যারা তোমার পাদপদ্ম থেকে দূরে থাকে তাদেরই বন্ধন বা মোক্ষ।

আমাদের স্বরূপানুভূতি নেই। স্বরূপের আনন্দ আমরা বুঝি না। তবে দেখা যায় দেহ সুস্থ থাকলে আমরা আনন্দ বোধ করি—যদিও এটি স্বরূপের আনন্দ নয়। সূর্য্য যেমন নিজ তেজস্বিতায় অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখে, কাছে আসতে দেয় না, কৃষ্ণও তেমনি তাঁর নিজের প্রভাবে মায়া-অন্ধকারকে কাছে আসতে দেন না। জীব অন্ধকারে ক্লিষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করে এমন কি কোন আলো নেই যা এই অন্ধকারে পথ দেখাতে পারে। মহাজন তখন উপদেশ করেন—ঐ দেখ আলো—এই প্রকাশের পথে হাঁট—হাঁটতে হাঁটতে যদি আলোর কাছে কখনও পৌঁছুতে পার তাহলে আর কখনও অন্ধকার পীড়া দেবে না। অন্ধকারেই সাপ, বিছা, ভূত, প্রেত, পিশাচের ভয়—অন্ধকারে নানা উৎপাত। মায়ার অন্ধকারে তেমনি কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতির উৎপাত। কামাদির যাতনা নিরন্তর দংশন করে। জীব এইভাবে যাতনাগ্রস্ত হয়ে সেইরকম ভাল লোক পেলে জিজ্ঞাসা করে আমার এ যাতনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি? কিন্তু আমরা এতই বিকারগ্রস্ত রোগী যে কামাদির যন্ত্রণা সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই নেই। কামাদির দংশন যন্ত্রণা বলে মনে হয় না।

আলোকেই শত্রু বলে মনে হয়। মায়ার অন্ধকারে ক্লেশ মনে হলে 'হা গোবিন্দ রক্ষা কর' বলে চিৎকার করতাম। ডাকাত পড়লে, ঘরে আগুন লাগলে যেমন আমরা চিৎকার করি। মহাজন বলেন—'গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট।' কারণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বলেছেন—

শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পলাবে সব
সিংহ রবে যেন করিগণ

জীবের প্রথম ডাকই ভগবানের কানে পৌঁছুয় কিন্তু তিনি আর্ত্তির জন্য অপেক্ষা করেন। ভগবান প্রথম কান্নাই শোনেন কিন্তু কান্না ঘন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। শিশুর প্রথম কান্নাই যেমন মায়ের কানে পৌছুয় কিন্তু তাতে মা আসে না বা শিশুকে নেয় না। কারও পদধ্বনিতে ঘুম ভেঙেছে। মা যখন বুঝতে পারে আর ঘুমুবে না—শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধ্বনিতে ঘুম ভাঙলে আর ঘুমুবে না। শিশু চুষিকাঠি, ঝুমঝুমি ফেলে দেয়—মা পরীক্ষা করে দেখেন ফেলে দিয়েছে না পড়ে গিয়েছে। শিশুর তো চুষিকাঠিতে পেট ভরে না কারণ তাতে তো কোন রস নেই। নিজের মুখের লালাই নিজে গ্রহণ করে ভোগ করে। সাধকও তেমনি অনিমাদি সিদ্ধির চুষিকাঠিতে ভুলবে না। মা যখন বুঝতে পারে শিশু তাকেই চায়, আর কিছুতে সে সন্তুষ্ট নয় তখন শিশুকে কোলে না নিয়ে মা পারে না। ভগবানও তেমনি দেখেন সাধকের আর্ত্তি যখন চরমে ওঠে---সাধক যখন শুধু তাঁকেই চায় আর কিছুতে সে সন্তুষ্ট নয় তখন ভগবান সাধককে দর্শন দেন। জগতে দেহের, মনের, ইন্দ্রিয়ের, আত্মীয়জনের যত রকমের মায়ার যন্ত্রণা লাঞ্ছনা আছে সব কমে যাবে যদি মায়াধীশের শরণাগতি নেওয়া যায়। এ জগতেও দেখা যায় কেউ হয়ত শত্রুতা করছে কিন্তু তার শত্রুর যদি শরণাগতি নেওয়া যায় তাহলে এর শত্রুতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মায়ার শত্রু মায়াধীশ তাই মায়াধীশের শরণাগতিতে মায়ার হাত হতে রেহাই পাওয়া যায়। সাধু, শাস্ত্র, গুরুবৈষ্ণবের আশ্রয়ে গেলে মায়ার উপদ্রব কমবে। ভগবানও সেই উপায়ই বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। —গীঃ ৭।১৪

এই আশ্রয়গ্রহণটি কিন্তু নিখুঁতভাবে হওয়া চাই। তাহলে দেখা গেল জীবের প্রকৃতপক্ষে বন্ধন বা মোক্ষ নেই। শ্রুতি বলেছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাৎপরে॥

যাত্রা করবার সময় দর্শক ভোলাবার জন্য কত পোষাক পরিচ্ছদ বেশ-ভূষ রং কালি উপাধি হিসাবে গ্রহণ করা হয় কিন্তু যখন লোক ভোলানোর কাজ শেষ হয়ে যায় তখন সব উপাধি খুলে সে নিরুপাধি হয়ে আর পাঁচজনের মতা সমতা লাভ করে। জীবও তেমনি জগতের রঙ্গমঞ্চে মায়ার খেলা খেলতে ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিতের কত উপাধিই গ্রহণ করে কিন্তু যখন সে খেলা শেষ হওয়ার পর সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কৃপায় সাধন ক্লেশ স্বীকার করে গোবিন্দদর্শন লাভ করে তখন তার সব উপাধি খুলে যায়। তখন গোবিন্দের-সম চিৎ বিগ্রহ লাভ করে। গোবিন্দ সঙ্গে এক হয়ে যায় না। গোবিন্দ সম চিৎ বিগ্রহ লাভ করে। বলা আছে—'কৃষ্ণের যতেক গুণ ভকতে সঞ্চারে।'

ভগবান যদিও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নন তবু জীব অনুমান করে তাঁকে অনুসন্ধান করে। যেমন ঘরে কেউ আছে অনুমান করলে 'কে ঘরে আছ' বলা যায় তেমনি হৃদয় ঘবে আমাদের গোবিন্দ আছেন অনুমান করলে তবে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেছেন অচেতন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ক্রিয়া দেখে চেতন স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের অনুমান করা হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এখানে যোগ বলতে ভক্তি-যোগ বলেছেন। ভগবান কৃষ্ণ বলছেন—'অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা'—তাহলে কৃষ্ণকে নন্দনন্দনকে অনুসন্ধান করে এইটিই বুঝাচ্ছে। তাঁকে সাংখ্য যোগ বা অন্য কোন উপায়ে অনুসন্ধান করা যায় না, ভক্তিযোগেই একমাত্র তাঁকে অনুসন্ধান করা যায়। স্বামিপাদ যে দার্শনিকতার কথা বললেন তা তো থাকবেই কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদ এখানে কৃষ্ণমর্য্যাদার বিশেষ লক্ষ্য দিয়ে ভক্তিযোগ এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি হেতুর কথা বললেন। এটি

কৃষ্ণ অন্বেষণের বিশেষ লক্ষ্য।

জীবের অতৃপ্তিই ভগবদন্বেষণ করায়। সন্তান রোগের যন্ত্রণায় মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে থাকলে মা যেমন নানা সুস্বাদু পথ্য সাজিয়ে শিয়রে বসে প্রতীক্ষা করেন—পুত্র কখন মূৰ্চ্ছাভঙ্গের পর চোখ মেলে খেতে চাইবে। খেতে চাইলে সানন্দে পথ্য দান করে মা কত তৃপ্তি পান—শ্রুতিমাতাও তেমনি জীব সন্তানের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কখন জাগতিক সুখে অতৃপ্তি পেয়ে জীব সন্তান কাতরে বলবে, 'মা, এর চেয়ে সুখের বস্তু, আনন্দের বস্তু আর নেই?' মা সানন্দে তখন বলবেন—'আছে আছে'—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' 'রসো বৈ সঃ'—তিনিই রসবস্তু, তাঁকে শ্রুতিমাতা দেখিয়ে দেবেন। তখন জীব 'বাসুদেব সৰ্ব্বমিতি' এই জ্ঞান লাভ করে সব ছেড়ে গোবিন্দ ভজবে। ভগবান নিজেই বলেছেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

—গীতা ২।৪৬

ছোট ছোট জলাশয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বৃহৎ জলাশয়ে একসঙ্গে সব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যত আনন্দ জগতে আছে ব্রহ্মজ্ঞানে সব আনন্দ পাওয়া যাবে। এইভাবে গীতায় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে। ভক্তিদর্শন বলেন—এই ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ যা, কৃষ্ণানন্দের কাছে তা কিছুই নয়। মহাজন বলেছেন—

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু রে।
কোটি ব্রহ্মানন্দ তার আগে নহে এক বিন্দু রে॥

এই কৃষ্ণদাস অভিমান আমরা বলি এবং শুনি কিন্তু ভেতরে ঢোকে না। ভেতরে ঢুকলে কি আর আমি মাতা, পিতা, ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত এ অভিমান থাকত? এ সবই হল খাতোদক আর কৃষ্ণকথা হল অমৃতসাগর। কৃষ্ণকথাসাগরে শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা বিহার করবে। এ আনন্দের পরিমাণ অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা করা বা বুঝান যায় না, তবে ব্যতিরেকমুখে দৃষ্টান্ত দেখান যায়—চতুর্ব্বর্গকে তারা তুচ্ছ করে—তৃণজ্ঞান করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কৃষ্ণ ভজবে কে ? বিশ্বাস যার হয়েছে সেই ভজবে। বিশ্বাস হয় নি বলেই কাজ হল না। জীবমাত্রই আনন্দপিপাসু। চৌদ্দভুবনে যত আনন্দ ব্রহ্মার সব আনন্দ আছে। এই ব্রহ্মার আনন্দের দশগুণ পৃথিবী আবরণে, তার দশগুণ জলাবরণে, তার দশগুণ তেজ আবরণে, তার দশগুণ বায়ু আবরণে, তার দশগুণ আকাশ আবরণে, তার দশগুণ অংহকারতত্ত্ব আবরণে, তার দশগুণ মহত্তত্ত্ব আবরণে, তার দশগুণ প্রকৃতি আবরণে। এইখানেই ব্রহ্মাণ্ড শেষ। এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এত বেশী যে এই প্রকৃতির শ্যামলিমচ্ছটা দেখে গোপকুমারও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গোবিন্দপাদপদ্মমাধুর্য্যের সঙ্গে যেন সাম্য আছে বলে মনে হয়। গোবিন্দ সাম্য না থাকলে মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। কারণ গোবিন্দের অংশ জীব—তাই গোবিন্দের নকলও জীবকে ভুলাতে পারে। গোপকুমারের ভজনবল আছে তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রকৃতির ধামকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে যেতে পেরেছিলেন। গুরুকৃপার মহিমা কতখানি এইখানে বুঝা যাবে। এ জগতে বুঝা যাবে না। গোপকুমার গুরুকৃপার বলে বলীয়ান হয়ে মুক্তিধামে গিয়ে মুক্তিকেও তুচ্ছ বোধ করে ফিরে এসেছেন—তাতে লীন হন নি।

এখানে এই ভূলোকে বসে গোলোকের অধীশ্বরের পাদপদ্ম পেতে হবে। বড় দুষ্কর কাজ। এখানে বসে গোলোকের দূরত্ব বুঝা যায় না, আমাদের নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নেই। শ্বাসে শ্বাসে গৌরগোবিন্দ বলতে হবে। গৌরগোবিন্দ পাদপদ্ম পাওয়া অসম্ভব নয়। তা যদি হত শাস্ত্র তাহলে পাওয়া যাবে বলতেন না। কারণ শাস্ত্র তো অসম্ভব কিছু বলেন না। বন্ধ্যাপুত্রকে ডেকে আন—আকাশকুসুমের মালা গাঁথ—এ তো বলে না। যে উপায়ে এই গৌরগোবিন্দপাদপদ্ম পাওয়া যাবে তার নাম হেতু। উপায় ধরলে উপেয় আপনি আসবে। ব্যাধ পাখী ধরতে পাখী খুঁজতে যায় না। জাল পেতে চালের খুদ ছড়িয়ে বসে থাকে। পাখী আপনি আসে। তেমনি ভক্তির জাল পেতে শ্রবণ কীর্ত্তন চালের খুদ চার ছড়িয়ে বসে থাকলে গোবিন্দ পাখী আপনিই আসবে। তাঁকে খুঁজতে

যেতে হবে না। উপায় গ্রহণ করলে উপেয় আপনিই ধরা দেবে।

শ্রীভগবান এই বাক্য বলবার পর নিজে এর বিস্তার না করে একটি প্রাচীন উদাহরণ যদুমহারাজের সঙ্গে অবধূতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন। অনুমানে ঈশ্বর জানায় তৃপ্তি হয় না। তাতে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা থেকে যায়। অসম্ভাবনা হল জীবের অর্থাৎ মানুষের স্বতঃই মনে হবে প্রাকৃত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দিয়ে অপ্রাকৃত ভগবানকে কেমন করে গ্রহণ করা যাবে? ভগবান যেমন অপ্রাকৃত তেমনি তাঁর নাম রূপ গুণ লীলা সবই অপ্রাকৃত। তাই আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দিয়ে কোনটিরই গ্রহণ সম্ভব নয়। নববিধা ভক্তির দ্বারা উপাসনার কথা বলা হয়েছে। মায়ার দেওয়া মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়। মায়ার সৈন্য দিয়ে মায়া জয় করতে হবে। তাই কাজ বড় কঠিন। মায়ার ইন্দ্রিয় মায়ার ধ্বংস ঘটাতে চায় না। তাই আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দিয়ে অপ্রাকৃত গ্রহণ অসম্ভব বলে মনে হয়। তাই সাধন রাজ্য এত কঠিন। মন থেকে আমাকে আলাদা করতে পারি না। মনকে এত মমতা করেছি যে মন থেকে আলাদা করে নিজেকে ভাবতে পারি না। মায়িক বৃত্তিই মনের স্বাভাবিক। কিন্তু এই এই মায়িক বৃত্তি ত্যাগ করিয়ে মনকে গৌরগোবিন্দ সংকল্প বিকল্প করাতে হবে। রাগ অর্থাৎ আসক্তি যোগ্যতম ব্যক্তি। সে আমাদের মানুষ করে দিতে পারে। কিন্তু তাকে আমরা যোগ্য কাজে গৌরগোবিন্দপাদপদ্মে না লাগিয়ে হীন কাজে নশ্বর বিষয়ভোগে লাগিয়েছি। এই বিষয়ভোগের ফল নরক। আসক্তি নামে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়েছে তাই আক্ষেপ করে মানুষের জ্ঞান, ধৈর্য্য, বিবেক প্রভৃতি রত্ন চুরি করছে। বিষয়াসক্তির ফলে দেখা যায় সত্য সত্যই বিবেক ধৈর্য্য লোপ পায়। বিষয়াসক্তির ফলে বিবেকের অঙ্গে কশাঘাত পড়ে। কিন্তু তার দিকে আমরা দৃষ্টি দিই না। আনন্দের জায়গায়, সাধুগুরুবৈষ্ণবের চরণে, ভগবদ্ধাম যেখানে গেলে মুক্তি সেইখানেই যেতে মানা মমতার বন্ধনে। কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করলে আসক্তি ভাল জায়গা পেয়ে যায়। তাতে তার গৌরব হয়—তখন বিবেক ধৈর্য্য, সংযম এসব তো ফিরিয়ে দেয়ই আবার অন্য রত্নও এনে দেয়। কৃষ্ণ

তো পাকা চোর, তার ঘর থেকে প্রেমরত্ন এনে মানুষকে দেয়। কৃষ্ণ এমন চোর যে তাকে নিমন্ত্রণ করে চুরি করাতে ইচ্ছা করে।

আমাদের মায়িক বস্তুতেও কৃপার পরশ আছে। পশুর ইন্দ্রিয় নিতান্তই মায়িক। এখানে কোন অপ্রাকৃত পরশ নেই। কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়ে ভগবানের কৃপার পরশ আছে। তাই মানুষের ইন্দ্রিয় দিয়েই ভগবানকে অন্বেষণ করা যায়। তাই ভগবান বললেন—মনুষ্য জন্মেই আমাকে খোঁজে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ উদ্ধবজীর কাছে উদাহরণ দেখাচ্ছেন—যদু মহারাজের সঙ্গে অবধূত সংবাদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যদুমহারাজের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। যদিও তাঁর চন্দ্রবংশে জন্ম, কিন্তু চন্দ্রবংশ উল্লেখ না করে যদুবংশে জন্ম এইটিই উল্লেখ করা হয়। এমনকি যদুমহারাজের বৈশিষ্ট্য প্রচারের জন্য যদু নাম নিজের গায়ে লিখে রেখেছেন 'যাদব'—এতে যদুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। মহাভারতে যদুমহারাজের মাতা দেবযানী ও পিতা যযাতির উপাখ্যান বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে তা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে—এইটিই ভাগবতের বৈশিষ্ট্য। এতে তত্ত্ব অংশ প্রধান, উপাখ্যান অংশ কম। ভাগবতের প্রশংসার সূত্র ধরে মুখর হয়ে সূত মুনি শ্রীদ্বাদশে বলেছেন—

কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্ত্তিঃ পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ॥

—ভাঃ ১২।১২।৬৫

শ্রীমদ্ভাগবতে যা বলা হয়েছে তার প্রায় সবই বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বলা আছে তবু শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য সেই হরি যিনি কলিযুগের সকল প্রকার মালিন্য অপহরণ করেন তিনি এখানে প্রতি শ্লোকে পুনঃ পুনঃ গীত হয়েছেন। প্রথমে হরি বলা হল, পরে সেই হরিকে কাপড় গয়না পরিয়ে ভগবান অশেষমূর্ত্তি বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'ভগ' অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত ভগবান নবনীরদকান্তি যাতে চোখের জ্বালা উঠবে না কোনোদিন। 'ভগ' সমগ্র অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান,

বৈরাগ্য—সমগ্র বলতে যার সমান বা যার চেয়ে অধিক নেই। শ্রীমদ্ভাগবত এই গুণের কথাই বলেছেন। তিনি স্বয়ং ভগবান। ঐশ্বর্য্য বলতে বস্তুকে অধীন করে রাখার ক্ষমতাকে বুঝায়। বীর্য্য বলতে অচিন্ত্যশক্তি—এর দিগ্‌দর্শন করা যায় মণিমন্ত্রমহৌষধিবৎ। মণি, মন্ত্র ও মহৌষধির শক্তি বুদ্ধির অগোচর, এটি বিচারে পাওয়া যায় না। তাই অচিন্ত্য বলা হয়েছে। অসম্ভব শোভন কাজের নাম যশ। শোভন মানে অপরের সুখোৎপাদক। জনসুখকর হলে তবেই তাকে গুণ বলা যায়। সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ যদি অপরের সুখোৎপাদন করে তাহলে তাকে যশ বলে। রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির মহারাজ দান করে মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করেছিলেন—একটা দানের মত দান করা হয়েছে। গোবিন্দ পাশে বসে আছেন। তাঁর তো স্বভাব খারাপ। গর্ব্বের একটু উষ্ণতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। যুধিষ্ঠির মহারাজের মনে গর্ব্বের তাপ কৃষ্ণশরীরে জ্বালার সৃষ্টি করল। অহঙ্কারের রেশ যার হৃদয়ে ওঠে তার পাশে গোবিন্দ বসেন না। ভগবানের সঙ্গে যার সম্বন্ধ আছে বা যার সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ আছে তার গর্ব্বের রেশ ভগবান সহ্য করতে পারেন না। অন্যের সম্বন্ধে কিন্তু কোন কথা নেই। যে গর্ব্ব করে করুক তার সম্বন্ধে ভগবান খোঁজ করেন না। ভগবান দেখলেন যুধিষ্ঠির মহারাজের এ গর্ব্বের রোগ সারাতে হবে। তখনই একটি নেউল পাঠালেন। তার দেহের অর্দ্ধেক ভাগ সোনার। নেউল তার আত্মকাহিনী বলে বুঝিয়ে দিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দান অপেক্ষা ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রাণস্বরূপ ছাতুর দলা ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে দান অনেক বড়। সামর্থ্যের অতিরিক্ত এবং তা যদি জনসুখকর হয় তবে সে কাজের যশ হবে। ভগবান সর্ব্বসামর্থ্যবান হলেও কিছু অসামর্থ্য তাঁর আছে। তিনি সর্ব্বব্যাপক, তাঁকে বাঁধা যায় না, তাহলে তাঁর সামর্থ্য হল তিনি বন্ধনে পড়েন না। কিন্তু মা তাকে বাঁধছেন। ক্ষুধা না পাওয়াই তাঁর সামর্থ্য। কিন্তু ক্ষুধায় কাতর হচ্ছেন ভগবান—এইটিই তাঁর সামর্থ্যাতিরিক্ত কাজ—অথচ এ লীলা আস্বাদনে শ্রবণে পঠনে জীবের মায়ামুক্তি। অতএব জনসুখকর শোভন কাজ—

তাই এ থেকে যশ হবে। লীলাই যশ। শ্রীশুকদেব বলেছেন ভগবান সর্ব্বসামর্থ্যবান বলা হলেও তিনি সব পারেন না এইটিই সত্য কথা। ব্রহ্মার গোবৎসহরণলীলায় এটি দেখা গেছে। সত্যকার বালক বাছুর যোগমায়া লীলাশক্তি আবৃত করে রেখে একদল নকল (কল্পিত) বালক বাছুর রেখেছেন। ব্রহ্মা তাই হরণ করেছেন। কৃষ্ণ তাঁর সর্ব্বজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছেন যে ব্রহ্মা নকল বালক বাছুর হরণ করেছেন কিন্তু যোগমায়া যে আসল বালক বাছুর গ্রহণ করেছেন এটি আর বুঝতে পারেন নি। যোগমায়া লীলাশক্তি ভগবানকে সেটি বুঝতে দেন নি। বুঝতে দিলে লীলা হয় না। লীলায় জন্য কৃষ্ণসুখের জন্য যোগমায়া নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে পারেন এ ক্ষমতা, এ স্বাধীনতা তাঁকে দেওয়া আছে। লীলাশক্তি যোগমায়ার কাছে ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতাও অচল। লীলাশক্তির স্বাতন্ত্র্যটি ভগবানেরই দান। কিন্তু শক্তিদানের পর আর তাকে গ্রহণ করা চলে না যেমন কন্যাদানের পর তার ওপরে পিতার আর জোর চলে না। তখন কৃষ্ণ মজা করবার জন্য বালক বাছুর, শিঙ্গা, বেত্র, বেণু, বসন, ভূষণ, স্বভাব, বয়স, রূপ সব নিজে হয়ে ফেরৎ গোষ্ঠ করলেন। হঠাৎ ব্রহ্মাকে বুঝতে দেওয়া হবে না। তাকে মজিয়ে মজিয়ে বুঝাতে হবে। কৃষ্ণ নিজেকে উভয়ায়িত করলেন। অর্থাৎ এক অংশে নিজে রইলেন আর এক অংশে বালক বাছুর প্রভৃতি হলেন। এর মধ্যে একটি বালক বা একটি বাছুর নন, অসংখ্য বালক বাছুর। শ্রীশুকদেব বললেন—

যাবদ্বৎসপবাসকাল্পকবপুর্যাবৎকরাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরম্ ॥
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং।
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ ॥

—ভাঃ ১০।১৩।১৯

এখানে বিহারাদি পদে আদি পদের দ্বারা (টীকায় বলা আছে) পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতি বুঝাচ্ছে। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন—ভগবান তো বালক বাছুর সঙ্গে রোজই ফেরৎ গোষ্ঠ করেন। কিন্তু

আজকের ফেরৎ গোষ্ঠের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে মহারাজ। আজ আর বালক বাছুর কেউ বালক বাছুর নয় সব মাধব নিজে। সব সমাধান তিনি নিজে করেছেন। কিন্তু একটা সমাধান করতে পারেন নি। সেটি তাঁর সর্ব্বজ্ঞতায় কুলায় নি। ব্রজগোপীগণ এবং গাভীগণ সকলে নিজ নিজ বালক বাছুর অপেক্ষা যশোদা-দুলাল কৃষ্ণে অধিক স্নেহপরায়ণ। প্রেম বেশী করে। যেন বেশী করে নয়—সত্য সত্যই বেশী প্রেম করে। আজ কৃষ্ণ নিজে তাদের বালক বাছুর হয়ে এসেছেন। মায়েরা এবং গাভীরা নিজ নিজ সন্তানে পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক স্নেহ করেছেন এটি আর শ্রীগোবিন্দ আটকাতে পারছেন না। কেন পারছেন না? কৃষ্ণ সব জায়গায় পারেন—কিন্তু তিনি প্রেমের অধীন। সেখানে তিনি প্রেমের স্রোতে ভেসে যান। প্রেমকে নিজের অধীন করতে পারেন না। প্রেমের ওপরে তাঁর কোন হাত নেই। তাহলে দেখা গেল এটি সামর্থ্যাতিরিক্ত অথচ জনসুখকর কাজ। তাই এর নাম যশ। লীলাই যশ। 'শ্রী' শব্দের অর্থ সম্পদ এবং শোভা। বৈরাগ্য হল ভোগে নিঃস্পৃহতা। সেই হরি যিনি অশেষমূর্ত্তি ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যশালী তিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ গীত হয়েছেন। এইটিই ভাগবতশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এই হরি কলা বা অংশ অর্থাৎ শেষমূর্ত্তি নয়, ইনি অশেষমূর্ত্তি অর্থাৎ সর্ব্বাংশমাদায় অবতীর্ণত্বাৎ তিনি সম্পূর্ণ। কৃষ্ণ নিজে যাদব নাম ধারণ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবযানী উপাখ্যান সংক্ষেপে বলা হয়েছে। মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু বাল্যকাল হতে কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি পিতার জরা নিজে নিয়ে নিজের যৌবন পিতাকে দান করতে স্বীকৃত হননি। তার হেতু—(১) আমার যৌবন দান করার ফলে এবং পিতার বার্দ্ধক্য নেওয়ার ফলে আমার কৃষ্ণভজন হবে না। (২) আমার যৌবন নিয়ে পিতাও কৃষ্ণভজন করবেন না বিষয়ভোগই করবেন। (৩) পিতার বাক্য লঙ্ঘনে অপরাধও হবে না কারণ পরমপিতা শ্রীভগবানের আদেশ আছে—"সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। (৪) পিতাকে যৌবন দান করলে তাঁর বিষয়ভোগের মধ্যে আমার মা একটি বিষয়। কাজেই পক্ষান্তরে

আমারই মাতৃসম্ভোগ হয়ে যাবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যুক্তিসঙ্গত কারণে যদুমহারাজ পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করেছিলেন তাই তাঁর এত প্রশংসা। তিনি হরিভজনের জন্যই তাঁর যৌবনরক্ষা করেছিলেন। তাই যদু অমিত-তেজা। সেই যদুমহারাজের সঙ্গে অবধূতের সংবাদ (কথোপকথন) কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন।

উদ্ধবের যে ভাবনা—প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবদুপাসনা অসম্ভব এই অসম্ভাবনা বা অতৎ বস্তুকে তৎ মনে করা এই বিপরীতভাবনা থাকলেও যে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানেব উপাসনা সম্ভব এই কথা বলবার জন্যই ভগবান বললেন—

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরং।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥ —ভাঃ ১১।৭।২৩

ঘট যেমন শুধু মাটিতে হয় না তার পেছনে চেতন কুম্ভকার থাকতেই হবে তেমনি জীবের ইন্দ্রিয়ের পেছনে একজন চেতন কর্ত্তা আছে। অন্য প্রাণীর ইন্দ্রিয় শুধুই মায়া দিয়ে তৈরী কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয় মায়া-জাত হলেও তাতে বিশেষ আছে সেটি হল প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা অন্য কোন প্রাণীতে নেই। এই প্রজ্ঞা দিয়েই মানুষ শব্দার্থবোধ করে। অন্য প্রাণীর ইন্দ্রিয় শুধু শব্দ শুনতে পায় কিন্তু শব্দার্থবোধ করতে পারে না। মানুষের ইন্দ্রিয়ে প্রকৃতির সাধর্ম্য আছে কারণ মানুষ তার ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় ভোগ করতে পারে—বিষয়ভোগের সামর্থ্য তার আছে। আবার মানুষ প্রকৃতির সাধর্ম্যকে ত্যাগও করেছে। ত্যাগ করে সেই ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবদ্ভজন করতে পারে। চাণক্যের বাক্য আছে 'বিষামৃতয়োরাকরো জিহ্বা'। সংক্ষিপ্ত বাক্যে চাণক্য বলেছেন জিহ্বা দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কেই বুঝাচ্ছে—এটি শুধু উপলক্ষণে বলা হয়েছে। কারণ বাগ্মিতার লক্ষণ হল 'মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা'। এই জিহ্বাই সত্যবাক্য ও প্রিয়বাক্য বলে লোকের প্রীতি উৎপাদন করতে পারে আবার এই জিহ্বাই কুবাক্য বলে অপ্রিয়ভাজন হয়। প্রিয়-বাদীর কেউ শত্রু হয় না—কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্? বিষামৃতয়োরাকরো

জিহ্বা—বিষ হল প্রকৃতি সেবা এবং অমৃত হল গোবিন্দ সেবা। বিষমাত্রই যন্ত্রণাদায়ক। সেই বিষে যদি লাল রং মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি তার বিষক্রিয়া হবে না? প্রকৃতি বড় চতুরা—জানে যে জীব বিষ অর্থাৎ জগতের মায়িক বস্তু যা দুঃখের আকর তা নেবে না। তাই প্রকৃতি তাতে সুখের রঙে রঙিয়ে দিল। জীব এতই নির্ব্বোধ যে সেই বিষকে বিষ বলে মনে করল না। অনায়াসে আনন্দে সেই বিষ গ্রহণ করল এমনকি এ বিষ না পেলে বা পাওয়ার বাধা হলে আমরা ক্রুদ্ধ হই। এ সংসার জ্বালাময়। মৃত্যুর পরও এ যন্ত্রণার রেহাই নেই। একমাত্র গৌরগোবিন্দ বলতে পারলে তবে রেহাই। একমাত্র হরিপাদপদ্মভজন ছাড়া দুঃখছেদনের কোন উপায় নেই। ধ্রুবকে তাঁর মা সুনীতি দেবী এই কথাই বলেছিলেন। বাগীন্দ্রিয়ের ভোগ হল কথা বলা। জিহ্বার বিষভোগ হল প্রাকৃত কথা বলা। জিহ্বা উপলক্ষণে—সকল ইন্দ্রিয়কে এমন কি মন পর্য্যন্ত ধরা হয়েছে। সমুদ্রমন্থনের ফলে ধন্বন্তরি তো মাত্র এক কলসী অমৃত তুলেছিলেন আর শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরামর্শে মনুষ্যদেহ ক্ষীরসাগর মন্থন করতে পারলে কলসে কলসে অমৃত পাওয়া যাবে। টাকা, পুত্র ইত্যাদি পাওয়ার সময় সুখ বলে মনে হয়, কিন্তু এও দুঃখ, দুদিন পরে এই অর্থলাভ পুত্রলাভই দুঃখে পরিণত হবে। যার অর্থ, পুত্র নেই তার হারানোর ভয়ও নেই। কথায় আছে—শয়ানো ন পতত্যধঃ। অর্থবান্ ব্যক্তিই দরিদ্র হয়। অর্থহীনের দরিদ্র হবার ভয় নেই। সূর্য্যের দেশ অন্ধকার হতে পারে না—সংসারের উপাদান ত্রিগুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ: এর মধ্যে রজঃ তমঃ দুঃখের আকর। সত্ত্বগুণ থেকে সুখ হয় বটে কিন্তু এ সত্ত্বও মিশ্রিত। রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে এ সত্ত্বগুণ থেকেও সুখ মেলে না। এ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে ঠেকাঠেকি হয়ে গেছে। এ সত্ত্ব থেকে সুখ পাওয়া যেন আমিষ ঘরে নিরামিষ খাওয়া। অবশ্য এ সত্ত্ব শুদ্ধি করবার ব্যবস্থা আছে। এর নাম ভাবসংশুদ্ধি। ভাব মানে ভাবনা। চিত্ত ভগবানে নিযুক্ত করতে হবে। তারই নাম ভাবসংশুদ্ধি। চিত্ত ভগবানে নিযুক্ত করলেই কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ হবে। কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ হলেই কাম

ক্রোধাদি ত্যাগ হবে। আত্মীয়স্বজন যাদের নিয়ে সংসার, তাদের ওপর কর্তৃত্ব না করে সকলকে ভগবানের দাসদাসী মনে করতে হবে। শুধু মুখে বললে হবে না। মনেও ভাবতে হবে। সংসারকে আশ্রম বলা হয়েছে। প্রাকৃত রজঃ তমঃ ত্যাগ করে সত্ত্বসংশুদ্ধি করতে হবে। যেমন সোনার ধাতুজ মালিন্য আগুনে পোড়ালে চলে যায় তেমনি চিত্তকে সংযম অগ্নিতে পোড়াতে পারলে সত্ত্বশুদ্ধি হবে। এ মুখে বলা সহজ কিন্তু কাজে করা কঠিন। পরশমণি ছোঁওয়ালে যেমন সব ধাতুরই এক মূল্য হয়—তুলসীদাসজী বলেছেন—

অষ্টধাতুকে পরশ লাগায় তো
এক মূলসে বিকায়—

এই পরশমণি হল শ্রীগোবিন্দের নাম। এই নাম-পরশমণি যে কোন ইন্দ্রিয়ে লাগাতে হবে। এই নাম-পরশমণির প্রশংসা করে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেছেন—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মূরারে-।
বিরমিতনিজধর্মধ্যানপূজাদি যত্নম ॥

—বৃঃ ভাঃ ১।১।৯

এখানে দু'বার জয়তি বলা হল কেন? একবার জয় গোবিন্দ সঙ্গে অভিন্ন বলে আর একবার জয় নামী অপেক্ষা নামের মহিমা বেশী বলে। কারণ নামী পতিতের ইন্দ্রিয়গোচর হন না কিন্তু নাম পতিতের ইন্দ্রিয়গোচর হন। পতিতের জিহ্বায় নাম উচ্চারিত হন। তাই নামী অপেক্ষা নামের মহিমা বেশী। তাই আর একবার জয়। নাম নামী অভিন্ন। কারণ বলা আছে—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥

আরও বলা হয়েছে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।

ইন্দ্রিয় চিন্ময় হলেও তাতে গোবিন্দ দর্শন হবে না। যেমন সোনার

প্রতিমাকে তীর্থবারিতে অভিষেক করতে হয় তেমনি চিন্ময় ইন্দ্রিয় হলেই হবে না। তাকে প্রেম দিয়ে অভিষিক্ত করতে হবে। তবে সেই প্রেমাভিষিক্ত ইন্দ্রিয়ে ভগবদ্দর্শন হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ তার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়কে অপ্রাকৃত করবে কেমন করে? 'নাম' করুণা করে মানুষের ইন্দ্রিয়ে নেমে এলেন। কৃষ্ণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গোচর না হলেও তাঁর নাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গোচর হন। তাহলে কি এইটি বুঝতে হবে যে কৃষ্ণনাম অপেক্ষা কৃষ্ণ উত্তম ভগবান? তাই কৃষ্ণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে উদিত হন না? না, তা নয়। কারণ শাস্ত্র নাম এবং নামীকে অভিন্ন বলেছেন। তাহলে কি বুঝতে হবে নাম যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে উচ্চারিত হন তাহলে কি নাম খাঁটি নন? তাও ঠিক নয়। নাম যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে উচ্চারিত হন এতে বুঝা যায় জীবের প্রতি নামী (ভগবান) অপেক্ষা নামের করুণা বেশী। নর্দ্দমায় পড়ে থাকলে অন্য লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরাতে পারে কিন্তু মা বাবা তা পারেন না। নর্দ্দমা থেকে টেনে তোলেন। পাপের নর্দ্দমা থেকে নাম জীবকে টেনে তোলেন। পতিতকে বুকে তোলেন নাম। ছোট শিশুকে তুলতে গেলে মাকে নীচু হতে হয়। নাম পতিতকে তুলবার জন্যই নেমে আসেন। তাই তার নাম 'নাম'। এই নাম আনন্দস্বরূপ। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীজীর শ্রীমুখের উক্তি—

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী॥

চিকিৎসকের বাক্যের গৌরবে পিত্তরোগী মিছরি খায়। তেমনি শ্রীগুরু-পাদপদ্ম চিকিৎসকের বাক্যের গৌরবে নাম মিছরি খেতে হবে। প্রথম প্রথম তেতো লাগবে তারপর একটু একটু মিষ্টি লাগবে। তখন মনে হবে যতটা বলেছেন ততটা মিষ্টি নয় বটে তবে কিছু মিষ্টি। চুরাশি লক্ষ জন্মের পিত্তবিকার কি একদিনে কাটে? প্রতিদিন নিয়ম করে নাম করতে হবে। তাই 'অনুদিনম্' বলা হল। নাম আনন্দরূপম্ আনন্দস্বরূপ

অথবা আনন্দং রূপয়তি অর্থাৎ ভগবন্তং রূপয়তি। বিরমিত নিজধর্ম্ম বলতে বেদবিহিত স্বধর্ম্ম, নাম এদের ত্যাগ করায়। ভগবান বলেছেন—

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

—গীতা ১৮।৬৬

‘কথমপি’ শব্দের দ্বারা বুঝাচ্ছে কেনাপি ইন্দ্রিয়েণ। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ সব বুঝাচ্ছে তাতে মুক্তি হয়। নাম-পরশমণি স্পর্শ করাতে হবে। অন্য কাজ সংক্ষেপে সেরে গৌরগোবিন্দ বলবার সময় বাড়াতে হবে। এর পরে অবধূত সংবাদ বলবেন। ১৫—২০

শ্রীযদুরুবাচ ।

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্ত্তুঃ সুবিশারদা ।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ ॥ ১১
প্রায়ো ধর্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥ ২২
ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগো মিতভাষণঃ ।
ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ ॥ ২৩
জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা ।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা যুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ ॥ ২৪
ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণং ।
ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

যদুনৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা ।
পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং নৃপম্ ॥ ২৫

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

যদুমহারাজ অবধূতজীকে বলছেন—আপনি তো দেখছি অকর্ত্তা অর্থাৎ কিছুই করছেন না অথচ আপনি এই রকম লোকবিচক্ষণা বুদ্ধি কোথায় পেলেন ? কারণ আপনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় থেকেও যাঁকে আশ্রর করে বালকের মত বিচরণ করছেন । ২১

প্রায় দেখা যায় মানুষ আয়ু, যশ এবং সম্পত্তি লাভের আশায় ধর্ম, অর্থ কাম ও জ্ঞান বিষয়ের চেষ্টা করে । ২২

আপনি তো কবি (পণ্ডিত), কর্মকুশল, সুদর্শন এবং পরিমিতবাক্ তথাপি আপনি জড়, উন্মত্ত ও পিশাচের মত আচরণ করছেন অর্থাৎ কর্মও করছেন না আর কিছু ইচ্ছাও করছেন না । ২৩

এ জগতের প্রায় সকলেই কাম লোভ দাবাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হয় কিন্তু আপনাকে তো দগ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে না । গঙ্গার মধ্যে অবগাহন করে

হস্তী যেমন কোন তাপ অনুভব করে না আপনাকেও ঠিক সেই রকম দেখা যাচ্ছে। ২৪

হে ব্রাহ্মন্, আমি জিজ্ঞাসা করি বিষয়বাসনাশূন্য আত্মীয়স্বজনরহিত একক আপনার এত আনন্দের কারণ কি ? দয়া করে বলুন।

ভগবান বললেন, সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণভক্ত সুমেধা যদু-মহারাজের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় শ্রদ্ধাবনত যদুকে যথেষ্ট সম্মান করে বলতে লাগলেন। ২৫

স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ উদাহরণস্বরূপ যদু অবধূত সংবাদ বলছেন—বলবার সময় কিন্তু বললেন পুরাতন ইতিহাস প্রাচীন মনীষিগণ উদাহরণ দিচ্ছেন। 'আমি বলছি' এ কথা বললেন না। 'উদাহরন্তি' ন তু 'উদাহরামি।' কেমন করে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে ভজা যায়, পাওয়া যায়—মনীষিগণ তার উদাহরণ দিয়েছেন। অবধূত তাঁদেরই বলা হয় যাঁদের বেশভূষা দেখে বুঝতে পারা যায় না যে তিনি কোন্ আশ্রমের। এই অবধূত হলেন অকুতোভয়। ভয়ের সম্ভাবনা এঁর কোথাও থেকে নেই।

শ্রীদীপিকাদীপনকার এই অবধূতের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—ইনি হলেন দত্তাত্রেয় ঋষি। এই অবধূত হলেন কবি অর্থাৎ নিপুণদৃক্ বিদ্বান্। অবধূতকে যদুমহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন কারণ যদুমহারাজ ধর্মবিৎ। কৃষ্ণ নিজে যদুকে ধর্মবিৎ বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই বুঝতে হবে তিনি পাকা লোক। ভগবান নিজেই ধর্মের লক্ষণ করেছেন—

ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ। —ভাঃ ১১।১৯।২৭

ধর্মের অর্থ হল ভক্তিযাজন। কারণ ভক্তিকে বাদ দিয়ে ধর্মই দাঁড়ায় না। পরধর্ম ভক্তির লক্ষণে বলা আছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥ —ভাঃ ১।২।৬

অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তিমহারাণীর বিশেষণ বলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে।

ধর্মের বিশেষণরূপে বসে নি। কাজেই বুঝা যাচ্ছে ধর্ম বলতে ভক্তিকেই বুঝাচ্ছে। এ হল ঋষির বাক্য। ঋষি তাঁকেই বলা হবে যিনি তত্ত্বজ্ঞ এবং আচরণশীল। যিনি শুধু তত্ত্বজ্ঞ অথচ যাঁর আচরণ নেই তাঁকে ঋষি বলা যাবে না। ষাট হাজার ঋষি এক হাজার বছরের যজ্ঞের ছল করে কৃষ্ণকথা শুনতে বসেছেন। সূতমুনি পাণ্ডবদের কথা বলতে আরম্ভ করলে ঋষিদের মুখপাত্র হয়ে শৌনক বলছেন—পাণ্ডবদের কথা বল আপত্তি নেই, কিন্তু তাতে যেন কৃষ্ণকথা থাকে। হু'টাকা জমলে যেমন টাকার ওপর মমতা হয় তেমনি তত্ত্বের কিছু জানলে তবে পরমতত্ত্বে দৃষ্টি হয়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ।

এখানে 'বৈ' শব্দের সার্থকতা হল এর দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রই সূচিত হচ্ছে। যে উপায়ে ভগবানে ভক্তি লাভ হয় তার নামই ধর্ম। এই ভক্তি কেমন তার উন্নতশ্রেণীর হিসাব দেওয়া হচ্ছে। অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা—আনুকূল্যে যে আচরণে ভক্তি হবে তার নাম ধর্ম। ভক্তি অহৈতুকী হতে হবে। অর্থাৎ এতে কোন হেতু থাকা চলবে না। ভগবান বলেছেন কর্মেও হেতু থাকলে দোষ হবে।

যা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি। —গীতা ২।৪৭

অর্থাৎ ফল দেখে কর্ম কর না। কর্ম দুই প্রকার। সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্মে কোন পরমার্থ নেই। নিষ্কাম কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং এই চিত্তশুদ্ধি দ্বারে জ্ঞান হবে। নিষ্কাম কর্ম থেকে জ্ঞান হবে কি করে—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন—ধানের বীজ পুঁতলে তার থেকে প্রথমে ঘাসের মত হয় কিন্তু সাধারণ ঘাস থেকে এটি ভিন্ন কারণ একে ঘাসের মত দেখতে হলেও এ ঘাসে শস্যের থোড় জন্মায় যার নাম ধানের শিষ। এটি কিন্তু সাধারণ ঘাসে হয় না। তেমনি অন্য সকাম কর্মে জ্ঞান হয় না কিন্তু নিষ্কাম কর্ম থেকে চিত্তশুদ্ধি দ্বারে জ্ঞান জন্মায়। ভক্তি ভাগবতী হবেন এবং অনিমিত্তা হবেন। কোন নিমিত্ত থাকলে সে ভক্তি দিয়ে ভগবানকে বশীভূত করা যাবে না। টাকা, পুত্র, সম্মান চাইলে সে ভক্তিতে গোবিন্দ বশীভূত হবেন না। শ্রীরূপ-

গোস্বামিপাদ বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

—ভঃ রঃ সিঃ ১।১১

জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্—অর্থাৎ ভগবান থাকবেন এবং ভক্ত থাকবেন। মাঝখানে জ্ঞান, কর্ম বা যোগের আড়াল থাকা চলবে না। এ জগতেও দেখা যায় কোন প্রয়োজনীয় বা প্রিয় জিনিষে ব্যবধান সহ্য হয় না। গোবিন্দদর্শন করতে একা যেতে হবে। সঙ্গের সঙ্গিনী থাকবেন একমাত্র ভক্তিমহারাণী। এই ভক্তি তাই শুদ্ধা হওয়া চাই। শুধু ভগবানের নাম উচ্চারণই শুদ্ধাভক্তি। মা দেবহূতি পুত্র ভগবান কপিলদেবকে বলেছেন—

অহো বত শ্বপচোহত গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

—ভাঃ ৩।৩৭

এখানে ‘বর্ত্ততে’ বর্ত্তমান কাল দেওয়া আছে। অর্থাৎ নাম উচ্চারণ কাজটি যেন অতীত বা ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে না হয়। সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকবে। যার জিহ্বায় সর্ব্বদা নাম বর্ত্তমান—শ্রীস্বামিপাদ বললেন বুঝতে হবে সে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহু তপস্যা করেছে—হোম করেছে, তীর্থস্নান করেছে, বেদপাঠ করেছে—এখানে প্রত্যেকটি ক্রিয়াতে ‘লিট্’ প্রয়োগ আছে—অর্থাৎ অত্যন্ত পরোক্ষে লিট্ হয়। বহুদিন হতেই তার এ সব কাজ করা হয়ে গিয়েছে তবে আজ তার জিহ্বায় ভগবানের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। শ্রীজীবপাদ এই অর্থ না দিয়ে একটু অন্য রকম করে বললেন—শ্রীজীবপাদ পূর্ব্ব মঞ্জরী স্বরূপে এবং পরে গোস্বামী স্বরূপে বৃন্দাবনে বাস করেছেন—কাজেই বৃন্দাবনে থাকা লোক শ্রীজীবপাদ বললেন—জিহ্বায় নাম উচ্চারিত যার হয় বুঝতে হবে সেইটিই পরমা ভক্তি। শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত তপস্যা, হোম, বেদপাঠ, তীর্থস্নান করবার পর যদি জিহ্বায় নাম উচ্চারিত অর্থাৎ ভক্তিযাজন হয় তাহলে তপস্যাদির ফল ভক্তি, এ কথা বলতে হয়। কিন্তু তপস্যাদির ফল ভক্তি, এ কথা আর যেই বলুক মাতা

দেবহূতি ভগবানের মা যিনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তিনি যে এ কথা বলতে পারেন না এটি নিশ্চিত। কারণ তপস্যাদির বিনিময়ে হরিভক্তি লাভ হয় না, তাহলে হরিভক্তি অন্য সাধ্য হয়ে যায় কিন্তু ভক্তিদ্বারাই ভক্তি সাধ্য হয়, অন্য কিছু দ্বারা ভক্তি সাধ্য হয় না। শাস্ত্র বলেছেন—

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা···

তপস্যাদির ফল যদি হরিভক্তি বলা যায় তাহলে রাজর্ষি ভরতের বাক্যে দোষ পড়ে—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

—ভাঃ ৫।১২।১২

কর্মের বিনিময়ে হরিভক্তি হয় না। ব্রহ্ম নির্গুণ, কাজেই তাঁর সাধন জ্ঞান নির্গুণ। ভগবান হলেন নির্গুণতম, তাই তাঁর সাধনভক্তিও নির্গুণতমা। হরিভক্তির হেতু কোনটিই হয় না। ভরত বললেন ভক্তি অন্য কিছুতে হয় না বিনা মহৎপাদরজোভিষেকম্। মহতের পদরজে মস্তক অভিষিক্ত করাই ভক্তিলাভের একমাত্র হেতু। কৃপার স্বভাব নিম্নগামী। জলপ্রার্থী নীচে দাঁড়ায়। তাই কৃপা চরণরজেই থাকে। সেই মহৎচরনরজঃ যদি হরিভক্তির হেতু হয় তাহলে তো ভক্তিকে স্বপ্রকাশ বলা যায় না। মহৎকৃপাকে ভক্তির হেতু বললে ভক্তির স্বপ্রকাশত্বে বাধা পড়বে না। কারণ মহৎ হলেন হরিভক্ত। হরিভক্তের মধ্যে হরিভক্তি আছে। মহতের চরণধূলির কৃপা মানে ভক্তিরই কৃপা। তাহলে বিচারে দেখা গেল ভক্তির দ্বারাই ভক্তিলাভ হল। ভক্তির স্বপ্রকাশত্ব বজায় রইল। ভক্তি অন্য সাধ্য হল না। প্রহ্লাদজীও এই কথা বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

—ভাঃ ৭।৫।৩২

প্রহ্লাদজীর এই বাক্যে বুঝা গেল নিষ্কিঞ্চনের চরণরজে মস্তক অভিষিক্ত হলে তবে ভক্তি লাভ হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই নিষ্কিঞ্চন বলতে কাকে

বুঝায়? যারা গৌরগোবিন্দ নিয়ে সব ছেড়েছে তারা হল নিষ্কিঞ্চন। কৃষ্ণপ্রণামের ফল সুভদ্রা দেবী ব্যক্ত করেছেন দশাশ্বমেধী অবভৃথ স্নান করলেও যে ফল পায় না কৃষ্ণকে একবার প্রণাম করলে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী ফল পাওয়া যায়। এই দুইএর মধ্যে তফাৎ কি? দশাশ্বমেধীর পুনর্জন্ম হয় কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীর পুনর্জন্ম হয় না। তাহলে দেখা গেল হরিভক্তির মধ্যে সব ফল আছে। যে ব্যক্তি হরিভক্তির যে কোন অঙ্গ যাজন করে তার সর্ব্ব সাধনের সব ফল পাওয়া হয়ে গিয়েছে। চিন্তামণি যেমন যে কোন সম্পদ দিতে সমর্থ তেমনি চিন্তামণি সদৃশ হরিনাম যে লাভ করেছে তার সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে। পিতামাতা যে শিশুকে লালন পালন করেন সেখানে কোনও হেতুর অপেক্ষা নেই—এটি মাতা-পিতার স্বধর্ম। হরিভজনও তেমনি কোন হেতুতে করবে না, স্বভাবেতে বুকে ধরবে। কামনার জন্য কৃষ্ণ ভজলেও অবশেষে কৃষ্ণকেই পাবে। কারণ কথা আছে—

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।

কামনা পূরণের জন্য যদি কৃষ্ণ ভজ তাই ভজ। কৃষ্ণকেই ভজ অন্য দেবতা ভজ না। কেন? অন্য দেবদেবী কামনা পূরণ করবেন বটে কিন্তু যতটুকু চাওয়া যাবে ততটুকু দেবে। ফাউ দেবে না। কিন্তু গোবিন্দের কাছে যা চাওয়া যাবে তা তো পাওয়া যাবেই উপরন্তু ফাউ পাওয়া যাবে। এ ফাউ কাণাবেগুনের ফাউ নয়, গোবিন্দচরণ ফাউ। শ্রীশুকদেব বললেন—কামনা ছাড়া যদি ভজতে পার তাহলে সেই ভজনই তো উত্তম। আর যদি কামনা নিয়ে ভজ তাহলেও গোবিন্দকেই ভজ, অন্য কাউকে ভজ না।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ —ভাঃ ২।৩।১০

শুদ্ধাভক্তি যাজন করতে হবে—এর সঙ্গে আর কিছু মেশালে চলবে না। পেটে জঠরাগ্নি না থাকলে শুধু হজমিগুলি খেয়ে হজমের কাজ করলে চলবে না। তাতে আরও খারাপ হবে। ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানাদির মিশ্রণ করলে জ্ঞানাদি ফল দেবে না—ফল দেবে ভক্তিই। যেমন গিরিধারীর

গিরিধারণলীলায় যশোদামায়ের আদেশে শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সখা লগুড়ধারণ করে গিরিরাজ ধারণে সহায়তা করলেও তাদের কোন সামর্থ্যই নেই। গোপালের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিরই সব সামর্থ্য। সে যদি না পারে তাহলে আর কেউ গিরিরাজ ধারণে সমর্থ হবে না। তেমনি শুদ্ধাভক্তিই একমাত্র কাজ করবে। ভক্তিকে চন্দ্রকলা বলা হয়েছে। আর সকলে হল রাহু। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন পুষ্টিলাভ করে না, তেমনি জ্ঞানাদি অন্যান্য সাধন যদি ভক্তিকে গ্রাস করে তাহলে সে ভক্তি পুষ্ট হয় না। হজমিগুলি খেলে যেমন জঠরাগ্নির কাজে পুষ্টি হয় না। অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা শুদ্ধাভক্তি যাজনেরই ফল। যার দ্বারা (যয়া) আত্মা (মন) সুপ্রসীদতি। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে অন্য সাধনে কি মন প্রসন্ন হয় না? অন্য সাধনে মন প্রসন্ন হয় কিন্তু ভক্তিতে মন অতিশয় প্রসন্ন হয়। এ প্রসন্নতা অন্য কোন সাধনে হয় না। প্রসীদতি আর সুপ্রসীদতি—তফাৎ কি? ভক্তি দ্বারা চিত্তদর্পণ মার্জিত হলে মধুসূদন সেখানে বসেন। এই ভক্তির নাম ধর্ম। যিনি এইরূপ ধর্ম করেন তিনিই ধর্মবিৎ। ভগবান যদুমহারাজকে ধর্মবিৎ বললেন তার থেকেই বুঝা যাচ্ছে যদুমহারাজ শুদ্ধাভক্তি যাজন করতেন। সেই যদুমহারাজ অবধূতকে জিজ্ঞাসা করছেন—

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্ত্তুঃ সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ॥

—ভাঃ ১১।৭।২৬

সর্ব্ববিচক্ষণাবুদ্ধি আপনি তো অকর্ত্তা অর্থাৎ কোনও কাজ করেন না। শিশুর মত আপনি ঘুরে বেড়ান। শিশুর ঘুরে বেড়ান স্বাভাবিক কিন্তু একজন বিজ্ঞলোকের পক্ষে শিশুর মত ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। আপনি তো বিদ্বান হয়ে বিজ্ঞ হয়েও অজ্ঞ শিশুর মত ঘুরে বেড়ান—এ বড় বিচিত্র। এ বুদ্ধি আপনি কোথায় পেয়েছেন?

এ জগতে লোকের প্রায়ই ধর্ম, অর্থ, কাম বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়—তাও আয়ু, যশ এবং শ্রীলাভের আশায়। আত্মবিচারে যে মানুষের জিজ্ঞাসা হয় তারও মূলে হেতু আছে। এখানে আয়ু হেতু না হলেও যশের এবং

শ্রীলাভের জন্য মানুষ আত্মবিচারে প্রশ্ন করে অর্থাৎ জগৎকে দেখাতে চায় আমি কত আত্মানুশীলন করি। এখানেও যশোলাভের আশা। মোক্ষপ্রার্থীর মত আচরণ হয়ত আমরা করি কিন্তু সত্যি করে মন-ডুবুরি নামালে দেখা যাবে সত্য মোক্ষ আমরা চাই না। উপরোক্ত তিনটি হেতুলাভের জন্যই করা হয়। আধুনিক জগতে মানুষের এ জিজ্ঞাসা প্রায়ই ওঠে না তাই 'প্রায়' কথাটি দেওয়া হয়েছে। 'জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা' বলা হয়েছে। বিধিমতে আমাদের বাঁচা চলে না। কারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসা ছাড়া মানুষের নিজস্ব কোন কর্ত্তব্য নেই। মানুষ আর যা করে সবই অন্য জন্মে (পশ্বাদি) তা করা হয়ে গিয়েছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই শুধু মানুষ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে বাদ দিয়ে মানুষ যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার বাঁচার কোন সার্থকতা নেই। গাছও তো বেঁচে থাকে।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥

—ভাঃ ২।৩।১৮

তত্ত্বজিজ্ঞাসা হল—কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়? মানুষই কেবল এ জিজ্ঞাসা করতে পারে। তত্ত্বজিজ্ঞাসা বাদ দিলে মানুষের বাঁচার কোন সার্থকতা নেই। কারণ বলা আছে—

কর ইন্দ্রিয়সুখ যথা শূকরে।

আজ্ঞবিচারে যারা প্রশ্ন করে তাদেরও যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে। লোকে বুঝুক কেমন আত্মানুশীলন করছি। আপনি যে অকর্ত্তা এ সামর্থ্যের অভাব হেতু নয়। অজ্ঞ বলে যে কাজ করেন না তাও নয়, কারণ আপনি কবি অর্থাৎ দক্ষ। কুৎসিৎ বলে কাজ করেন না তাও নয়, কারণ আপনি সুভগ। আপনার দর্শনে নয়নাদি ইন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ করে। কাজেই অকর্ত্তা হওয়ার মত কোনও হেতুই আপনাতে নেই। সব হেতুগুলিই যদুমহারাজ খণ্ডন করলেন। সার কথা সুধী লোক বলেন—এর নাম বাগ্মিতা। মিতং সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা। করবার মত সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে আপনি অকর্ত্তা এর হেতু কি?

যদুমহারাজের পরবর্ত্তী প্রশ্ন—

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গান্তঃস্থ ইব দ্বিপঃ॥

—ভাঃ ১১।৭।২৯

দহ + বর্ত্তমানে শানচ্ প্রত্যয় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ এ সংসারে নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। জগতের সবই পুরান হয়, কিন্তু দগ্ধ হওয়াটি আর পুরান হয় না। চৌদ্দ ভুবনের কোন প্রাণীই এ দহনের হাত হতে রেহাই পায় না। অন্য ভুবনের কথা ছেড়ে দিলেও এই ভূলোকেই দেখা যায় জীব নিরন্তর ত্রিতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে হে অবধূত, আপনি তো দগ্ধ হচ্ছেন না—আপনি গঙ্গাস্থিত গজের ন্যায় পরম সুখে স্নিগ্ধতায় রয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—দাবানল জ্বললেও হস্তী যদি নিকটস্থ গঙ্গায় নিমজ্জিত থাকে তাহলে সে অগ্নিদহন বরণ করে না বরং পরম শান্তিতে থাকে। যদুমহারাজ অবধূতজীকে প্রশ্ন করছেন—আপনিও যে সেই গঙ্গানিমজ্জিত হস্তীর মত পরম শান্তিতে রয়েছেন এর কারণ কি? কোন্ গঙ্গায় আপনি নিমজ্জিত আছেন? সে গঙ্গার ঠিকানা কি? আপনার আত্মাতে আনন্দের কারণ বলুন। জগতে তো কোনোটিতেই আনন্দের কারণ নেই। জগতে এই দুঃখের মাঝে আপনার আনন্দের কি কারণ বলুন। আপনি তো কেবলাত্মা একাকী বিচরণ করেন। একাকী কেমন করে আনন্দ পান? আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা পঞ্চ বিষয় স্পর্শ হয় না। স্পর্শবিহীনের কেমন করে সুখ হবে?

যদুমহারাজ এই প্রশ্ন করবার পর শ্রীভগবান বললেন—ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দিতে যদু মহারাজ জানেন। অবধূত কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নন। কিন্তু অবধূত উত্তর দিলেন। যদুমহারাজ কিসে উত্তর দিতে বাধ্য করলেন? ব্রাহ্মণকে পরিচর্য্যা দ্বারা যার বশীভূত করা স্বভাব সেই সুমেধার উত্তর দিচ্ছেন অবধূত। 'সুমেধা' শব্দের অর্থ কি? সুবুদ্ধিপ্রযুক্তো তন্মনস্কেন কথানুরাগম্, বিমলা চ দৃষ্টি মুখং প্রসন্নম্—এই লক্ষণ দেখে তবে

অবধূত যদুমহারাজের কথার উত্তর দিয়েছেন। মেধা শুদ্ধ না হলে সে উত্তম বুদ্ধিতে নিযুক্ত হতে পারে না। 'মহাভাগ' সম্বোধনের সার্থকতা হল ভাগ্য যার বড়। এর মানে কি? ভাগ্যের ফলেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হয়। গোবিন্দপাদপদ্ম সবচেয়ে বড়, তাই চেয়েছেন। তাই তাঁকে 'মহাভাগ' বলা হয়েছে।

এর পরে অবধূত উত্তর দেবেন। রাজা বিনয়ে অবনত হলেন—প্রশ্রয়াবনত। অবধূত জড়োন্মত্তপিশাচবৎ। তাঁর শ্রীচরণে যদুমহারাজ বিকিয়েছেন। বস্তু চিনে নিয়ে নিজের অহঙ্কার ভুলে বিকাতে পারলে তবে বস্তু মেলে। এর পরে অবধূত উত্তর দেবেন। ২১-২৫

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ॥ ২৬
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥ ২৭
এতে মে গুরবো রাজংশ্চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥ ২৮
যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে॥ ২৯

বঙ্গানুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—হে রাজন্! আমার বুদ্ধ্যুপাশ্রিত গুরু অনেকে আছেন। যাঁদের কাছ থেকে বুদ্ধি লাভ করে আমি এইরকম মুক্ত হয়ে পৃথিবী পর্য্যটন করছি তাঁদের পরিচয় দিই শুনুন। তাঁরা হলেন—১। পৃথিবী ২। বায়ু ৩। আকাশ ৪। জল ৫। অগ্নি ৬। চন্দ্র ৭। সূর্য্য ৮। কপোত ৯। অজগর ১০। সিন্ধু ১১। পতঙ্গ ১২। মধুকর ১৩। হস্তী ১৪। ভ্রমর ১৫। হরিণ ১৬। মৎস্য ১৭। পিঙ্গলা ১৮। কুরর ১৯। বালক ২০। কুমারী ২১। শরনির্মাতা লোহকার ২২। সর্প ২৩। উর্ণনাভি (মাকড়সা) ২৪। সুপেশকৃৎ অর্থাৎ কীটবিশেষ। ২৭

হে মহারাজ, এই চব্বিশজন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁদের কাছে আমি তাঁদের বৃত্তি শিক্ষা করেছি। ২৮

হে নাহুষনন্দন (যযাতিপুত্র) যদু পুরুষশ্রেষ্ঠ! এঁদের মধ্যে আমি যাঁর কাছে যেটি শিক্ষা করেছি তা বলছি শুনুন। ২৯

অবধূত বললেন—সংসার-তাপ থেকে কেমন করে মুক্ত হওয়া যায়, তাপত্রয়ের মধ্যে থেকেও কেমন করে তাপের হাত থেকে নিজেকে বাঁচান যায় এই উপায়টি যে গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি তা বলি মহারাজ—আপনি শ্রবণ করুন। আমার গুরু সবশুদ্ধ চব্বিশ জন। এঁরা কেউই আমার দীক্ষাদাতা গুরু নন। এঁরা সকলেই আমার শিক্ষাদাতা গুরু। আবার তাঁরা কেউ আমাকে উপদেশ করেন নি। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের কাজ দেখে আমি শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করেছি, তাই তাঁদের গুরু বলে মেনেছি। যাঁর কাছ থেকে যা শিখেছি তা বলি, আপনি বুদ্ধির দ্বারা বুঝে নিন। কিছু না শিখলে গুরু হয় না। কি শিখলেন ? অবধূত বলছেন—এঁদের বৃত্তি দ্বারা আমার শিক্ষণীয় বস্তু শিক্ষা করেছি। শিক্ষণীয় মানে কি ? হেয়োপাদেয় বিচার অর্থাৎ শিক্ষার বিষয় হল যেটি ত্যাজ্য সেটি ত্যাগ করা এবং যেটি গ্রাহ্য সেটি গ্রহণ করা। এরই নাম শিক্ষা। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রমহারাজকে বলেছেন—

যঃ স্বকাৎপরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥

—ভাঃ ১।১৩।২৬

বিদুর বলিলেন—‘দাদা, সিংহাসনে উপবেশন করলেই তাকে নরোত্তম বলে না। কিন্তু যিনি নিজে অথবা পরের উপদেশে বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ হয়ে হৃদয়ে হরিকে ধারণ করে সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন তাঁকেই নরোত্তম অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। নরোত্তম বলতে রাজাকে বুঝায়। বিদুর তিরস্কার করে বলছেন, ভীমের দেওয়া বলি পিণ্ড গৃহপাল্যের মত ভক্ষণ কর—এতে তোমার লজ্জা করে না ? জন্মান্ধতার পরেও তোমার এ কি অন্ধতা দাদা ? বিদুর জানেন সম্মান করে কথা বললে এখন কল্যাণ হবে না। কঠোর উপদেশ দিতে হবে তবে চেতনা হবে। আঘাত না দিলে মোহ ত্যাগ হয় না। আত্মবান্ শব্দের অর্থ জিতেন্দ্রিয়। জাতনির্বেদ তো আগেই বলেছেন, আবার আত্মবান্ কেন ? তার প্রয়োজন আছে—কারণ জাতনির্বেদ ক্ষণিক হতে পারে, ক্ষণিককে

চিরস্থায়ী করবার জন্য আত্মবান হওয়ার দরকার। নির্বেদ বা জিতেন্দ্রিয়তা হল অন্নের ব্যঞ্জনের মত সহায়কমাত্র। বেঁচে থাকার পর গয়না কাপড় দিয়ে সাজানোর মত। কিন্তু প্রাণ হল 'হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ'। চোরের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নিজে কাজ করতে হবে। চোর যেমন ঘরে ঢুকে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু নিয়ে যাতে কেউ না দেখে এইভাবে পালিয়ে যায় আমাদেরও চোরের মত কাজ করতে হবে। এ সংসারে ভগবান এবং মায়া দুইই মেশামেশি হয়ে আছে। ভগবান আমাদের বিবেক দিয়েছেন— ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতার নামই বিবেক। তাতেও যদি আমরা হরি না নিই, তাহলে দণ্ড আমাদের পেতেই হবে। এ দণ্ড ভগবানের ঘাড়ে চাপালে হবে না। হরিকে এ সংসার থেকে নিয়ে হৃদয়ে ধারণ করে যে প্রব্রজ্যা আশ্রম গ্রহণ করতে পারে সেই নরশ্রেষ্ঠ। হরিই একমাত্র গ্রাহ্য এবং হরি ব্যতিরিক্ত যা কিছু সবই ত্যাজ্য। যা সুখদ তাই গ্রাহ্য এবং যা দুঃখদ তাই ত্যাজ্য। আপাত সুখদ যা পরিণামে দুঃখদ তাও ত্যাজ্য। কিন্তু আপাত দুঃখদ যদি পরিণামে সুখদ হয় তাহলে তা গ্রাহ্য। যেমন শিক্ষকের বেত্রাঘাত ভাবী কল্যাণকর বলে তাও সহ্য করা হয়। জগতের তাবৎ বস্তু আপাত সুখদ, পরিণামে দুঃখদ। নিত্য নূতন যা তা সুখদ, আর এ ছাড়া সবই দুঃখদ। ত্যাজ্য গ্রাহ্য বোধই হচ্ছে শিক্ষা। আমরা ত্যাজ্যকে আদর করে গ্রহণ করি, আর গ্রাহ্যকে ত্যাগ করি। কাজেই প্রকৃত শিক্ষা আমাদের হয়নি। শিক্ষার নামে কুশিক্ষা হয়েছে। সমুদ্র-মন্থনে যখন লক্ষ্মী উঠলেন তখন মুনি, ঋষি, মহাদেব সকলেরই শিক্ষা বিচার করে দেখিয়েছেন যে কারও শিক্ষা হয়নি। কোথাও না কোথাও ত্রুটি থেকে গেছে। যেটি গ্রাহ্য সেটি গ্রহণ করা হয়নি আর যেটি ত্যাজ্য সেটি ত্যাগ করা হয়নি। দুর্বাসা ঋষির তপস্যা থাকলেও ক্রোধ জয় হয়নি। শিবিরাজ দাতা বটে কিন্তু সে দান বিষ্ণু বৈষ্ণবে না হওয়ায় তা ব্যর্থ। সে দানে মুক্তি হয় না। মহাদেব চিরায়ু হলেও তাঁর আচার মঙ্গল নয়। সনকাদি মুনি সদাচারসম্পন্ন ও চিরায়ু হলেও তাঁরা দ্বিতীয় সঙ্গ চান না কাজেই লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর সেখানে গিয়েও লাভ নেই। লক্ষ্মী

তাঁকেই গ্রহণ করবেন যাঁর লক্ষ্মীকেও প্রয়োজন নেই। মুকুন্দকেই লক্ষ্মী বরণ করলেন। মুকুন্দ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন—স্বরূপসম্প্রাপ্তস্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। লক্ষ্মী মুকুন্দকে কামনা করেছেন কিন্তু মুকুন্দ তাঁকে চান নি। প্রাকৃত বস্তু যা কিছু সবই ত্যাজ্য। আর গৌরগোবিন্দপাদ-পদ্মই গ্রাহ্য। এই মানবদেহই মুক্তির সাধন। যদুমহারাজকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যে পুরুষকে অবলম্বন করে গোবিন্দ আসবেন তিনি তো পুরুষশ্রেষ্ঠ বটেই। অবধূতজী শুধু 'শুনুন মহারাজ'—একথা বলেন নি। বলেছেন—'নিবোধ' অর্থাৎ ভাল করে বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিন। শুধু শুনলে হবে না। তাতে বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নিলে সেটিতে আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

এই অবধূতজীর পরিচয় জানবার কৌতূহল হতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের টীকাকার শ্রীস্বামিপাদ, শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ, দীপিকাদীপনকার বলেছেন—এই অবধূত হলেন দত্তাত্রেয় ঋষি।

অবধূতজীর চব্বিশজন গুরু। তিনি নাম করে বলেছেন—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, ভ্রমর, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুরর, বালক, কুমারী, শরনির্মাতা লোহকার, সর্প, উর্ণনাভি (মাকড়সা) এবং সুপেশকৃৎ অর্থাৎ কীটবিশেষ। ২৬—২৯

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ।
তদ্বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্ ॥ ৩০
শশ্বৎ পরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধু শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্ ॥ ৩১
প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ ॥ ৩২
বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্ব্বতঃ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিসজ্জেত বায়ুবৎ ॥ ৩৪
পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্গুণাশ্রয়ঃ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্ ॥ ৩৪

বঙ্গানুবাদ

পৃথিবীর কাছে অবধূতজীর শিক্ষা—দৈববশীভূত ব্যক্তি ভূতের দ্বারা আক্রান্ত হলেও কখনও সন্মার্গ থেকে বিচলিত হবে না। পৃথিবীর কাছ থেকে এই ক্ষমাগুণ শিক্ষা করেছি। ৩০

পৃথিবীর দুটি অংশ পর্ব্বত ও বৃক্ষ। সাধু ব্যক্তি তাদের কাছে শিক্ষা করবেন পরোপকারার্থে চেষ্টা ও পরার্থে নির্জন বাস। বৃক্ষের শিষ্য হয়ে ছেদন বহনাদির মত পরাধীনতা শিক্ষা করবেন। ৩১

বায়ু দুই প্রকার—প্রাণবায়ু ও বাহ্যবায়ু। এর মধ্যে প্রাণবায়ুর কাছে শিক্ষা—প্রাণবায়ু যেমন ইন্দ্রিয়বিষয়কে অপেক্ষা না করে কেবল আহার মাত্রে জীবিত থাকে, মুনিও সেইরকম ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় ত্যাগ করে প্রাণবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকবেন। যাতে জ্ঞাননাশ না হয় এবং মন বুদ্ধি চঞ্চল না হয় সেইরকম আহার করবেন। ৩২

বাহ্যবায়ুর কাছে শিক্ষা—বিষয়সকল সেবা করেও তাতে অনাসক্ত হবে। যোগী ব্যক্তি নানাধর্মবিশিষ্ট বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েও গুণ দোষ বিবেচনা করে বায়ুর মত তাতে অনাসক্ত হবেন। ৩৩

বায়ু যেমন গন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়েও তাতে লিপ্ত হয় না, আত্মদর্শী যোগী ব্যক্তিও সেইরকম ইহলোকে পার্থিব দেহে প্রবেশ করে তার গুণকে আশ্রয় করেও সে গুণে যুক্ত হবেন না। ৩৪

অবধূতজীর প্রথম গুরু হলেন পৃথিবী। পৃথিবীর কাছে ক্ষমাগুণ শিক্ষা করলেন। পৃথিবী যেমন নানাপ্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হলেও কিছু বলে না—সর্ব্বংসহা ধরিত্রী। যোগীকেও সেইরকম কারও দ্বারা আক্রান্ত হলেও কিছু বলা চলবে না। পৃথিবী আবার দু'রকম। (১) বৃক্ষরূপ ও (২) পর্ব্বতরূপ। এর মধ্যে বৃক্ষের কাছে শিক্ষা—বৃক্ষ যেমন ফল দিয়ে পরের সেবা করে, পরের জন্যই তার দান, বৃক্ষ ফল কখনও নিজে খায় না, অপরকে দান করে—অবধূতজী বৃক্ষের কাছে এইটিই শিক্ষা করলেন জীবন পরের জন্য দান করতে হবে। পরার্থেই সকল চেষ্টা করতে হবে। আর দ্বিতীয় যে পর্ব্বত তারও সব দান পরের জন্য। সেও নিজে কিছু ভোগ করে না। অবধূতজী দেখলেন এদের কাছে পরার্থসেবা শিখতে হবে। এদের কাছে শিখতে হবে সর্ব্বদা পরাধীন হয়ে থাকতে হবে। কোথাও স্বাতন্ত্র্য চলবে না। বৃক্ষ যেমন সম্পূর্ণভাবে পরের অধীন—যেমন কেউ বৃক্ষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রোপণ করছে আবার কেউ বা কখনও তাতে জলসেচন করছে, বৃক্ষ কোন প্রতিবাদ না করে নীরবে সেটি মেনে নেয়—যোগীকেও সেইরকম পরের অধীন হয়ে সর্ব্বদা থাকতে হবে। কোন স্বাধীনতা প্রকাশ করা চলবে না। বৃক্ষ যেমন কোন আপত্তি করে না যোগীকেও তেমনি অন্যের ব্যবহারে কোন আপত্তি করা চলবে না। পর্ব্বতও পরাধীন তবে বৃক্ষ পর্ব্বতের চেয়ে আরও পরাধীন। পর্ব্বতের কাছ থেকেও পরাধীনতা শিক্ষা করলেন। পর্ব্বত পৃথিবীকে ধারণ করে, প্রস্রবণের জল দান করে, পর্ব্বতে উৎপন্ন রত্নাদি—তাও কোনটি নিজে ভোগ করে না, সবই পরের জন্য দান করে। সাধু ব্যক্তিকেও তেমনি সর্ব্বস্ব পরের জন্য দান করতে হবে। পরার্থেই তার সকল চেষ্টা হওয়া উচিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে অবধূতজীর প্রথম গুরু পৃথিবীর কাছে তিনটি

শিক্ষা—প্রথম হল ক্ষমা, দ্বিতীয় হল পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা বৃক্ষের মত, আর তৃতীয় হল বৃক্ষ ও পর্ব্বত (পৃথিবীর দুটি রূপ) যেমন পরাধীন বৃত্তি তেমনি ভজনীয়ারও সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। কোন কিছুতে আপত্তি করা চলবে না। রাজর্ষি ভরতের যখন চরম জন্ম অর্থাৎ তৃতীয় জন্ম—জড়ভরত জন্মে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। কোনও কিছুতে আপত্তি করেন নি। সাধনপথে যাঁরা অগ্রসর হবেন তাঁদেরও তেমনি সমর্পিতাত্মা হতে হবে। কোনও কিছুতে আপত্তি করা চলবে না।

এর পরে দ্বিতীয় গুরু হলেন বায়ু। বায়ু দু' রকম—প্রাণবায়ু যাকে আন্তর বায়ু বলা হয় এবং বাহ্যবায়ু। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য খাদ্যাদির গ্রহণ নয়। প্রাণ যেমন আহারমাত্রে তুষ্ট হয়, রসাদির বিচার করে না, (রসাদির বিচার করে রসনেন্দ্রিয়) এই প্রাণবায়ুর কাছে এই শিক্ষা করতে হবে—আহারপ্রাপ্তিমাত্রে তুষ্ট হতে হবে। তাতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য রসাদির বিচার করলে চলবে না। বাক্য ও মন বিক্ষুব্ধ না হয় এমন আহার করতে হবে। আবার আচরণও সেই রকম করতে হবে। বাক্য বললেই মন বিক্ষুব্ধ হয় এবং মন বিক্ষুব্ধ হলেই জ্ঞাননাশ হয়। কিন্তু যাতে জ্ঞাননাশ হয় এমন কাজ করা চলবে না। দেহধারণের জন্য যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করতে হবে। অধিকগুণসম্পন্ন খাদ্যাদির আশায় বাক্য মন বিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই তা আশা করা উচিত নয়। কারণ বাক্য ও মন বিক্ষিপ্ত হলেই জ্ঞাননাশ হয়। কিন্তু এমন আচরণ করা চলবে না যাতে জ্ঞাননাশ হয়। ইন্দ্রিয়প্রিয়তা অপ্রিয়তায় তুষ্টি বা অতুষ্টি নয়—শুধু প্রাণবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ। প্রাণ খাদ্য পেলেই খুসী। খাদ্যের ভালমন্দ বোঝে না। মন বা ইন্দ্রিয়ই ভালমন্দ বোঝে। জ্ঞান যাতে নষ্ট না হয় এমন আচরণ করতে হবে। খাদ্য কদন্ন হলে মন কষ্ট পায়। বিষয়ের মধ্যে জাতিভেদ আছে। বিষয়ের নানা ধর্ম—তিক্ত বা মধুর। তাতে ইন্দ্রিয় বা মন সন্তোষ বা অসন্তোষ লাভ করলেও বায়ু কখনও সন্তোষ বা অসন্তোষ লাভ করে না। বায়ু যেমন কিছুতে আসক্ত হয় না, বায়ু

যেমন বিকৃত বা সুকৃত হয় না, তেমনি বায়ুর মত অবিকৃত থাকতে হবে। বিষয়ের উৎপত্তি মায়ার তিনটি গুণ থেকে, তাই বিষয় নানা। বিষয়মাত্রই তাই তিনটি গুণবিশিষ্ট হয়। কিন্তু গুণ বা দোষ চিত্তে সংলগ্ন করবে না। স্বামীপাদ বলেছেন—বায়ু যেমন সংসক্ত হয় না, সেইরকম সংসক্ত হলে চলবে না। দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা শিক্ষা করতে হবে। বায়ু গন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয় না। আত্মার দেহের সঙ্গে যোগ আছে মনে হলেও বস্তুত যোগ নয়। জীবের অহংভাব প্রাকৃতিক। আত্মা বালক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ হয় না—জন্ম, স্থিতি (অস্তি), বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অবক্ষয় এবং বিনাশ—এই ষড়্ ভাববিকার দেহেরই হয় কিন্তু আত্মার হয় না। প্রহ্লাদজী বলেছেন, ফলানামিব বৃক্ষস্য। ফলেরই যেমন পরিণাম দেখা যায় কিন্তু বৃক্ষ অপরিবর্ত্তিত থাকে। আত্মা বৃক্ষের মত—তার কোন ভাববিকার নেই, আর দেহ হল ফলের মত। দেহেরই ভাববিকার। দেহ জন্মায় কিছুকাল থাকে, বৃদ্ধি পায়, বিপরিণাম হয়, শিশু কিশোর হয়, কিশোর যুবক হয়, যুবক প্রৌঢ় হয়, প্রৌঢ় বৃদ্ধ হয়। অপক্ষয়—দেহ ক্রমশঃ ক্ষয় পায়, ইন্দ্রিয়বর্গ শিথিল হয়, অবশেষে একদিন বিনাশ—যার নাম মৃত্যু। বৃক্ষ যেমন যথাকালে ফল দেয় আত্মারও যথাকালে কর্মোপযোগী ফল। আত্মা একরূপই থাকে। বিড়াল, কুকুর যা হয় দেহই হয়, আত্মা হয় না। এই দেহধর্ম আত্মাতে আরোপ করার নামই মোহ। বালক, যুবক প্রভৃতি দেহ বা তির্য্যগ্ প্রাণীর দেহমাত্রই ব্যভিচারধর্মী, আত্মাই একমাত্র অব্যভিচারী। আত্মা তৎ তৎ কালদ্রষ্টা। দ্রষ্টা দৃশ্য পদার্থের অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। আত্মা দ্রষ্টা, দেহ দৃশ্য। যোগী যিনি হবেন তাঁকে এটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে। ধান থেকে চাল আলাদা করা যায় কিন্তু বায়ু থেকে গন্ধকে আলাদা করা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে গন্ধ ও বায়ুকে আলাদা করতে হবে। কথায় বলা হয় বটে আমার মন কিন্তু আমি আর মন এক হয়ে গিয়েছি। মন যা বলে নির্ব্বিচারে আমি তাই করি। মনকে শাসন করে বলতে পারি না—বোঝ দেখি এটি করা উচিত কি না।

প্রাণবায়ু এবং বাহ্যবায়ু—বায়ু এই দুইরকম। বাহ্যবায়ুর কাছে শিক্ষা করতে হবে বিষয়সেবা করেও তাতে অনাসক্ত হবে। যোগী ব্যক্তি নানা ধর্মবিশিষ্ট বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করেও তার গুণ দোষ বিবেচনা করে বায়ুর মত তাতে অনাসক্ত হবেন। আত্মদর্শী যোগী এ জগতে পার্থিব দেহে প্রবেশ করে, সেই গুণকে আশ্রয় করেও সেই গুণের সঙ্গে যুক্ত হবেন না। ৩০-৩৪

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো মুনির্নভস্ত্বং বিতস্থ ভাবয়েৎ ॥ ৩৫
তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ।
ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্ ॥ ৩৬
স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্য্যস্তীর্থভূর্নৃপ।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ ॥ ৩৭
তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্ব্বভক্ষোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ॥ ৩৮
ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাং।
ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বত্র দাতৄণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্ ॥ ৩৯
স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎ স্বরূপোঽগ্নিরিবৈধসি ॥ ৪০

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

আকাশের নিকট শিক্ষা—আকাশ যেমন অন্ত বা বহি কোন বস্তুর সঙ্গেই লিপ্ত হয় না মুনিও তেমনি ব্রহ্মাত্মভাবনায় নিজেকে সব কিছু থেকে অসঙ্গ রাখবে অর্থাৎ কারও সঙ্গে লিপ্ত হবেন না। ৩৫

আকাশ যেমন বায়ু দ্বারা বিচলিত মেঘাদির সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরকম সাধুব্যক্তিও কালসৃষ্ট গুণবিশেষ তেজঃ, অপ্ এবং অন্নময় ভাবের সঙ্গে লিপ্ত হবেন না। ৩৬

জলের নিকট শিক্ষা—হে মহারাজ! জল যেমন স্বচ্ছ, স্বভাবত স্নিগ্ধ, মধুর এবং তীর্থস্থান, মুনিব্যক্তিও তার মত হয়ে দর্শন, স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা জগৎ পবিত্র করবেন। ৩৭

অগ্নির নিকট শিক্ষা—ভগবানে যুক্তাত্মা ব্যক্তি তেজস্বী, তপস্যায় দীপ্ত, অক্ষুব্ধ এবং সঞ্চয়ী না হয়ে অগ্নির মত সর্ব্বভক্ষ হয়েও কোনপ্রকার পাপে লিপ্ত হবেন না। ৩৮

মুনি ব্যক্তি অগ্নির মত কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও বা প্রকাশিত হয়ে শ্রেয়ঃ কামনায় ভূত ভবিষ্যৎ, পাপ পুণ্য দগ্ধ করে দাতা যা দেবেন তাই ভোজন করবেন। ৩৯

অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থে সেই সেই স্বরূপে প্রবিষ্ট হয় পরমেশ্বরও তেমনি নিজের মায়া দ্বারা এই সদসল্লক্ষণ জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। ৪০

এর পরে অবধূতজীর আর এক গুরু হলেন আকাশ। অদ্বয় আকাশ ঘটের বাইরেও আছে আবার ভিতরেও আছে। কিন্তু আকাশ অসঙ্গ। আকাশ কিছুর সঙ্গে লিপ্ত হয় না। বায়ু দ্বারা চালিত মেঘের সঙ্গে যেমন আকাশ সংস্পৃষ্ট হয় না তেমনি এক আত্মা ভিতরে আবার বাইরেও আছে। এই আত্মাও নিঃসঙ্গ হয়ে আছে। দেহের বাইরেও আত্মা ভিতরেও আত্মা কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ—আত্মা চিৎ বলে জড় দেহের সঙ্গে লাগে না। কারণ দুটি পরস্পর বিজাতীয়। এ জগতেও দেখা যায় বিজাতীয় দুটি বস্তু পরস্পর মেশে না। প্রকৃতির ছাপ আত্মাতে লাগে না। শিশুপাল ভগবানকে কত নিন্দা করেছেন কিন্তু ভগবান ক্রুদ্ধ হন নি কেন? আর নিন্দা করে শিশুপাল কল্যাণই বা পায় কেমন করে? প্রকৃতির রজঃ এবং তমঃ গুণ থেকে নিন্দার উৎপত্তি। গোবিন্দস্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্ব। কাজেই সে স্বরূপে রজঃ এবং তমঃ জাত নিন্দা স্পর্শ করে না। সজাতীয় ছাড়া বস্তু স্পর্শ করে না। ভক্তিই একমাত্র তাঁর সজাতীয়। জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী। তাই ভক্তিই একমাত্র ভগবানকে স্পর্শ করে। ভগবানের কাছে বাণ আসতে পারে না। শিশুপালের নিন্দা-বিষ মাখান বাক্যবাণ যত ধারাল হোক ভগবানে লাগে না। তাই প্রাকৃত তরঙ্গে গোবিন্দের কোন ক্ষোভ নেই। আত্মা সকলের বড়। বুদ্ধির বড়বাবু হল আত্মা। কিন্তু বুদ্ধিও প্রাকৃত জাতি, আত্মা চিৎ জাতি—বুদ্ধি আত্মাতে লাগে না।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ —ভাঃ ১।১১।৩৮

তাই প্রাকৃত নিন্দা হোক্ বা স্তুতি হোক্ ভগবানে কোনটিই লাগে না। এই সুখদুঃখের বাজারে গোবিন্দ ঘুরলেও সুখী বা দুঃখী গোবিন্দ নিজে হন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে জীবের পক্ষেও কি ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য ? তার উত্তরে বলছেন—'প্রায়'—জীব যদি ভগবৎ-উন্মুখ হয় তাহলে সমতা স্বীকার করেছেন শাস্ত্র। জীব যে কষ্ট পায়—এ তার অণুত্বের অপরাধ। দেহের সঙ্গে আত্মা মমতায় লেগে থাকে। নিজের জ্বালার কারণ না থাকলে জীব পোষ্যপুত্র নিয়ে তার জ্বালা ভোগ করে। ভাবে,—হে জ্বালা, তুমি রাস্তায় ঘুরছ কেন? আমার ঘরে এস। অবিদ্যা জীবকে বুঝিয়ে সুখের উপায় বলে মায়ার বিষয় (রূপাদি পঞ্চক) গছিয়ে দিল। জীব তাতেই বাঁধা পড়ল।

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্রঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥ —ভাঃ ৩।২৬।৭

শিশু যখন পথ চিনতে না পেরে হারিয়ে যায় তখন কাঁদে। কাঁদলে রক্ষা। অন্য পাঁচজন তখন দয়াপরবশ হয়ে পথের সন্ধান করে দেয়। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি যে আমরা কাঁদতেও ভুলে গিয়েছি। দুর্গতি আমাদের এইখানে। কাঁদতে পারলে সাধু গুরু বৈষ্ণব কৃপাপরবশ হয়ে পথের সন্ধান বলে দেন। কিন্তু আমরা কাঁদতেও পারি না। আমাদের দেহ ধার করা। গোবিন্দের দেহ ধার করা নয়। যে যাতে তন্ময় সে তাই হয়। আমাদের শ্রীগোবিন্দে পতিব্রতা হওয়া উচিত। কিন্তু তা না হয়ে আমরা দেহেতে পতিব্রতা হয়েছি! স্থূলতা, কৃশতা, আধি, ব্যাধি যা কিছু সব দেহের। আত্মার কোনটি নয়। আত্মার রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নেই। অন্নজলের ক্ষুধা যা কিছু সব দেহের। আত্মার নয়। মুনি বিচার করে ভাববে দেহ থেকে আমি পৃথক্। দেহ হল আত্মার আবরণ। বাজীকর কাঠির উপর ঘাগরা পরিয়ে বাজী দেখায়। আমাদের ওপরের বাজী দেখাই হল—কিন্তু নীচে যে কাঠি ছাড়া কোন বস্তু নেই তা আর দেখা হল না। দেহ থেকে অলঙ্কার যেমন খুলে রাখা হয় আবার পরা হয় তেমনি আত্মার এই দেহ-অলঙ্কার

জন্মের সময় গ্রহণ করা হয়, আবার মৃত্যুর সময় খুলে রাখা হয়। এইভাবে যোগীকে বুঝতে হবে। মনই দেহকে 'আমি' করে রেখেছে। অবধূত বলছেন, আকাশ যেমন কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না—তেমনি আকাশের কাছ থেকে নিঃসঙ্গতা শিক্ষা করতে হবে।

আকাশ অখণ্ড অদ্বয় হয়েও যেমন গৃহাকাশ এবং মহাকাশের পার্থক্য করা হয় তেমনি ব্রহ্ম অখণ্ড অদ্বয় হলেও দেহ-ঘটে জীবাত্মা, ঘট ভেঙে গেলে অর্থাৎ দেহ উপাধিব বিনাশ হলে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে। আবিদ্যক উপাধির বিনাশে জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যাবে। শ্রীধরস্বামিপাদ অদ্বৈতমতবাদের পক্ষপাতী অর্থাৎ অদ্বৈত-ঘেঁসা। তাই তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন। আত্মা অন্তঃ এবং বহিঃ উভয়স্থলেই বিদ্যমান। বেদান্তদর্শনও জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করে বললেন —তত্ত্বমসি। তৎ অর্থাৎ মায়াধীশ এবং ত্বম্ অর্থাৎ মায়াবশ। ভাগলক্ষণা জহৎস্বার্থাবৃত্তি এবং অজহৎস্বার্থাবৃত্তি দ্বারা সার্থক হল—সোঽয়ং দেবদত্ত—দুই উপাধি বাদ দিয়ে শুদ্ধ দেবদত্তপিণ্ডে লক্ষণা করা হল। তৎকালাবচ্ছিন্ন এবং এতৎকালাবচ্ছিন্ন উপাধিদ্বয় ত্যাগ করে শুদ্ধ দেবদত্তপিণ্ডে লক্ষণা। জবাস্ফটিক ন্যায়ে দেহাদির ধর্ম আত্মাতে আরোপ করা হয়েছে। জীব গোবিন্দের পদতলে ছিল। মায়াজবার স্পর্শ তার ছিল না। কিন্তু দুর্দৈবে মায়াজবার কাছে এসে পড়েছে। মায়ার রঞ্জন শুদ্ধ চৈতন্যাংশ জীবে লাগল। উপাধিগত বৈষম্য বাদ দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যাংশে লক্ষণা করে অদ্বৈতবাদী জীব ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করেন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক। ভক্তিদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন বলেন জীব গোবিন্দের অংশ। গোবিন্দের সঙ্গে অভিন্ন নয়। আর এই অংশত্ব ভগবান নিজেই স্বীকার করেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ —গীতা ১৫।৭

ভগবানের অংশ জীব। জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করে শাস্ত্র বলেছেন—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

ভগবানও জীবের পরিমাণ বলেছেন—'সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ।' সূক্ষ্মবস্তুর

মধ্যে আমি হলাম জীব। তত্ত্বস্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুতি বললেন—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

তিনি অণু হতেও অণু, মহান্ হতেও মহান্।

ভগবান কোন কিছুর দ্বারা অবচ্ছিন্ন হন না। দেহাদির দ্বারা আবদ্ধ নন। তিনি অলিপ্ত। অবধূত আকাশের কাছ থেকে অসঙ্গতা শিখেছেন। আকাশ যেমন ভিতরে আবার বাইরে। আত্মাও তাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—আত্মা বলতে এখানে পরমাত্মাকেই বুঝতে হবে। বসুদেবপিতা কৃষ্ণকে স্তুতি করে বলেছেন—

তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে। —ভাঃ ১০।৩।১৪

তুমি অপ্রবিষ্ট হলেও প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েই আছ। পরমাত্মা ভিতরে রয়েছেন আবার বাইরে অর্থাৎ গোলোকাদি ধামেও তিনি আছেন। কাঠ জ্বালালে যেমন কাঠে আগুন আছে বুঝা যায়, গাভী দোহন করলে যেমন অমৃত (দুগ্ধ) ক্ষরণ হয়, পৃথিবী কর্ষণ করলে যেমন শস্য (অন্ন) পাওয়া যায়, পৃথিবী খনন করলে যেমন জল আছে বুঝা যায়—তেমনি গোবিন্দভজন যে করতে জানে সেই তাঁকে পায়। ভগবান অস্তি—এটি অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ভজন ব্যতিরেকে ভগবান প্রত্যক্ষ হন না। দুধ বা দধি মন্থন করলে যেমন নবনীত ওঠে তেমনি ভজনমন্থনে ভগবান প্রত্যক্ষীভূত হন। আকাশের কাছে অসঙ্গতা শিখতে হবে। ভগবান বলেছেন—

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ —গীতা ৯।৫

যোগশক্তি বিরোধভঞ্জিকা। অণুর দোষ সে লিপ্ত হয়। নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ অণু, তাই বিরোধী দ্রব্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে না। জীব অণুচৈতন্য। তাই বিরোধী বস্তু মায়া সম্পর্কে তাতে লিপ্ত হয়ে যায়। নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে না। তাই জীব মায়ার অধীন হয়ে পড়ে অনায়াসে। আগুনের কণাকে পদদলিত করা যায়, জলে ভেজান যায় কিন্তু অগ্নিপুঞ্জকে জলে ভেজান যায় না বা পদ-

দলিত করা যায় না। আমরা (জীব) আগুনের কণা, অগ্নিপুঞ্জ তো নই। তাই মায়াজলে ভিজে গেলাম। মায়ার আঘাতে অধীন হয়ে পড়লাম। অণুর স্বভাব অনুগত হওয়া, জায়গামত অনুগত হতে পারলে আর ভাবনা নেই। একে তো অনাদি ভ্রান্তি আছেই, তার ওপর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন—এরা সকলেই মায়ার দূত। অণু জীব গোবিন্দের অনুগত না হয়ে মায়ার অনুগত হয়েছে—তাই তার এত দুর্গতি। মায়ার রং জীবের গায়ে লাগছে কিন্তু ভগবানের গায়ে লাগে না। ঠাকুর পরমহংসদেব বলেছেন—এ সংসারে থাকতে হবে পাঁকালমাছের মত। পাঁকালমাছ যেমন পাঁকে থাকে কিন্তু পাঁক তার গায়ে লাগে না—তেমনি সংসারে থেকেও সংসারের সুখদুঃখে অভিভূত হবে না। জাগতিক সুখ-ভোগে তৃপ্তির রং লাভের রং গায়ে লাগবে না। এটি চেষ্টা করলে হয় না। সুখে দুঃখে সমান থাকা মুখে বলা যায় বটে কিন্তু কাজে করা সোজা নয়। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদজী বলেছেন—

অসারসংসারবিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।

এ সংসারে সব খোসা। সার কিছু নেই। অসার সংসারকে যে সার বলে মনে হয় এর নাম বিবর্ত্তন। অসার, তাই পেটে কিছু পড়ে না। প্রাকৃত খাদ্য গোবিন্দের অংশ জীবের পেটে পড়ে না। সব অসার। তাই তাকে পেয়ে সন্তোষ লাভ করে না। অসারকে নিয়ে বোকারা সন্তুষ্ট হয়। তুঁষের বস্তা অসার, সার হল তণ্ডুল। প্রহ্লাদ বলছেন—সর্ব্বত্র সমতা-মুপেত—সব বস্তুকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে। প্রকৃতির তরঙ্গ সব সময় উঠছে। মাটির বাসনের দোকানে যেমন যা কিছু আছে সবই মাটি দিয়ে তৈরী। তেমনি প্রকৃতি মুগ্ধ জীব পুত্রাদি যা কিছুতে আনন্দ পায় সব বস্তুতে ত্যাজ্য বুদ্ধি করতে হবে। বিজ্ঞের দৃষ্টিতে সব ত্যাজ্য। বাজির মধ্যে যা বারুদ দেওয়া হয় সব একই বারুদ। কেবল ভাগের তারতম্যে বাজির প্রকার ভেদ। জগতের কোন বস্তুই আমার ভোগ্য নয় এই সমজ্ঞান করতে হবে। করা অবশ্য সহজ নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই

সমজ্ঞান কি করে হবে? প্রহ্লাদ বললেন—এই সমত্ববোধ আসে অচ্যুতের আরাধনা করলে। সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য। প্রাকৃত বস্তু সবই মায়ার রঞ্জকতায় রঞ্জিত। মুনি যিনি হবেন তিনি পরমাত্মাকে ব্রহ্মভাবে সর্ব্বব্যাপক এবং অসঙ্গ বোধ করবেন। পঞ্চভূত দিয়ে দেহ কাল (মহাকাল) তৈরী করেছে। এই দেহতে আত্মা সংযুক্ত হবে না। বাতাস-তাড়িত মেঘ যেমন আকাশে সংযুক্ত হয় না, তেমনি আত্মা দেহাদিতে সংযুক্ত হয় না। আকাশের কাছ থেকে এই নিঃসঙ্গতা শিক্ষা করতে হবে। এর পরে অবধূতের আর এক গুরু হলেন জল।

অবধূতজী বলছেন, জল আমার গুরু। মুনি অপাং মিত্র হবে। জলের মিত্র হবে। মিত্রের লক্ষণ হল 'একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রম্।'

অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতো সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥

যার ত্যাগ সহ্য করে থাকা যায় না তাকে বলা হয় বন্ধু, আর সর্ব্বদা অনুগত হয়ে যে চলে সে হল সুহৃৎ, একরকম ক্রিয়া যাদের তারা পরস্পর মিত্র আর এক মন প্রাণ যাদের তারা পরস্পর সখা। এখানে বলা হল জলের সঙ্গে মিত্রতা করবে অর্থাৎ জলের সমান ক্রিয়া হবে। স্বচ্ছপ্রকৃতি জল অন্য দ্রব্যের মিশ্রণে অস্বচ্ছ হয় তেমনি আমরা জীব স্বভাবতঃ স্বচ্ছ কিন্তু প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় অস্পষ্ট অস্বচ্ছ হই। প্রকৃতির বর্ষায় যেমন জল অস্বচ্ছ হয়। স্বচ্ছতা জীবের কোন্‌টি? পাপবিকর্মজাত মালিন্যই মলিনতা। পাপবিকর্মজাতমালিন্যশূন্যতার নামই স্বচ্ছতা। জলের ধর্ম হল স্নিগ্ধতা। এই জলের স্নিগ্ধ ধর্ম মুনিকে গ্রহণ করতে হবে। জনেষু অনুরাগবান্ হতে হবে। জনেষু স্নেহকৃৎ হতে হবে। হওয়া কিন্তু খুব কঠিন। কামনা থাকলেই ক্রোধ হবে। শুভ এবং অশুভ দুই কামনা থাকায় তুষ্ট এবং রুষ্ট হবে। জল যেমন নিজের পিপাসা মেটায় না, পরের পিপাসা নিবৃত্ত করে—মুনিরও তেমনি নিজের বিষয়ভোগ করলে চলবে না। যে বিষয়ভোগ ভজনের প্রতিকূল তাকে বাদ দিতে হবে। নিজের বিষয়ভোগ যদি তীব্র হয় তাহলে অপরকে ভালবাসতে পারা যায়

না। গৃহস্থ আশ্রম যে ঋষিরা সৃষ্টি করলেন তার একটি উদ্দেশ্য আছে। মানুষ নিজেকেই ভালবাসত। সংসার হওয়ায় সেই ভালবাসাটি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন, পিতামাতায় ছড়িয়ে গেল। প্রীতি এইভাবে এককেন্দ্রিক ছিল। সেই প্রীতিই ভাগ হয়ে গেল। ঋষি শেখালেন দ্বিতীয় বস্তু ভালবাসতে শেখ। এই ভালবাসাতে কোন উপদেশের অপেক্ষা নেই। এ ভালবাসা সহজাত ভালবাসা। শেষ পর্য্যন্ত ভগবানে এই ভালবাসা দিতে পারলে ভালবাসার কৃতার্থতা। ভালবাসার চরম প্রাপ্তি। ঋষিরা চাতুরী করে এই আত্মকাম কমালেন। স্ত্রীপুত্রে ভালবাসা দেওয়া হয় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় তারা সবাই পর। প্রত্যেককে ভালবাসতে গিয়ে আঘাত পেতে হয়। এ জগতে যতগুলি ভালবাসার পাত্র ততগুলি শলাকা পোঁতা আছে। সব জায়গায় দাগা পেতে হয়। এ জগতে ভালবাসা হয় না। কারণ বাসাটা ভাল নয়। শ্রুতি বলেছেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। শ্রীমদ্ভাগবত বললেন নির্মৎসরদের জন্য এই ভাগবতধর্ম। অর্থাৎ সাধুদের জন্য। নির্মৎসরাণাম্ শব্দে স্বামিপাদ প্রতিশব্দ দিয়েছেন—ভূতানুকম্পিনাম্। নির্মৎসর অর্থাৎ জীবের প্রতি দয়াশীল। পরের সম্পদ্ উন্নতি দেখে বুক জ্বালা করার নাম মাৎসর্য্য। কিন্তু যার প্রতি দয়া স্নেহ থাকে তার উন্নতিতে বুক জ্বালা করে না। এর থেকে গৃহস্থ বাদ পড়বে না। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের সপ্তম স্কন্ধে দেবর্ষিপাদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গার্হস্থ্য ধর্ম উপদেশ করেছেন। এই ধর্ম পালনের ব্যতিক্রম ঘটলেই অধর্ম। সেখানে দেবর্ষিপাদ বলেছেন দুধ পুত্র খেলে খরচ হয় তাতে আনন্দ হয়। বিড়ালে খেলেও সেই খরচই হয়। তাতে আনন্দ হওয়া উচিত। আমরা পুত্রকে দয়া করে ভাবি জীবে দয়া করছি। কিন্তু দয়ার ধারা এইটি নয়। সাধন শব্দে 'স' আছে—এটি সব শেষের 'স'। তাই সাধন বড় কঠিন। আমরা স্বার্থ ক্ষতি করে কাউকে প্রীতি করতে পারি না। তাই আমরা সাধনপথে একটুও এগুতে পারি না। উড়িষ্যার কোন দাতার পুণ্যকর্ম ধর্মনিক্তিতে ওজন হয়েছিল। কিন্তু কোন পুণ্যকর্মই ধর্ম বলে স্বীকৃত হল না। কারণ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য করলে পুণ্য

হয় না। ক্ষুধার জ্বালা বুঝে প্রাণের বিনিময়ে দানই হল প্রকৃত দান। তাই জীবকে দয়া করা বড় কঠিন। জীবকে দয়া করবার একটাই উপায়। ভগবানকে ভালবাসলে জীবে ভালবাসা হয়। যেমন পতি প্রিয় হলে পতির জন যারা তারাও প্রিয় হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—

জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

এটি আপাত বাণী। কারণ ভালবাসার কোন আশ্রয় না থাকলে জীবে প্রেম আসে না। এইজন্য ভালবাসার গোড়া চাই। গোড়া না থাকলে ভালবাসার ব্যতিক্রম আসবেই। আশ্রয়মূলে ভালবাসা হলে তাঁর জন বলে জীবে ভালবাসা হবে। তাই শাস্ত্রবাক্য হয়েছে—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" কৃষ্ণ অধিষ্ঠান না জানলে জীবে সম্মান আসবে না। কারণ—

'তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্তি অলভ্যম্।'

শ্রুতি বলেছেন—

যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।

শাখায় জল দিলেও মূলে জল না দিলে যেমন গাছ বাঁচে না।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
—ভাঃ ৪।৩১।১৪

খাদ্য যেমন হাত গ্রহণ করে কিন্তু পাঠিয়ে দেয় প্রাণকে—হাত নিজে খাদ্য খায় না—তেমনি হাতের মত নিষ্কাম হতে হবে। গোবিন্দকে ভাল না বেসে সবাইকে ভালবাসলে কাজ হবে না। গোবিন্দকে ভালবাসলে সকলকে ভালবাসার কাজ হবে। ধ্রুব হরিকে ভালবেসেই সকলকে ভালবেসেছেন। হরিকে না শুনে না বলে না ভেবে না ভালবেসে অন্য কিছু জেনে লাভ নেই। মহাজনবাণী—

হরি না জানিয়ে লাখ জানে যদি
সে জানা কেবল ছাই।

শ্রীভগবানের বাণী— মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। —গীতা ১০।৮ ভগবানেরই প্রকাশ সব জগৎ। এই বোধে জগজ্জীবের প্রতি ভালবাসা আসবে। হরিপাদপদ্মে প্রণয়বান্ হলে তবে জনেষু স্নেহকৃৎ হওয়া যাবে। জলের স্বভাব পেয়ে লোকের তাপদুঃখ নিবারণ কর। মাধুর্য্য অর্থাৎ মাধুরালাপী ও তীর্থভূঃ তীর্থস্থান হও। মাধুর্য্য না থাকলে তৃপ্তি হয় না। মধুরালাপী হতে হবে। কায়মনোবাক্যে কাউকে উদ্বেগ দেবে না।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ গীতা ১৭।১৫

অনুদ্বেগকর বাক্য, সত্যবাক্য, প্রিয় ও হিতবাক্য এবং নিয়ম করে বেদাদি শাস্ত্রপাঠকে বাচিক তপস্যা বলে।

এই আচরণ শিক্ষা করলে পাওয়া যাবে। এই কড়া চাবুক সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। এইটিই পরম কল্যাণ। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—তীর্থস্থান হও। ভক্ত্যুপদেশের দ্বারা লোকপাবন হও। ভক্ত্যুপদেশরূপ বারি দান করে জগৎ পবিত্র কর। তাঁর দর্শনে স্পর্শনে কীর্ত্তনে সকলকে পবিত্র কর। এর পরে অগ্নিগুরুর সম্বন্ধে বলা হবে।

অবধূতজী বলছেন—অগ্নি আমার এক গুরুমহারাজ। এঁর কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা করেছি বলি—শুনুন। অগ্নির মত তেজস্বী হতে হবে। এ তেজ হল জ্ঞানের আতিশয্যের তেজ। তপস্যায় দীপ্ত হতে হবে। দুর্দ্ধর্ষ শব্দের অর্থ স্বামিপাদ করেছেন অক্ষোভ্য। অগ্নি যেমন দুর্দ্ধর্ষ তেমনি দুর্দ্ধর্ষ হতে হবে। অর্থাৎ কোন কিছুতে ক্ষুব্ধ হওয়া চলবে না। অক্ষুব্ধ থাকতে হবে। উদরভাজন হতে হবে। পেটে যা ধরবে তাই নেবে—তার অর্থ হল সঞ্চয় করবে না। করভাজন অর্থাৎ করপাত্রী হতে হবে। অগ্নি যেমন সর্ব্বভুক্, সব ভোজন করে কিন্তু তার কোন মালিন্য থাকে না, ভক্তকেও ঐরকম হতে হবে। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হলে এ অবস্থা হবে। যুক্ত আত্মা যার সে হল যুক্তাত্মা অর্থাৎ সংযতচিত্ত। যুক্তাত্মা হলে এ অবস্থা হবে। সংযতচিত্ত হওয়া বড় কঠিন। ভগবানের হয় আর তাঁর ভক্তের হয়। নরনারায়ণ ঋষির উপাখ্যানে যোগীন্দ্র বলেছেন

ঋষির সংযতচিত্তের কথা। অপ্সরা, দক্ষিণপবন মলয়মারুত, বসন্ত, এমন কি স্বয়ং মদন যাঁর চিত্তবিভ্রম ঘটাতে পারেনি—নরনারায়ণঋষি তাদের অভয়দান করলেন। বললেন—

মা ভৈষ্ট ভো মদন মারুত দেববধ্বো।
গৃহ্নীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্॥ —ভাঃ ১১।৪।৮

হে মদন, মলয়মারুত, দেববধূগণ। তোমরা ভয় পেও না—আশ্রমে কিছু আতিথ্য করে যাও। এ যেন হল যারা ধন ডাকাতি করতে এসেছে তাদের বলছে সন্দেশ খেয়ে যাও। তপস্যার ধন ডাকাতি করতে এসেছেন মদন প্রভৃতি কিন্তু ঋষি বলছেন তাদের—তোমরা আমার আতিথ্য প্রহণ কর। ঈশ্বর ছাড়া করুণা আর কোথাও নেই।

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্ বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে॥
—ভাঃ ১১।৪।৯

এখানে দেখা যাচ্ছে ঋষির চিত্ত অক্ষুব্ধ। আমাদের বাণ প্রকৃতিজাত, প্রকৃতিতে বাঁধা, তাই ভগবানের গায়ে লাগে না। কিন্তু গোবিন্দ রব না শোনা পর্য্যন্ত প্রাকৃত কামাদি মদমত্ত হস্তী কিছুতে পালাবে না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বললেন—

শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পালাবে সব
সিংহরবে যেন করিগণ

কৃপা পাওয়ার আগের এবং কৃপা পাওয়ার পরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভক্তকৃপা আগে হয়, তারপর ভগবৎকৃপা। ভক্তানুরোধে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। বলিরাজ যে ভগবানের দয়া পেয়েছেন তা প্রহ্লাদের নাতি বলে। পিতামহ ভীষ্ম যে নির্য্যাণকালে ভগবানের দর্শন পেয়েছেন এর মূলেও ভক্তকৃপা ছিল। দুধের বাটি ঢাকা দেওয়া থাকলে বিড়াল বোঝে না কিন্তু পুত্র বোঝে। তেমনি শাস্ত্রবাক্যও ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে গ্রাহ্য হয়। অন্যে বিমুখ জনে গ্রহণ করতে পারে না। ভীষ্মের ব্রহ্মচারিত্বই প্রসিদ্ধি। কিন্তু ভক্তিযাজনে সিদ্ধ যে ফল পায় ভীষ্ম কেমন

করে তা পেলেন? এর মূলে ভক্তকৃপা আছে। গোবিন্দের প্রিয় পাণ্ডবগণকে ভীষ্ম ভালবাসতেন, তাই এই সিদ্ধিলাভ। শ্রীসরস্বতীপাদের ওপরও ভক্তকৃপা হয়েছে। মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি ও করুণাপূর্ণ নয়নাঘাতে সরস্বতীপাদ আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর জন না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি বার্ত্তা তিক্ত লাগে না। যার ওপর গৌর-করুণা পড়েছে তার গা বাঁধা হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয়সর্পের দংশন তার আর কিছু করতে পারে না। ইন্দ্রিয় তাড়নাতেই জীবের অত্যন্ত বিস্মৃতি ঘটে। ইন্দ্রিয়মতে চলার নামই দংশন। গৌরের করুণা যখন লাভ হবে তখন সে গৌরে এমনই মজে যায় যে বিষয়ও তাকে তেমন করে মজাতে পারে না। মহাজনদের তাই বিষয়ভোগ করলেও বিষক্রিয়া হয় না। তাই বিষয়ভোগের ফলেও তাদের বন্ধন হয় না কারণ গা বাঁধা হয়ে গিয়েছে। তাই শাস্ত্র বলছেন, দেবতাদের চরিত্র আচরণ করবে না কিন্তু তাদের উপদেশবাক্য আচরণ করবে। নরনারায়ণ ঋষি মদনের কটাক্ষে বিচলিত হননি। প্রকৃতির অতীত মায়ার অতীত যিনি, মায়া তাঁকে কিছু করতে পারে না। সংসারবাসনাই মনে তরঙ্গমালার সৃষ্টি করে। কামক্রোধাদির তরঙ্গই দংশন করে। এ দংশনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় প্রকৃতির অতীত গোবিন্দ সম্বন্ধ করা। এই গোবিন্দসম্বন্ধ করলে ইন্দ্রিয়সর্পের বিষ আর গায়ে লাগবে না। হিরণ্যকশিপুর আদেশে মা কয়াধু প্রহ্লাদকে বিষ দিয়েছিলেন। এখানে বিষ প্রতীক মাত্র। জগতের যাবতীয় প্রকৃতিসঞ্জাত বস্তুই বিষ। প্রকৃতির বস্তু যা যা আছে সবই বিষ। সবই ভুলিয়ে দেওয়ার জিনিষ। অর্থ, বিত্ত, পুত্র—যা কিছু জাগতিক সম্পদ্ সবই ভগবৎবিস্মৃতিকর। আমি তো গোবিন্দের অংশ, আমাকে তো বাঁচতে হবে। ভাগবতকুলের আদর্শ প্রহ্লাদ। গোবিন্দচরণে নিবেদন করলে প্রাকৃত সুখদুঃখের তরঙ্গ আর চঞ্চল করতে পারে না। নরনারায়ণ ঋষির পাদপদ্মে যেমন মদন সগণে প্রণত হয়েছিলেন, ভগবানের চরণে প্রণাম করে করে অচঞ্চল অক্ষোভ্য হয়েছে। গোবিন্দস্মরণে যারা যুক্তাত্মা তারা বিষয়ভোগ করলেও তাতে লিপ্ত হয়

না। ভগবান নিজে বলেছেন—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥

—গীতা ৪।১৪

ভগবান ও তাঁর দাস—দু'জনের একই স্বভাব। জীবের বন্ধন তৈরী করে আসক্তির প্রলেপ। যার আসক্তি নেই তার বন্ধনও নেই—

"দেহস্মৃতি নাই যার সংসারকূপ কাঁহা তার"

পরমবস্তু আস্বাদন না করা পর্য্যন্ত এ জগতের বিষয়ভোগ ভাল লাগে—যেমন টাটকা মধুর আস্বাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত চিটে গুড় ভাল লাগে।

অগ্নি অবধূতের গুরু। অগ্নি যেমন সর্ব্বভুক্ হয়েও মলযুক্ত হয় না তেমনি মুনিও সব ভোগ করেও মালিন্যযুক্ত হবেন না। এখন কথা হচ্ছে অগ্নির পক্ষে সম্ভব কিন্তু মুনির পক্ষে কেমন করে তা সম্ভব হবে? খাদ্য তিনপ্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কোন কোন সম্প্রদায়ের খাদ্যের বিচার নেই। তাঁদের যুক্তি হল মনে মনে করলেই হল। বাইরে খাদ্যের বিচার করে লাভ কি? তা বলা চলে না। কারণ খাদ্যের ক্রিয়া আছে, খাদ্যে দ্রব্যগুণ আছে। সাত্ত্বিক খাদ্যই খেতে হবে। সাত্ত্বিক খাদ্য খেলে সত্ত্বগুণ বাড়ে। সত্ত্বগুণ সকলকেই বাড়াতে হবে। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আছে। সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ। জগতের পালন কাজ হয় সত্ত্বগুণে। এই সত্ত্বগুণ বাড়তে বাড়তে তারপর বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ হবে। যেমন বিধি আছে বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ, দৃষ্টিপূতং পদং ন্যসেৎ, তেমনি মনঃপূতং খাদ্য (সত্ত্বগুণযুক্ত) ভগবানে নিবেদন করে খেলে বিশুদ্ধ সত্ত্বের অধিকারী হওয়া যায়। গুরুদত্ত মন্ত্রের দ্বারা নিবেদন করতে হবে। রাজসিক এবং তামসিক খাদ্য খেয়ে যে আয়ু লাভ হয় সে আয়ু বেশী হতে পারে কিন্তু সে আয়ু দিয়ে হরি আরাধনা হয় না। ভগবানের কাছে যেতে হলে সজাতীয় হয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। ভগবানের আরাধনা করতে হলেও তাঁর সজাতীয় হয়ে করতে হবে। তাই ভগবন্নিবেদিত সাত্ত্বিক আহার খেয়ে জীবনধারণ করতে হবে। এর ফলে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ

করা যায় এবং ভগবৎ সান্নিধ্যে যাওয়া যায়। সাত্ত্বিক খাদ্য খেলে চিত্ত প্রশান্ত হয়, সৌম্য চেহারা হয়। এখানে অবধূত বলছেন মুনির এই অবস্থা হওয়া চাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মুনির এ শক্তি কোথা থেকে হবে? ভগবানের সঙ্গে যুক্তাত্মা হলে সম্ভব হয়। দুর্ব্বাসা মুনি মন দশেক ক্ষীর মাখন নাড়ু ভোজন করেও যেমন দূর্ব্বারসভোজী, কোটিগোপীলম্পট কৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মচারী কারণ গোপীলাম্পট্য ভগবানের ভগবত্তাকে স্পর্শ করে না। এ সংসারে অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ করতে হবে। ঠাকুর পরমহংস-দেবের গায়ে যেমন শাল—তাতে তাঁর কোন আসক্তিই ছিল না, ভগবানও তেমনি স্বরূপসম্প্রাপ্ত। "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ"—ভগবান কারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। বিষয়ভোগে সুখভোগ হলেই আসক্তি। ভগবানে যুক্তাত্মা হলে আর আসক্তি থাকে না। সদ্য পুত্রহারা জননীর কাছে যেমন কোন বিষয়ভোগই ভাল লাগে না, তেমনি ভগবানের জন্য ব্যাকুলিত চিত্ত যার তাকেও তেমনি কোন বিষয় প্রলুব্ধ করতে পারে না। এ জগতের কোন বিষয়ভোগে আর আসক্তি থাকে না।

অগ্নির কাছে শিক্ষা—অগ্নি যেমন কখনও নিষ্প্রভ কখনও বা স্পষ্ট হয়, মুনিও তেমনি কখনও অর্থাৎ ব্যবহারিক জনের সঙ্গে জড়বৎ আচরণ করবে, অজ্ঞের মত আচরণ করবে, অবধূতের বেশ এবং ভাষার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকবে। কারণ বিষয়ীলোকের ছেঁড়কাঁথার কথায় কথা কয়ে লাভ কি? আবার যেমন অগ্নি কোথাও স্পষ্ট তেমনি মুনি কোথাও স্পষ্ট হবেন অর্থাৎ মুমুক্ষু মানে যারা সংসারকে পীড়াদায়ক বলে বুঝেছে, সংসার যে ক্লেশদায়ক এইটি বুঝতে পারছে—এটি পারাই ভাগ্যের লক্ষণ। জ্বালা যখন বোধ হয় তখনই তার হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় খোঁজে। জ্বালার বোধে তখন ভজন করে। ধর্ম আচরণ করবার সময় মনে করতে হবে মৃত্যু আমার কেশে ধরে আছে—'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা।' এইরকম মনে করলে তবে ধর্ম আচরণ ঘন হবে। এই মুহূর্ত্তে গৌরগোবিন্দ বলে আর পরে বলতে পারব কি না এই বোধকে জাগ্রত রাখতে হবে। অতি ক্ষুধার্ত্ত হলে যে যেমন তীব্র ক্ষুধার তাগাদায়

খাদ্য অন্বেষণ করে—এ খাদ্য অন্বেষণটি বড় মিষ্টি, তেমনি ভগবানও মিষ্টি চান। ক্ষুধার্ত্তের খাদ্য অন্বেষণের মত সাধকের ভগবদন্বেষণ যদি হয় তবে সেটি মিষ্টি হবে। এ জগতের অন্য কোন গুণ ও জগতে পৌঁছুবে না। একমাত্র গৌরগোবিন্দ নাম যাবে। তাই মুমুক্ষুই একমাত্র ভজন করতে পারে। মুমুক্ষু মানে যার কাছে সংসার ক্লেশদায়ক বলে বোধ হয়েছে। জাতরতি যারা তারা স্বভাববশে ভগবানকে ভালবাসে। ভাল না বেসে পারে না তাই ভালবাসে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে। আর মুমুক্ষু যে ভগবানকে ভজে সে তার নিজের প্রয়োজনে। শ্রুতি বললেন—

অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়

এই তমঃ মানে অন্ধকার নিদ্রা, অজ্ঞানতা। আত্মবিস্মৃতিই নিদ্রা আর আত্মজ্ঞান স্ফুট থাকার নাম জ্যোতি। জাতরতি মুমুক্ষু হয়। মুমুক্ষুর কাছে আত্মজ্ঞান স্পষ্ট। স্বর্গগমনেচ্ছু যাজ্ঞিকের যেমন অগ্নি উপাস্য তেমনি মুমুক্ষুর উপাস্য মুনি। অগ্নি যেমন সব খায় কিন্তু খেতে না দিলেও সে যেমন থাকে, মুনিও তেমনি দাতার ইচ্ছায় খায় কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎ পাপ খণ্ডন করে খাবে। ভগবান নিজের মায়া দিয়েই জগৎ সৃষ্টি করেছেন—

স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎ স্বরূপোঽগ্নিরিবৈধসি ॥

—ভাঃ ১১।৭।৪০

এইটি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। আত্মা=অহম্, স্বরূপের অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া দিয়ে যেটি সৎ ব্রহ্ম এবং অসৎ দুটি হতে বিলক্ষণ অর্থাৎ মায়া তাই দিয়ে দেবতা, মানুষ কৃমি কীট সব দেহ তৈরী করেছে। আত্মাকে যদি জীব বুঝত তাহলে তার আর দেহ তৈরী হত না। নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞানতার ফলে দেহ তৈরী হয়েছে। আমি যা আমার বলে যা জানি তা ভুল জানা। অহং পিতা, অহং মাতা, ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত—এ সব জানাই ভুল জানা, এ জানার কোন দামই নেই। আমি গোবিন্দের অংশ—এই জানাই আসল

জানা। অবিদ্যার ফলে প্রাকৃত দেহে আত্মা প্রবেশ করেছে। অবধূত বলছেন—অগ্নিরিব এধসি। উপাধি কাষ্ঠাদির ক্ষয়বৃদ্ধি দ্বারা অগ্নির ক্ষয়বৃদ্ধি বলা হয়—আসলে অগ্নির ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। আবার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ভক্তিপক্ষে বলছেন—কাষ্ঠে অগ্নি আছে এটি অনুমান করা যায় কিন্তু মন্থন করলে তবে কাষ্ঠ হতে অগ্নি প্রকাশ পায়, তেমনি ভগবান এই জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপক, এ জগতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ঠ হয়ে আছেন। শ্রবণকীর্ত্তন অভ্যাসরূপ মন্থনের দ্বারা সেই ভগবান প্রত্যক্ষীভূত হন। প্রদীপপ্রভার মত পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক। চিৎধর্মী আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সৎ মানে কার্য্য অর্থাৎ স্থূল আর অসৎ মানে সূক্ষ্ম অর্থাৎ কারণ। পরমপুরুষ হতে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র—পঞ্চমহাভূত ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম্। এই সব সৃষ্টি করে সৃষ্ট বস্তুতে তিনি প্রবেশ করেছেন—তৎ সৃষ্ট্বা তদনুপ্রাবিশৎ। অগ্নি স্বরূপে একপ্রকার কিন্তু উপাধিবশে তার তারতম্য হয়। ভগবানও প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুতে প্রবৃষ্ট থাকেন এবং ভৃত্যবাক্য সত্য করবার জন্য স্ফটিকস্তম্ভেও আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ট হলেও তিনি দৃষ্টিগোচর হন না। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন রূপ মন্থনের দ্বারা তিনি দৃষ্টিগোচর হন। ৩৫-৪০

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা॥ ৪১
কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চ্চিষাম্॥ ৪২
গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি।
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ॥ ৪৩
বুধ্যতে স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ।
লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ॥ ৪৪

বঙ্গানুবাদ

ষড়্‌ভাববিকার আত্মার হয় না কিন্তু দেহের এই ভাববিকার। এটি অবধূতজীর চন্দ্রের কাছ থেকে শিক্ষা। যেমন কালে চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিন্তু এ হ্রাস বা বৃদ্ধি চন্দ্রের স্বরূপত নয়, সেইরকম জন্ম থেকে আরম্ভ করে মরণ পর্য্যন্ত ভাববিকার দেহেরই, আত্মার নয়। ৪১

পুনরায় অগ্নির কাছে শিক্ষা বলছেন—স্বরূপত অগ্নির উৎপত্তি বা বিনাশ নেই কিন্তু তার শিখার হ্রাসবৃদ্ধি আছে—সেইরকম বেগবান কালের দ্বারা উৎপত্তি এবং বিনাশ প্রাণীর দেহেরই হয়, আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। ৪২

সূর্য্যের নিকট শিক্ষা—সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা জল আকর্ষণ করে কিন্তু নিজে ভোগ না করে যথাকালে সেটি প্রদান করে, সেইরকম যোগী-পুরুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণ করে যথাকালে তা প্রার্থীদের প্রদান করবেন কিন্তু নিজে তার লাভালাভে আসক্ত হবেন না। ৪৩

যেমন একক সূর্য্য জলপাত্ররূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হন সেইরকম স্বস্বরূপাবস্থিত আত্মা স্বরূপত অভিন্ন হলেও স্থূলবুদ্ধি যাদের তারা উপহিত আত্মাকে তদ্গতরূপে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করে। ৪৪

চন্দ্রমা অবধূতজীর আর এক গুরু। এ গুরু মন্ত্রদাতা নন, বুদ্ধিতে

উপাশ্রিত গুরু। কালের পথ অব্যক্ত কিন্তু অখণ্ড। পৃথিবীর ছায়া, সূর্য্যের ছায়া চন্দ্রে পড়ে। চন্দ্রের মণ্ডল ঠিক থাকে, কেবল যতটা ছায়া পড়ে ততটাই কলা। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। কলারই হ্রাসবৃদ্ধি হয় কাল অনুসারে। তেমনি অহং অর্থাৎ আত্মা চন্দ্রমণ্ডলের মত। তার হ্রাসবৃদ্ধি নেই। দেহেরই হ্রাসবৃদ্ধি আছে চন্দ্রের কলার মত। বিসর্গ অর্থাৎ জন্ম থেকে আরম্ভ করে শ্মশানান্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত সব বিকারই দেহের কিন্তু আত্মার নয়। চন্দ্রের জন্ম হয় না, কলারই জন্ম হয়। তেমনি আত্মার জন্ম হয় না, দেহেরই জন্ম হয়। যেমন নিত্য উপাস্য হলে তার বিসর্জ্জন নেই। যার আবাহন আছে তারই বিসর্জ্জন আছে। জীবাত্মা নিত্য। দেহ পাওয়ার নামই জন্ম আর দেহত্যাগের নামই মৃত্যু। এই জন্মমৃত্যু দেহেরই, আত্মার নয়।

চন্দ্র এবং সূর্য্য জগতে আলো দিয়ে রেখেছেন। ফলের পরিবর্ত্তন হলেও যেমন বৃক্ষের পরিবর্ত্তন হয় না তেমনি কলানামিব চন্দ্রস্য। কলার হ্রাসবৃদ্ধিতে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

যদি বলা যায়—কেন ভগবান 'অস্তি' এ কথা তো বলা হয়। তাহলে 'অস্তি' এটি তো ভাববিকারের মধ্যে পড়ে—জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি। তাহলে ভগবানে তো ভাববিকার দেখা যাচ্ছে। তার উত্তরে বলা যায় ভগবানের যে অস্তিত্ব তা নিত্য অস্তিত্ব—সেটি ভাববিকারের মধ্যে পড়ে না। কারণ জন্মের পরে যে অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বকে ভাববিকার বলা হয়। বেদবক্তা ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের স্তুতি প্রসঙ্গে আত্মাকে একক বলেছেন।

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ —ভাঃ ১০।১৪।২৩

ভগবান বললেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎসদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

—ভাঃ ২।৯।৩২

সৃষ্টির আদিতেও তিনি, পরেও তিনি।

দেহের বিকারের কথা আচার্য্য শঙ্কর বললেন—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম্॥

অঙ্গ জরাগ্রস্ত, মস্তকে পক্ককেশ, দন্তবিহীন বদন, হস্ত কম্পিত তার ওপর যষ্টিধারী, সোজা হয়ে চলতে পারে না—এ অবস্থাতেও আশা ত্যাগ করতে পারে না। এই আশা ত্যাগের উপায় বললেন শঙ্করাচার্য্য—

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।

অন্য কোন ক্রিয়ার দ্বারা মৃত্যু এড়ান যায় না। গোবিন্দভজন ছাড়া মৃত্যু এড়ান যায় না। যারা গৌরগোবিন্দ নাম করে তাদের মৃত্যুকে মৃত্যু বলা হয় না। কারণ গোবিন্দবিস্মৃতির নাম মৃত্যু—মৃত্যুরতান্তবিস্মৃতিঃ। ভগবানে মন ধারণই যোগনৈপুণ্য। জীবের অভিমান ত্যাগ কিছুতেই হয় না।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তং চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥

—ভাঃ ২।৩।১৭

নরকস্থ জীবও দেহ ত্যাগ করতে চায় না। যারা গোবিন্দ-কাজে আয়ু খরচ করে তাদের আয়ু হৃত হয় না। তুলে রাখা হয়। যেমন সম্পদ অপহৃত হলেও রিক্ত অবস্থা আর দান করলেও রিক্ত অবস্থা কিন্তু দুটির ফল ভিন্ন। চুরি হলে প্রাণে বিনাশের জ্বালা আর দানে ব্যয় হলে চিত্তে প্রশান্তি। ভক্ত সাধক গৌরগোবিন্দের জন্য সমস্ত আয়ু খরচ করে—

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥

—হরিভক্তিসুধোদয়

বিশ্ব গৌর-রসে মগ্ন। সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে সে রস পান করেও সাধকের আশা মেটে না তখন সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত সমগ্র আয়ু গোবিন্দে সমর্পণ করে।

ভক্তি প্রচারের চেষ্টা—এইটিই কৃপার চিহ্ন। পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজ ১০৮ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের আক্ষেপ—

জগৎ ভাসল প্রেমের বন্যায়
কেবল আমি রইলাম বাকী রে।

জন্ম হতে আরম্ভ করে শ্মশানান্ত যে সম্পদ্ তার কোন দামই নেই। প্রেম পেতে রইলাম বাকী অর্থাৎ গোবিন্দসাৎকৃত পরমায়ু পেতে ভগবানের সঙ্গে কোন না কোন যোগ রাখতে হবে। তবেই হবে গোবিন্দসাৎকৃত আয়ু। নিরন্তর বর্ত্তমান আয়ু করলে তার নিরন্ত করার জন্য কোন আক্ষেপ থাকে না। ব্যবহারিক জগতের জন্য যতই আয়ু খরচ করা যাক্ না কেন যমের খাতায় তার হিসাব উঠবে না। দাতাকেই রাজসন্মান দেওয়া হয় কিন্তু চোরে যার সর্ব্বস্ব অপহরণ করেছে তার সন্মান দেওয়া হয় না। বরং তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। গোবিন্দের জন্য কিছু আয়ু খরচ করলেও গোবিন্দ তা বহুগুণ করে ফিরিয়ে দেন। ভগবান বলেছেন—

স্বল্পামপি কৃতসেবাং বহুধাভ্যুপৈতি।

দ্রৌপদী বিপদে পড়ে আর্ত্তিভরে যে ডেকেছিলেন তার ঋণ গোবিন্দ তাদের কিঙ্করত্ব করেও শোধ করতে পারছেন না। আমরা ভোগবিলাসের জন্য যে পরিমাণ পরমায়ু ব্যয় করি তার একটু অংশ কেটে দিলেও তিনি বহু বলে মনে করেন। বিষ্ণুনিবেদিত প্রসাদ দ্বারা সব দেবতার আরাধনা হয় কিন্তু অন্য কোন প্রসাদ দ্বারা বিষ্ণু আরাধনা হবে না। ব্রহ্মা ভগবানের আরাধনার জন্য অস্পৃষ্ট আসন, অনাঘ্রাত পুষ্প দেন। আর আমরা সংসারের জন্য সমস্ত দান করে যখন দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি পিষ্ট ইক্ষুলতার মত ছিবড়ে হয়ে যায় তখন সেটি গোবিন্দসেবায় দান করি। মহাজনের অনুভূত বাক্য—যা গেছে তা গেছে, যা আছে সামাল তা। গোবিন্দসাৎকৃত পরমায়ুর অধিকারী সাধক নিত্য পরমায়ু পায় অর্থাৎ ন স পুনরাবর্ত্ততে। মায়া কোন সৎকর্ম করতে দেয় না, তাই সংসার থেকে টাকা বাঁচিয়ে গৌরগোবিন্দ বা ভক্তসেবায় আমরা লাগাতে পারি না।

মায়িক ভোগবিলাস থেকে কিছু সম্পদ কেটে দিতে হবে। মানুষের টাকাকড়ি বাড়াঘর কোনটিই সম্পদ নয়, আয়ুই একমাত্র সম্পদ্। মায়ার দুর্ব্বিপাকে জীব চুরাশী লক্ষ দেহে যে কষ্ট ভোগ করেছে মনুষ্য-জীবন পাবার পর তা উস্থুল করতে হবে। যে জিহ্বা দিয়ে বিষ্ঠা ভক্ষণ করা হয়েছে সেই জিহ্বা গৌরগোবিন্দ বলতে পারলে তবে সুদে আসলে উস্থুল হবে। আমরা কিন্তু মনুষ্যজন্ম লাভ করেও সেই আয়ু দিয়ে প্রাকৃত রসই ভোগ করছি। আমাদের অবস্থা কি রকম? হীরে বিক্রয় করে বিচুলি কেনার মত। মানুষের আয়ু যা হীরের চেয়েও মূল্যবান তাই দিয়ে নরকের যন্ত্রণা (বিচুলির মত নগণ্য) ক্রয় করি। প্রাকৃত রসরঙ্গের জন্য যে আয়ু আমরা ব্যয় করি তা যদি হরিকথায় দিতে যাই তাহলেই আমাদের ক্ষতি বিবেচনা হয়। কিন্তু আমাদের প্রাকৃত রস-ভোগের আয়ু থেকে একটু একটু করে কাটতে হবে, না হলে পরকাল হবে না। সব পরমায়ু যারা গোবিন্দে দেয় তাদের কথা আলাদা। গোবিন্দ এতই লোভী যে আমরা যদি অত্যন্ত কম পরিমাণ পরমায়ুও তাঁর জন্য ব্যয় করি তবু তিনি নেন। তিনি নিজে শ্রীমুখে বলেছেন—

'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

যারা গোবিন্দের জন্য আয়ু খরচ করে তারা তো আয়ু খরচ করে না, আয়ু তুলে রাখে। অর্থাৎ সে পরমায়ু পরে পাওয়া যায়। সেই ধামে গমন করলে আর ফিরতে হয় না।

যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। —গীতা ১৫।৬

মানুষের অঙ্গ গলিত, পলিত কেশ—তবু আশা ত্যাগ করতে পারা যায় না। জন্ম হতে আরম্ভ করে শ্মশানান্ত ক্রিয়া যা কিছু আছে এবং তার জন্য যে পরিবর্ত্তন, সব দেহের—কোনটিই আত্মার নয়। এই বোধটি পাকা করে রাখতে হবে। অব্যক্ত কাল দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেয়। জীবের জন্মমরণক্লেশ অপরিহার্য্য। এর পরে অবধূত আবার অগ্নির কথা বলবেন। সিংহাবলোকন ন্যায়ে শাস্ত্রের এরূপ ধারা আছে।

স্বরূপত যেমন অগ্নির উৎপত্তি বিনাশ নেই, উৎপত্তি এবং বিনাশ যা আছে তা যেমন শিখার, সেইরকম বলবান কাল বড় বেগবান—সেই কালের দ্বারা ভূতের অর্থাৎ প্রাণীর দেহেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়—আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ কিছু নেই।

অবধূতজীর আর এক গুরু হলেন সূর্য্য। রবির কাছে তাঁর কি শিক্ষা? সূর্য্য নিজের রশ্মির দ্বারা পৃথিবীর জলাশয়ের জল আকর্ষণ করে নেন কিন্তু সে জল নিজে ভোগ করেন না, পরে যখন সময় হয় অর্থাৎ জীবের প্রয়োজন হয় তখন সূর্য্য সেই জল দান করেন—শুধু যে-জল গ্রহণ করেছেন তাই ফিরিয়ে দেন তা নয়, বহুগুণ বেশী করে তা ফিরিয়ে দেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের রাজাদের চরিত্রবর্ণনায় তাঁদের মহিমাবর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন—রঘুবংশের রাজারা প্রজাদের কাছে কর গ্রহণ করতেন বটে কিন্তু সে অর্থ নিজেরা ভোগ করতেন না। প্রজাদের প্রয়োজনেই তা ব্যয় করতেন। শুধু যে সেই অর্থ ই তাদের ফিরিয়ে দিতেন তা নয়। অনেক গুণ বেশী করে ফিরিয়ে দিতেন। সেই রকম যোগীপুরুষ অর্থাৎ ভক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেও সেই বিষয় প্রার্থীদের দান করবেন কিন্তু নিজে তার লাভালাভে আসক্ত হবেন না। পঞ্চবিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভগবান এ জগতে সৃষ্টি করে রেখেছেন আর সেই পঞ্চবিষয় গ্রহণের জন্য মানুষকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়েছেন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। এক একটি ইন্দ্রিয়ের এক একটি বিষয়গ্রহণে সামর্থ্য। এক ইন্দ্রিয়ের অন্য ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় গ্রহণে সামর্থ্য নেই। ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করে যদি তার ভোগে অর্থাৎ ফলে আসক্ত হয় তাহলেই বন্ধন। আর লাভ ক্ষতিতে যদি আসক্ত না হয় তাহলে আর কোন বন্ধন নেই। আসক্তিই বন্ধন। তাই সূর্য্যের কাছে অবধূতজীর শিক্ষা—বিষয় ভোগ করেও তার ফলে আসক্ত হওয়া চলবে না।

আর সূর্য্য তো জগতে একক। অর্থাৎ একটি সূর্য্য ছাড়া আর দ্বিতীয় সূর্য্য নেই। কিন্তু ঐ একই সূর্য্য যখন ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হয় তখন সেই উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, সেইরকম

স্বস্বরূপে অবস্থিত আত্মা স্বরূপত অভিন্ন হলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে উপাধিতে যখন প্রতিবিম্বিত হয় তখন স্থূল বুদ্ধি যাদের অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব যারা বোঝে না তারা আত্মার এই অভিন্নতা উপলব্ধি করতে না পেরে উপাধিগত অর্থাৎ দেহমধ্যস্থ আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে করে। ৪১-৪৪

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্কাপি কেনচিৎ।
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ॥ ৪৫
কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ।
কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ॥ ৪৬
কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্মিণৌ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গসঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ॥ ৪৭
শয্যাসনাটনস্থান বার্ত্তা ক্রীড়াশনাদিকং।
মিথুনীভূয় বিশ্রব্ধৌ চেরতুর্বনরাজিষু॥ ৪৮
যং যং বাঞ্ছতি সা রাজংস্তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা।
তং তং সমানয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহ্নতী কাল আগতে।
অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী॥ ৪৯
তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ।
শক্তিভির্দুর্ব্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ॥
প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ।
শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ॥ ৫০

বঙ্গানুবাদ

কপোতের কাছে শিক্ষা—কারও সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতি অথবা আসক্তি করবে না। যদি কেউ করেন তবে তিনি এই দীন কপোতের মত সন্তাপ ভোগ করবেন। ৪৫

কোন এক কপোত অরণ্যে এক বৃক্ষের ওপর বাসা করে ভার্য্যা কপোতীর সঙ্গে কয়েক বছর সেখানে বাস করেছিল। ৪৬

কপোতকপোতী পরস্পর অত্যন্ত স্নেহসম্বন্ধ নিয়ে প্রীতিতে দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে, অঙ্গেতে অঙ্গেতে, বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে সর্ব্বদা বদ্ধ থাকত। ৪৭

তারা দুজনে নিঃশঙ্ক হয়ে অশন, শয়ন, গমন, উপবেশন, কথোপকথন এবং ক্রীড়াতে একই শরীরের মত বনরাজিতে বিচরণ করত। ৪৮

হে মহারাজ। সেই কপোতী পতির দ্বারা এতই অনুকম্পিতা ছিল যে কপোতী যখন যা যা ইচ্ছা করত সেই অজিতেন্দ্রিয় কপোত তখনই তা এনে দিত। যথাকালে কপোতী প্রথম গর্ভ ধারণ করল এবং পতির নীড়ে কতকগুলি অণ্ড প্রসব করল। ৪৯

ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সেই অণ্ড থেকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কোমলাঙ্গ শাবক উৎপন্ন হল। তখন পুত্রবৎসল কপোত কপোতী অত্যন্ত প্রীতিতে তাদের পোষণ করতে লাগল এবং তাদের কূজন শুনে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতে লাগল। ৫০

তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুখচেষ্টিতৈঃ।
প্রত্যুদগমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ ॥ ৫১
স্নেহানুবদ্ধ-হৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া।
বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ ॥
একদা জগ্মতুস্তাসামশনার্থং কুটুম্বিনৌ।
পিতরৌ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্ ॥ ৫২
দৃষ্ট্বা তান্ লুব্ধকঃ কশ্চিদ্‌যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ।
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে ॥ ৫৩
কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সমুৎসুকৌ।
গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ ॥
কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকান্ জালসম্বৃতান্।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা ॥ ৫৪
সাসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া।
স্বয়ঞ্চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পশ্যন্ত্যপস্মৃতি ॥ ৫৫

বঙ্গানুবাদ

শাবকদের পক্ষস্পর্শ, কূজিত, মুখচেষ্টা এবং কায়িক ব্যাপার অনুভব করে কপোতকপোতী অত্যন্ত আনন্দিত হতে লাগল। ৫১

বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ কপোতকপোতী দীনবুদ্ধি ও স্নেহানুবদ্ধহৃদয়ে পরস্পর সন্তানদের পালন করতে লাগল। একদিন শাবকদের আহার সংগ্রহের জন্য কপোতকপোতী বনে গিয়ে সেখানে বিচরণ করতে লাগল। ৫২

এদিকে এক ব্যাধ স্বেচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ করতে করতে কপোতের বাসার কাছে উপস্থিত হয়ে কপোতশাবকদের দেখে জাল বিস্তার করে তার মধ্যে শাবকদের আবদ্ধ করল। ৫৩

পরে সন্তানপালনে অত্যন্ত উৎসুক কপোতকপোতী আহার্য্য মুখে করে যখন বাসায় ফিরে এল তখন দেখল সন্তানগুলি জালে আবদ্ধ হয়ে

রোদন করছে। তাতে কপোতী স্নেহবশীভূত হয়ে অত্যন্ত দুঃখে ক্রন্দন করতে করতে তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। ৫৪

কপোতী ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে অত্যন্ত স্নেহে ও দীন হৃদয়ে বদ্ধ শাবকদের দেখে স্মৃতিভ্রংশ হওয়ায় সেই জালে গিয়ে বদ্ধ হল। ৫৫

কপোতঃ স্বাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽভ্যধিকান্ প্রিয়ান্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমাং দীনাং বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৫৬
অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ।
অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ ॥
অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা।
শূন্যে গৃহে মাং সংত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ ॥
সোঽহং শূন্যগৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ ॥ ৫৭
তাংস্তথৈবাবৃতাঞ্ছিগ্‌ভি র্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ।
স্বয়ঞ্চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ ॥
তং লব্ধ্বা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনং।
কপোতকান্ কপোতীঞ্চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ॥ ৫৮
এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি ॥ ৫৯
যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতং।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশ স্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ

তখন কপোত নিজের শরীরের চেয়েও প্রিয়তর সন্তানদের এবং আত্মসম ভার্য্যাকে জালে বদ্ধ দেখে অত্যন্ত দুঃখে কাতর হয়ে বিলাপ করতে লাগল। ৫৬

আমি অতি দুর্ব্বুদ্ধি ও পুণ্যহীন। আমার দুর্গতি দেখ—গৃহাশ্রমে তৃপ্ত ও কৃতার্থ না হতেই ত্রিবর্গসাধন এই গৃহাশ্রম নষ্ট হল। অনুরূপা অনুকূলা পতিদেবতা আমার গৃহিণী আমাকে শূন্যগৃহে পরিত্যাগ করে সাধুপুত্রদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করছে। আর আমি এই শূন্যগৃহে ভার্য্যা-

পুত্রবিহীন হয়ে কি জন্য বাস করব এবং দুঃখে অভিভূত হয়ে কি ভাবেই বা বেঁচে থাকব। ৫৭

কপোত এইভাবে বহু বিলাপ করে স্ত্রীপুত্রকে জালাবৃত মৃত্যুগ্রস্ত ও নিশ্চেষ্ট দেখে মোহে জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেও গিয়ে সেই জালে পতিত হল। পরে নিষ্ঠুর ব্যাধ কপোত কপোতী ও শাবকগণকে নিয়ে গৃহে গমন করল। ৫৮

যে ব্যক্তি এইরকম কুটুম্বাসক্ত অশান্ত হৃদয় ও গৃহব্রত হয়ে আসক্তি-বশত কুটুম্ব পালন করে সে কপোতের মত দুঃখ ভোগ করে। ৫৯

মুক্তিসাধনের দ্বারস্বরূপ এই মানুষজন্ম পেয়েও যে ব্যক্তি এই কপোতের মত গৃহাশ্রমে অত্যন্ত আসক্ত হয় তাকে শাস্ত্র আরূঢ়চ্যুত বলেছেন।

ইতি একাদশে সপ্তম অধ্যায়।

কপোত অবধূতের আর একজন গুরু। কোন বিষয়ে অতি স্নেহ করা উচিত নয়। করলে কপোতের মত বিনাশ পেতে হয়। অতিশয় স্নেহ করবার ফলে সৌভরি মুনি বৈষ্ণব অপরাধ করেছিলেন। শ্রীযমুনা-তীরে তপস্যায় রত ছিলেন সৌভরি মুনি। তিনি মাছদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। গরুড় এসেছেন মাছ খেতে। মাছ তো গরুড়ের খাদ্য। সৌভরি মুনির ধ্যান ভেঙ্গে যাচ্ছে। গরুড়কে বারে বারে সাবধান করছেন, মাছেদের গায়ে হাত দিও না। গরুড় যত বলছেন আপনি তপস্যা করুন। আমি কি করছি আপনার দেখবার দরকার নেই। কিন্তু সৌভরি মুনির মন মাছেদের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। তাঁর অন্যাভি-লষিত মন—সে কি অন্য কথা শুনতে পায়? সৌভরি চোখ বন্ধ করে তপস্যা আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু চোখ বুঁজলে কি হবে তাঁর মন তো চোখ বুঁজে নি। শুধু চোখ বুঁজলে চোখ বন্ধ করলে কোন কাজ হবে না। এখানে আমাদের সংসারী ব্যক্তির ছবি ফুটে উঠেছে। আমাদেরও বাইরের চোখ বন্ধ হয় বটে কিন্তু মনের চোখ বন্ধ হয় না।

গরুড় মাছ ধরায় মাছেদের প্রতি মমতাবশতঃ সৌভরি গরুড়কে অভিশাপ দিলেন। তার ফলে সৌভরির বৈষ্ণব অপরাধ ঘটল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন বৈষ্ণব-অপরাধী যে সে কখনও অপরের কল্যাণ করতে পারে না। কালীয় সর্প প্রথমে রমণক হ্রদে ছিল। কালীয় গরুড়ে বিবাদ বাধে, পরে যুদ্ধ হয়। পরে সৌভরি মুনির অভিশাপে গরুড় যমুনার এই হ্রদে আর আসেন না। তাই কালীয় এসে এই হ্রদে আশ্রয় নিলেন। বৈষ্ণব অপরাধের ফলে কল্যাণ হয় না। কারণ সৌভরি মাছেদের কল্যাণ করতে পারেন নি। উপরন্তু বৈষ্ণব অপরাধের ফলে সৌভরির সংসার হয়ে গেল। জীব যতটুকু চায় ততটুকু পায় কিন্তু সে সুখে জীব তৃপ্ত হয় না। কারণ অল্পে সুখ নেই। শ্রুতি বলেছেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। যেখানে গেলে আর ফিরতে হয় না ভগবান বলেছেন সেইটি আমার ধাম। বলা আছে—

গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাদয়ঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ॥

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হল—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এই কৃষ্ণমন্ত্রটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে। যে কোন কৃষ্ণমন্ত্রই এর দ্বারা নিতে হবে। মহৎ-কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই প্রথম শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হয়। অন্যের হয় না। ঋষিরা প্রতি যজ্ঞকর্মের প্রথমে এবং শেষে নামগ্রহণ করিয়ে নিয়েছেন। কর্ম্মভার ফেলে না দেওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি নেই। আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য যা, মায়ার অধিকারে থাকা পর্য্যন্ত সেইটিকেই প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে হয়। সংসারের কর্ত্তব্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যে ব্যক্তি হরিভজনের জন্য বেরিয়েছে তার পক্ষে অক্রিয় অজগর বৃত্তি সম্ভব। কোন্ ক্ষণে যে কার প্রতি মহৎকৃপা হবে বলা যায় না। তাই মহাজন আগে থেকে বলে রেখেছেন—

হইয়াছেন আর হবেন যত মহাপ্রভুর দাস।
সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস॥

কৃপা হলে একক্ষণে হয়। তখন আর পূর্ব্বদিন দেখে পরের দিনের

বিচার করা যায় না। গোবিন্দের কথা শুনতে শুনতে যাদের কথা তাদের কৃপা হয়। অবধূত তাঁর মনের কথা কৃপা করে যদুমহারাজকে বলেছেন। এ বাক্যে অবধূতের কৃপা আছে। যদুমহারাজ যে কৃপা অনুভব করেছেন তাও নিজ সামর্থ্যে এই বাক্যে মিশিয়েছেন। যদুমহারাজের সঙ্গে অবধূতের যে সংবাদ তা অতি প্রাচীন। এতদিনের সংবাদ কালের গতিতে যদি কিছু সরস বিরস হয়ে থাকে তাকে টাটকা করে শ্রীগোবিন্দ সেই বাক্যে আবার নিজের অনুভূতিরূপ কৃপা মিশিয়ে তত্ত্বজ্ঞ সখা উদ্ধবের পাতে পরিবেশন করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে শ্রীগোবিন্দের এ উপদেশ তত্ত্বজ্ঞশিরোমণি উদ্ধবকে দেবার কি প্রয়োজন? যদি বলা যায় উদ্ধবজীর বিবেকের জন্য। উদ্ধবজীর কি বিবেকের অভাব আছে? কথা তা নয়, কথা হচ্ছে ঝিকে মেরে বৌকে শেখান। জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্যই উদ্ধবকে এই উপদেশ দান। বিবেকের বলে প্রাকৃত সম্পর্ক ছিন্ন হবে। মায়ার দরজার চাবিকাঠি উদ্ধবকে দিয়ে গেলেন। 'বিবেক' শব্দের মানে বিচার—সদসদ্বিচার। জগতের ত্যাজ্য বস্তুতে আমাদের গ্রাহ্য বুদ্ধি হয়ে আছে। সব বন্ধন এই জন্মেই শেষ করে যেতে হবে। সূর্য্যাস্তে নিলামের মত আয়ুরবি অস্ত যেতে না যেতে সব ভজন সেরে যেতে হবে। মানুষ সব করতে পারে। মানুষ যদি ইচ্ছা করে হেঁটে বৈকুণ্ঠে যেতে পারে। এই বিবেক মানুষ কোথায় পাবে? ঋষির মারফৎ পাওয়া যাবে। মায়াবন্ধন ছিন্ন করবার পরও ভোগ করা যায়—কারণ তাতে অপরের উপকার হবে। যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব বলেছেন, কূয়ো কাটার পর ঝুড়ি কোদাল কেউ ফেলে দেয় কেউ বা যত্ন করে তুলে রাখে, অপরের উপকারে লাগবে বলে। শ্রীগোবিন্দ যে উদ্ধবের কাছে অবধূতপ্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন এটি পরমমঙ্গলজনক। এ প্রসঙ্গ শুনে মানুষ বৈরাগ্য লাভ করবে। যত প্রাণী আছে তার মধ্যে একমাত্র মানুষেরই ক্ষমতা আছে যে কোন বৃত্তিকে সংযত করবার। এ ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কারও নেই। ভগবান তো নিজে মায়ার দাসত্ব

করেন নি। কাজেই তিনি উপদেশ করতে পারেন না। তাই জীবের সমধর্মী কারুর কথা শুনতে হবে। কারণ সে মায়ার দাসত্ব করেছে কাজেই তার উপদেশ কাজে লাগবে। তাই স্বয়ং ভগবান অবধূত-সংবাদ উদ্ধবকে বললেন।

কপোত যে অবধূতজীর এক গুরু—তাঁর কাছে শিক্ষা কি। কারণ যাঁর কাছে কিছু শিক্ষা পাওয়া যায় তিনিই গুরুপদবাচ্য। কাপোতের কাছে শিক্ষা—কোনও জায়গায় কারও সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতি কিংবা আসক্তি করবে না। যদি কেউ করেন তাহলে তাকে এই বেচারা কপোতের মত দুঃখভোগ করতে হবে।

কোনও এক বনে এক কপোত একটি বৃক্ষে বাসা তৈরী করে নিজের স্ত্রী কপোতীর সঙ্গে কয়েক বছর সেখানে বাস করছিল। সেই কপোত-কপোতীর পরস্পরের পরস্পরের প্রতি এতই প্রীতি যে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারত না। অত্যন্ত আসক্তিতে তারা পরস্পর দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে, অঙ্গেতে অঙ্গেতে, বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে সর্ব্বদা বদ্ধ থাকত। তাদের ভোজন, শয়ন, গমন, উপবেশন, কথোপকথন এবং খেলাধূলা সবই একসঙ্গে হত এবং সেইভাবেই দুজনে বনে বিচরণ করত। সেই কপোতী যখন যা আবদার করত পতির কাছে কপোত স্ত্রী-বশীভূত হয়ে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে তখনই তা সংগ্রহ করে আনত। এর কিছুদিন পরে কপোতী যথাকালে প্রথম গর্ভ ধারণ করে কপোতের সামনে নিজেদের নীড়ের মধ্যে কয়েকটি ডিম্ব (অণ্ড) প্রসব করল। যথাসময়ে সেই অণ্ড কয়েকটি থেকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট কোমলাঙ্গ পক্ষযুক্ত শাবক উৎপন্ন হল। তখন সন্তান-বাৎসল্যে কপোতকপোতী অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাদের পোষণ করতে লাগল এবং তারা যখন কূজন করতে লাগল তখন তা শুনে কপোতকপোতী নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে লাগল—তাদের মনে হল যেন কি এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছি। শাবকদের স্পর্শে, কূজনে, মুখচেষ্টায় যে কোন কায়িক ব্যাপারে কপোত কপোতী পরমানন্দ লাভ করতে লাগল।

ভগবানের মায়াজাল এ সংসারে সর্ব্বত্র পাতা আছে। তাতে জীব-পাখী নিরন্তর ধরা পড়ে। সেই মায়াজালে মুগ্ধ হয়ে কপোতকপোতীও সন্তানবাৎসল্যে শাবকদের প্রতিপালন করতে লাগল। একদিন সন্তানদের আহার সংগ্রহের জন্য তারা দুজনে বনে গেল। এদিকে এক ব্যাধ বনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেই কপোতের বাসার কাছে এসে দেখতে পেল কপোত-শাবকগুলি সেই নীড়ের কাছে বেড়াচ্ছে। তখনই ব্যাধ জাল বিস্তার করে তাদের ধরে ফেলল।

এরপরে কপোতকপোতী শাবকদের জন্য খাদ্য মুখে করে আনছিল—বাসার কাছে এসেই দেখতে পেল তারা জালে আটক পড়ে কাঁদছে। তাদের সেই কান্না শুনে কপোতীও তাদের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে সেখানে এসে উপস্থিত হল। মায়ামুগ্ধ কপোতী তখন অত্যন্ত স্নেহে শাবকদের দেখে তার বুদ্ধিভ্রংশ হল, তখন ইচ্ছা করে কপোতী নিজে থেকে সেই জালে গিয়ে ধরা দিল। কপোত তার স্ত্রী ও সন্তানদের এইভাবে জালে আবদ্ধ হতে দেখে তাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করল অত্যন্ত স্নেহে। আর সেই সঙ্গে কাতর হয়ে বিলাপ করতে লাগল। কপোত অতি দীন হয়ে বলতে লাগল—'হায়! হায়! এই তো সবে গৃহসুখ আমার আরম্ভ হয়েছিল—কিন্তু সাধ মিটিয়ে ভোগ করতে না করতেই সে সুখের সংসার ভেঙ্গে গেল। সর্ব্বতোভাবে অনুকূলা আমার গৃহিণী তার পুত্রদের সঙ্গে স্বর্গে যাচ্ছে—আমাকে এইভাবে নিরাশ্রয় করে। আমি স্ত্রীপুত্রহীন এই শূন্য গৃহে কি করে বাস করব আর কিভাবেই বা প্রাণে বেঁচে থাকব? স্ত্রী ও সন্তানদের ঐভাবে মৃত্যুগ্রস্ত ও নিশ্চেষ্ট দেখে শেষ পর্য্যন্ত কপোতও মোহে জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেও গিয়ে সেই জালে পড়ল।

ব্যাধ তো এরই অপেক্ষা করছিল। সেও সুযোগ বুঝে সেই কপোত-কপোতী ও তাদের শাবকদের জালে আবদ্ধ করে পরমানন্দে অভীষ্ট লাভ করে ঘরে চলে গেল।

শ্রীঅবধূতজী যদুমহারাজের কাছে বলছেন—মহারাজ! যে ব্যক্তি

এইভাবে অত্যন্ত আসক্তিতে কুটুম্ব পোষণ করে এবং গৃহসর্ব্বস্ব হয় তার এই কপোতের মত দুঃখ ভোগ করতে হয়।

মুক্তিসাধনের দ্বার স্বরূপ এই মানুষ জন্ম অর্থাৎ এই মানুষদেহে ভগবদ্ ভজন করে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে—কিন্তু সেই মানুষদেহ পেয়েও যে ব্যক্তি এই কপোতের মত গৃহাশ্রমে অত্যন্ত আসক্ত হয় তাকে শাস্ত্র আরূঢ়চ্যুত অর্থাৎ অতিনিন্দিত জীবন বলেছেন।

ইতি শ্রীএকাদশে সপ্তম অধ্যায়ে টীকাসম্মত ব্যাখ্যা। ৪৫-৬০

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব বা।
দেহিনাং যদ্‌যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্বুধঃ॥ ১
গ্রাসন্তু মিষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ॥ ২
শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ।
যদি নোপনয়েদ্‌ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্॥ ৩
ওজঃ সহো বলযুতং বিভ্রদ্দেহমকর্মকং।
শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতৈন্দ্রিয়বানপি॥ ৪

বঙ্গানুবাদ

অষ্টম অধ্যায়ে অজগর প্রভৃতি নয়জন গুরুর কাছে অবধূত যা শিক্ষা করেন—অবধূতের সেই বাক্য যদু মহারাজের কাছে—সেটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবজীর কাছে বলছেন।

অজগরের নিকট শিক্ষা—প্রারব্ধ অবশ্যই ভোগ করতে হবে। সেজন্য চেষ্টা করে বৃথা আয়ু ব্যয় করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ (অবধূত) বললেন—মহারাজ। স্বর্গে ও নরকে দুই জায়গাতেই প্রাণীদের ইন্দ্রিয়জাত সুখ ও দুঃখ সমান। এজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে সুখও ইচ্ছা করবেন না। ১

যে দ্রব্য সহজে পাওয়া যায় তার দ্বারাই শরীর নির্ব্বাহ করবেন। হে রাজন্‌! খাদ্য মিষ্ট হোক্ আর বিরস হোক্, বেশী হোক্ আর অল্প হোক্—যদৃচ্ছাক্রমে যা উপস্থিত হবে উদাসীন হয়ে অজগরের মত তা গ্রাস করবেন। ২

আর এমন যদি হয় যদৃচ্ছাক্রমে কোন খাদ্য উপস্থিত হল না তখন কি করবেন বলি শুনুন—অনাহারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বহুদিন শয়ন করে থাকবেন, তবু যদি আহার্য কিছু না আসে তাহলে অজগরের মত দৈবগতি মনে করে ধৈর্য্যবান হবেন। ৩

যদি এমন মনে করেন সামর্থ্য থাকতে নিশ্চেষ্ট হয়ে শয়ন করে থাকব কেন তাহলে তার উত্তরে বলি—ইন্দ্রিয়বল, মনোবল ও শরীরবল পেয়েও কর্মশূন্য হয়ে নিদ্রাশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হয়ে অজগরের মত শয়ন করে থাকবেন এবং ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য থাকলেও কোন চেষ্টা করবেন না। ৪

অষ্টম অধ্যায়ে অজগর প্রভৃতি নয়জন গুরুর নিকট অবধূত যা শিক্ষা করেন অবধূতের বাক্যের দ্বারা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পরম প্রিয় উদ্ধব সখার কাছে তা ব্যক্ত করেন।

অজগর হলেন অবধূতজীর এক গুরু। জীবের প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যই হবে। সেজন্য চেষ্টা করে আয়ু বৃথা ব্যয় করা উচিত নয়। কাজেই অজগরের কাছে শিক্ষা—অবধূত বলেছেন যদু মহারাজকে—হে রাজন্, স্বর্গে ও নরকে দুই জায়গায়ই প্রাণীদের ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ সমান। এজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে সুখও ইচ্ছা করবেন না। সংস্পর্শজ ভোগমাত্রই দুঃখপ্রদ। ভগবান গীতায় বললেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

—গীতা ৫।২২

আমরা এই সংস্পর্শজ ভোগকেই পরম রমণীয় বলে আঁকড়ে ধরি। কাজেই আমরা অবুধ অর্থাৎ মূর্খ। জগতের সুখ স্বপ্রকাশ নয়। স্বর্গে এবং নরকেও এই ঐন্দ্রিয়ক সুখ আছে। কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এই সুখকে ইচ্ছা করে না। ইন্দ্রিয়জাত সুখ সর্ব্বত্র সমান। শ্রীধরস্বামিপাদ মন্তব্য করেছেন প্রারব্ধ ভোগ তো অবশ্যই করতে হবে। তাই জীবের দুঃখ তাড়াবার জন্য এবং সুখভোগের জন্য চেষ্টা বৃথা। দেবর্ষিপাদ নারদ বলেছেন—

তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং।
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

—ভাঃ ১।৫।১৮

দুঃখ যেমন জীবনে বিনা নিমন্ত্রণে আসে সুখও তেমনি কপালে পাওনা থাকলে ঠিক আসবেই? তার জন্য চেষ্টা করতে হবে না। কিন্তু উর্দ্ধলোক ও অধঃলোক ভ্রমণ করেও যে বস্তুটি অন্য কোথাও গেলে পাওয়া যায় না তার জন্যই চেষ্টা করতে হবে। কোবিদ অর্থাৎ বুদ্ধিমান যে হবে বিদ্বান যে হবে সে এই বস্তুটির জন্যই চেষ্টা করবে। শ্রীহরিভক্তি অন্য কোথাও মেলে না। তার জন্যই চেষ্টা করতে হবে। অন্যান্য জীবনে হরিভক্তি ছাড়া আমরা আর সব পেয়েছি। অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

চুরাশী লক্ষ দেহে জীব বিষয় ভোগ করে এসেছে—কাজেই মনুষ্যদেহেও যদি বিষয়ভোগই করে তাহলে পিষ্টপেষণই করা হবে। মানুষের যে এই সুন্দর দেহ পাওয়া গেছে সবচেয়ে সুন্দর বস্তু শ্রীগোবিন্দকে পাওয়ার জন্য। এখন প্রশ্ন হতে পারে জাগতিক সুখভোগ অপেক্ষা যে হরিভক্তি বড় তার প্রমাণ কি? যদি বলা যায় এ জগতের সুখই বড় তা যুক্তিতে দাঁড়াবে না। জগতের সব সুখই ছোট, তার পেছনে ছুটেও কোন শাশ্বত ফল লাভ হয় না—এ অধ্রবা বস্তু। কাজেই এ বস্তুর পেছনে ছুটে লাভ নেই। কোবিদ অর্থাৎ বিদ্বজ্জন এ কথা বুঝেছে। তাই দেবর্ষিপাদ বলছেন—দৃষ্ট সুখ পাবার জন্য চেষ্টার দরকার নেই। দুঃখ যেমন বিনা আহ্বানে আসে পাওনা সুখও তেমনি বিনা চেষ্টাতেই আসবে। সুখের নেশায় আমরা সুখ পাবার জন্য চেষ্টা করি। সেই সময়টি হরিভজনে ব্যয় করতে হবে। ঋষিবাক্যে নিশ্চিন্ত থাকতে হবে। ঋষিরা লোক ঠকাতে আসেন নি। চেষ্টা করে সুখ হয় না। তবে যে বাক্য আছে—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

এ সবই ব্যবহারিক শাস্ত্রোক্ত বাণী। বস্তুত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তাতে নয়।

কারণ জীব অলস হয়ে যাবে এইজন্য তাদের উদ্যোগী রাখবার জন্য এইসকল বাক্য। শুক্রাচার্য্য যেমন বললেন বলিরাজকে—দান দেওয়া হবে না মহারাজ। তদ্দানং ন প্রশংসন্তি। যে দানে জীবিকা নষ্ট হয় এমন দানের প্রশংসা নেই। বলিরাজ এ গুরুবাক্যও লঙ্ঘন করেছেন পারমার্থিক শাস্ত্রের দিকে তাকিয়ে। কারণ পারমার্থিক শাস্ত্র ও ব্যবহারিক শাস্ত্র দুটি আলাদা। ব্রাহ্মণকে দান দেবেন বলে কথা দিয়েছেন তাই ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করবেন না। বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা আছে তাই বিষয় পাবার জন্য জীবের উদ্যম। এই উদ্যম ত্যাগ করাই কঠিন। দুঃখ অবাঞ্ছিত হলেও আসবে নিশ্চয়ই। কুন্তীমাই একমাত্র বিপদ প্রার্থনা করেছিলেন। সুখ যদি পাওনা থাকে তাড়ালেও আসবে। বুদ্ধিমান তাই সুখের জন্য চেষ্টা করবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে চেষ্টা যদি না করে তাহলে শরীর নির্ব্বাহ করবে কেমন করে? অবধূত বললেন যথালাভে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সত্যি করে হরি ভজতে চাইলে অবধূতের এ উপদেশ কাজে লাগবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা মিলবে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যা মিলবে মানে দৈবনির্দ্দেশে বা প্রারব্ধবশে যা মিলবে। অজগর যেমন নিজে চেষ্টা করে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। তার নিঃশ্বাসের এলাকায় প্রাণী পড়ে গেলে তাকে টেনে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। আমরাও তেমনি মহাকালের টানে বিষয় আকাঙ্ক্ষার টানে মৃত্যুর দরজায় গিয়ে পড়েছি। শিশুর মত একান্ত শরণাগত হয়ে কাঁদতে পারলে তবে মহামায়ার হাত হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। বিষয়ভোগের জন্য বেশী চেষ্টা করলেই বেশী কাদা মাখতে হবে। দৈবগতিতে যে খাদ্য পাওয়া যাবে তাতেই সন্তুষ্ট ও অক্রিয় থাকতে হবে। এরই নাম মুনির অজগর বৃত্তি। স্বামিপাদ যদুমহারাজের পক্ষে প্রশ্ন করেছেন—অবধূত তার উত্তরে বলছেন।

অবধূত বলছেন অজগরের কাছে মুনির এইটিই শিক্ষণীয় যে আহারের জন্য চেষ্টার দরকার নেই। যতকিছু চেষ্টা হরিভক্তির জন্যই করতে হবে। শরীরের ব্যাধি ও মনের আধি—এর জন্য মানুষ যতই চেষ্টা করুক কিন্তু তাতে প্রতিকার হয় না। প্রতিকার করলেও দুঃখ ছাড়ে না। এ

প্রতিকার মাথার ভার কাঁধে নামানোর মত। মাথা হাল্কা হল বটে কিন্তু কাঁধে ভার পড়ল। দুঃখ দূর হবে যদি ভারটি (বোঝাটি) একেবারে ফেলে দিতে পারা যায়। প্রশ্ন হতে পারে তাহলে প্রতিকারের চেষ্টা আমরা করি কেন? সত্য কথা জীব শুনতে চায় না। প্রকৃত দুঃখ এবং প্রকৃত সুখ কি জীব তা শুনতে চায় না। ভগবৎ উন্মুখতাই সুখ এবং ভগবদ্বিমুখতাই দুঃখ। কিন্তু জীব তা শুনতে চায় না। রাজার বাগানের পাতার রসেই রাজার শূলব্যাধি ভাল হবে কিন্তু অনুষ্ঠানপ্রিয় জীব, তাই বিরাট ফর্দ্দ না হলে তার মন ভরে না। আরোগ্যের জন্য ঋষিরা মিথ্যা বলতে পারেন তাতে দোষ হবে না। জীবনদাতা হলেন ঋষি। তিনি যা করতে বলবেন তাই করা উচিত। জীব হল রাজা—তার তাপ নিবারণের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন দরকার। এ বায়ু পরিবর্ত্তন কিসের ও কোথায়? মায়া জীবকে দণ্ড দিচ্ছে—

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ —চৈতন্যচরিতামৃত

গীতাবাক্যেও ভগবান বললেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ
গতাগতং কামকামা লভন্তে। —গীতা ৯।২১

ঋষিরা ঢেঁড়া ধরলেন। যাগযজ্ঞের ফর্দ্দ দিলেন। ভগবানের পাদপদ্মে বিমুখতাই জীবের এই দুঃখের কারণ। ঈশবিমুখতাই এই দুঃখের কারণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥

এ রোগের চিকিৎসা হল কৃষ্ণগুণনামলীলা শ্রবণ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

মানুষের দেহ বাগানে জিহ্বা-লতায় গৌরগোবিন্দনামরস নিরন্তর পান করতে হবে।

আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।

“ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।” এইটিই হল পাতার রস। যাগযজ্ঞ চিকিৎসা নয়। গোবিন্দনামগ্রহণই একমাত্র চিকিৎসা। গোবিন্দনামই রস। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বললেন—

গোবিন্দ বিষয় রস সঙ্গ কর তার দাস

নিদান ধরে চিকিৎসা করতে হবে। নিদান মানে আদিকারণ। শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তনে শ্রীল রামদাস বাবাজীমহারাজ গেয়েছেন—

গৌরাঙ্গ নিদানী আমার হরি নামৌষধি বিধান কইলা

কলিজীবের নিদান দশা দেখে—হরি নামৌষধি বিধান কইলেন। যখন অন্য কোন প্রতিকার কাজ করবে না—অন্য যে কোন প্রতিকারই করা যাক না কেন তাতে রোগের গায়ে হাত পড়বে না। স্তরে স্তরে উন্নত করতে হবে। শ্রীহরির আরাধনার ফলে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন করে দৃষ্ট শ্রুত কোন সঙ্গ লোভ আর থাকবে না। যেমন রাজর্ষি ভরতের ছিল না। ভরতচরিত্র জীবকে সাবধান করবার জন্য বলা হয়েছে। এত প্রভাবেও যদি ভরতের স্খলন হয় তাহলে সাধারণ জীবের পক্ষে আর কি কথা। আমাদের শিক্ষার জন্যই ভরত হরিণ জন্ম স্বীকার করেছেন। জীবনকালে জীবের স্বাতন্ত্র্য আছে। জীব হরি উচ্চারণ করতে পারছে কিন্তু মুমূর্ষুকালে তো কোন স্বাতন্ত্র্য থাকবে না। এখন থেকে অভ্যাস করতে হবে। এক থালা অন্ন ইঁদুরে একটি একটি করে নিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ থালা খালি হয়ে যায়—তাই প্রথম অন্নের দানাটি যখন নেয় তখন থেকেই সাবধান হতে হবে। তখন উদাসীন থাকলে ক্রমশ থালা খালি হয়ে গেলে আর কোন উপায় থাকবে না। তেমনি জীবনের একটি মুহূর্ত্তকেও বৃথা ব্যয় করতে দেওয়া উচিত নয়। একটি একটি মুহূর্ত্ত কাল-ইঁদুরের গ্রাসে পড়লে কখন যে পরমায়ু-থালা খালি হয়ে যাবে

বুঝতে পারা যাবে না। পরকাল তো আছেই। সারাজীবন অভ্যাস করলে অভ্যাসই সংস্কার তৈরী করবে। তখন মরণযন্ত্রণা ঠেলে গৌর-গোবিন্দ বলা যাবে। অভ্যাস করলে যে হরিস্মৃতি থাকে তার দৃষ্টান্ত রাজর্ষি ভরত। হরিণজন্মেও যে হরিস্মৃতি নষ্ট হয় না তার দৃষ্টান্ত ভরত। ভগবান তাঁর নিজ জন দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দেন। শাস্ত্র বলেছেন ভক্তিবাধিনী যে দয়া সে দয়া ত্যাগ করবে।

দয়া ধরম কি মূল হ্যয়
নরক মূল অভিমান।

গোবিন্দসেবার ওপরে কোন কাজ নেই। জীবে দয়া করতে যে বলা হয়েছে সেটি আপাততঃ। সৌভরি ঋষির উক্তি গোবিন্দ সেবা এবং গোবিন্দ বলা অভ্যাস হলে আর কিছু করা চলবে না। অন্যে যা করে করুক। ভরত বলছেন—

যা মাং স্মৃতিঃ কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা মৃগদেহেঽপি নো জহাতি।

কৃষ্ণঅর্চ্চনা হরিণজন্মে ভরতকে ছেড়ে গেল বটে কিন্তু কৃষ্ণার্চ্চনজাত স্মৃতি কিন্তু আমাকে ছাড়ে নি। জনসঙ্গাদ্ বিশঙ্কমান হয়েছিলেন ভরত।

তস্মান্নরোঽসঙ্গসুসঙ্গজাতজ্ঞানাসিনেহৈব বিবৃক্নমোহঃ।
হরিং তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং লব্ধস্মৃতির্যাত্যতি পারমধ্বনঃ॥
—ভাঃ ৫।১২।১৬

অরূপ বলতে যেমন প্রাকৃতরূপ বর্জন বুঝাচ্ছে তেমনি অসঙ্গ বলতে বুঝতে হবে সঙ্গহীন নয়, প্রাকৃতসঙ্গরহিত অবস্থা। প্রাকৃত জগতে নামীর সঙ্গে নামের কোন সম্পর্ক নেই।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

এ জগৎ থেকে একটি ছুঁচও ওজগতে নিয়ে যাওয়া চলবে না। কিন্তু জীবের দুর্ব্বার মোহ। কিছুতেই বুঝতে চায় না—

শুনিলে না শোনে কান জানিলে না জানে প্রাণ
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়।

নিরন্তর পিঠে চাবুক পড়লে তবে যদি চৈতন্য হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা যদি না বাড়ে তাহলেও যথেষ্ট। সংসারপথের পরপারে থাকেন হরি। এ সাগর হল মনের সাগর। ঘুম ভাঙবার পর নিশা কেটে যাবে, তখন জাগ্রত অবস্থা এসে যাবে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
—গীতা ২।৬৯

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই বোধ জাগাটাই জাগ্রত অবস্থা। বৈষ্ণব অপরাধে সৌভরি মুনির সংসার হয়েছিল এবং সে সংসারের মোহও কিছুতেই কাটতে চায় না। মহারাজ যযাতির বাক্য—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" ভোগের আকাঙ্ক্ষা কিছুতে যায় না—বরং উত্তরোত্তর বাড়ে।

যা ললাটে আছে তাই হবে। বিধিলিপি সাধারণতঃ খণ্ডন করতে পারা যায় না। যখন যে অবস্থা আসে বরণ করে নিতে হবে। তাতে ভগবান সন্তুষ্ট থাকেন। হাসিমুখে বরণ করলেই লাভ। তাতে কর্মফল কেটে যায়। কপালে যা থাকবে তা ঘটবেই। দেবর্ষিপাদ বলেছেন—

তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা।
—ভাঃ ১।৫।১৮

মহৎকৃপায় কি না হয়? মহৎকৃপায় বিধিলিপিও খণ্ডন হয়ে যায়। খাদ্য যদি না জোটে অজগর কিন্তু চেষ্টা করে না। অক্রিয় হয়েই পড়ে থাকে। দৈবকে নির্ভর করে পড়ে থাকে। স্বকর্মফলভুক্ পুমান্। যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসীও তেমনি খাদ্যের জন্য চেষ্টা করবে না। দৈবযোগে প্রাপক যা তাই পাবে। পূর্ব্বজন্ম কৃতকর্মই দৈব। এখন প্রশ্ন হতে পারে অজগরের না হয় সামর্থ্য নেই তাই দিষ্টভুক্। যদুমহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন—কিন্তু যার সামর্থ্য আছে সেও কি নিশ্চেষ্ট থাকবে? তার উত্তরে অবধূত বললেন, ওঁম্। হ্যাঁ, নিশ্চেষ্টই থাকবে। ওজঃ সহ বল থাকলেও শয়ান অর্থাৎ বীতনিদ্র থাকবে। শয়ান অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় প্রাকৃত কর্ম করবে

না। নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যবহারে নিষ্ক্রিয়। বীতনিদ্র অর্থাৎ স্বার্থে দত্তদৃষ্টি। যোগীর স্বার্থে দত্তদৃষ্টি। যোগ = সম্বন্ধ। ভগবানের সঙ্গে যার সম্বন্ধ আছে তাকেই যোগী বলা হয়েছে। জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত—যে যেমন যোগী, ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও যদি চেষ্টা না করে নিষ্ক্রিয় থাকা যায়, এর নামই সাধন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ গীতাবাক্য উদ্ধৃতি করেছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

—গীতা ২।৬৯

মুনিরা পরমার্থ বিষয়ে জেগে আছে আর ব্যবহারিক জগতে ঘুমিয়ে আছে। পশ্যতো মুনেঃ অর্থাৎ আত্মদর্শী মুনিঃ। স্বার্থ বলতে নিজের প্রয়োজন। ভগবচ্চিন্তনাদিতে সাবধান হবে। প্রাকৃত রস এসে যেন ভগবৎ অনুশীলন ছিন্ন করে না দেয়। ভগবৎ অনুশীলন না করাই ঘুম, এর নামই মৃত্যু। দেহব্যাপার নির্ব্বাহে যেন পরমায়ু না যায়। দেহ-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্ত পরমায়ুই হরিভজনে লাগাতে হবে। ইন্দ্রিয়-বান্ পদ বলাতে দর্শনাদি বৃত্তিও নিষিদ্ধ হল। এইরূপ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারলে তবে অজগরী বৃত্তি হল। ১-৪

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্ব্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারোহ্যক্ষোভ্যস্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ ॥ ৫
সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৭
যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূর্খঃ।
প্রলোভিতাত্মাহ্যুপভোগ বুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ

অবধূতজী বলছেন—'মহারাজ। সমুদ্রের নিকট যা শিক্ষা করেছি শুনুন। মুনিজন বাইরে প্রসন্নভাব কিন্তু ভিতরে গম্ভীরভাব হবেন। তাঁর মনের অভিপ্রায় কেউ বুঝতে পারবে না। তিনি অনতিক্রমণীয়. অপরিচ্ছেন্য ও অক্ষোভ্যরূপে প্রশান্ত (নিশ্চলোদক) সমুদ্রেব মত সব ভাবকে ধারণ করবেন। ৫

সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে নদীসকলের সংযোগে বৃদ্ধি পায় না বা গ্রীষ্মকালে তার অভাবে শুষ্কও হয় না সেইরকম নারায়ণপরায়ণ মুনি সমৃদ্ধির দ্বারা সমৃদ্ধ বা সমৃদ্ধি হীনতায় হীন হন না। ৬

পতঙ্গের কাছে শিক্ষা—রূপবিষয়ে বিমুগ্ধ হলে বিনাশ পেতে হবে। পতঙ্গ যেমন অগ্নির রূপে মুগ্ধ হয়ে আকৃষ্ট হয়ে তাতে পড়ে প্রাণ হারায় সেইরূপ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপ স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে এবং তার ভাবে মুগ্ধ হয়ে ঘোরতর নরকে পতিত হয়। ৭

মূর্খ ব্যক্তিরা মায়ার তৈরী নারী, স্বর্ণালঙ্কার, বসনাদি দ্রব্যে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলুব্ধ হয় এবং তাতেই তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তখন পতঙ্গের মত তারা নাশ পায়। ৮

সমুদ্র হলেন অবধূতের আর একজন গুরু। ব্রহ্মচারীকে সমুদ্রের মত

প্রসন্ন এবং গম্ভীর হতে হবে। শ্রীজীবপাদ টীকায় বলেছেন—চিত্ত প্রশান্ত হবে। কিন্তু উপাস্যকে গোপ্য রাখবে সমুদ্র যেমন দুর্বিবগাহ্য এইরকম মুনির হৃদর হবে। অর্থাৎ তার অভিপ্রায় যেন কেউ বুঝতে না পারে। গভীর হ্রদের মত মুনির হৃদয় গভীর হবে। গভীর হ্রদ যেমন না জেনে নামা চলে না তেমনি মুনির অন্তরের ভাবও অলক্ষ্য দুরত্যয় অর্থাৎ অভিভবিতুমশক্যঃ। তেজস্বিত্বাৎ। অতি তেজস্বী বলে সাগর পার হওয়া যায় না। এখন কথা হতে পারে সমুদ্র না হয় জলময় বলে আয়ত্তে আনা চলে না মুনির হৃদয় তা কেমন করে হবে? চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন,—তেজস্বিতা হেতু দুরতিক্রম। পারের কথার অনন্ততা নিতে হবে। সবটা বুঝে নেওয়াই হল অতিক্রম করা। অনন্তপার অর্থাৎ অপরিচ্ছেদ্যস্বরূপা। আর স্বরূপাবির্ভাব মানে আত্মবোধ। ভক্ত হলে কৃষ্ণদাস অভিমান হবে। লঙ্ঘনশক্তির অধীনে হলে পার হওয়া যায়। অনূদ্গীর্ণ স্বতত্ত্ব সেবা করা হয়, লঙ্ঘন করা হয় না। মুনি কষ্টে পড়লেও তত্ত্ব খুলবে না। মুনির স্বভাব হবে অক্ষোভ্য অর্থাৎ তাকে নড়ান যাবে না। এর পক্ষে হেতু কি? রাগাদ্যভাবাৎ। আসক্তিশূন্যতাই তার অক্ষোভ হওয়ার হেতু। অর্থাৎ বিষয়লালসাভাবাৎ। আসক্তি না থাকলে ক্ষোভ থাকে না। প্রাকৃত রসে যার আসক্তি নেই তার ক্ষোভও নেই। আসক্তি কার নেই? উত্তম ভক্তের কোন বিষয়ে আসক্তি নেই। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা অবহেলা করে মনের কথা শুনি। তাঁর করুণার প্রস্রবণ সর্ব্বদা বইছে। কিন্তু আমার দুর্দৈব তাঁর করুণা স্পর্শ পাচ্ছে না। লৌহকে তো চুম্বক আকর্ষণ করে। চুম্বক দূরে থাকলেও লৌহ চঞ্চল হয়। আমার চিত্ত লৌহ সদৃশ। আর তাঁর করুণা হল চুম্বক। ভগবানের গুণাবলী চুম্বক। কিন্তু চিত্ত লৌহকে আকর্ষণ করে না কেন? লৌহ যদি গোবরচাপা থাকে তাহলে চুম্বক তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। প্রাকৃত রসতৃষ্ণা হল গোবর। তার দ্বারা আমাদের চিত্ত চাপা পড়েছে। তাই ভগবানের গুণাবলীরূপ চুম্বকও তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। যে সাধন করবে পায়ে ধরা তার

স্বভাব হবে। গৌরগোবিন্দে আসক্তি লাগাতে হবে আর প্রাকৃত রস ত্যাগ করতে হবে। আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা হয় নি বলে খেদ আছে অথচ মন তো রাজী নয়। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যেমন লোকের পায়ে পড়ে তাদের করুণা ভিক্ষা করে তেমনি আমাদের মতিতনয়াকে পাত্রস্থ করবার জন্য সাধুগুরুবৈষ্ণবের পায়ে পড়তে হবে। ভগবানে আসক্তি লাগালে তবে মন স্থির হবে। মহাজনবাণী—

হৃষীকেশে হৃষীকানি যস্য স্থৈর্য্যং গতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥

হৃষীকেশ শ্রীগোবিন্দ যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতারও দেবতা—তাঁতে সকল ইন্দ্রিয়কে সমর্পণ করলে তবেই এই জীবচঞ্চল সংসারে স্থিরতা লাভ করা সম্ভব, নতুবা নয়। আমাদের মন বড় চঞ্চল। স্থৈর্য্যলাভ করবার জন্য প্রাকৃত রসভোগ কমাতে হবে। গৌরগোবিন্দ-ভোগের ক্ষুধা (অনুরাগ) মন্দা হলে চলবে না। অনুরাগ মন্দ হলে হবে না। মনকে স্থিরতাপ্রাপ্ত করাতে হলে এতটু ছুঁয়ে এলে কাজ হবে না। গোবিন্দরূপাদিপঞ্চকে যার ইন্দ্রিয় বসে গেছে সে-ই এ জগতে স্থির হতে পারে। অন্যে পারে না। মনের সুখের বা দুঃখের যে কোন ব্যবস্থাই ক্ষোভজনক। যদি প্রশ্ন হয় আসক্তি না থাকলে দেহ নির্ব্বাহ চলে কেমন করে? তা চলে। যেমন রোগ হলে ঔষধ ও পথ্য রোগীর কাছে রুচিকর তো নয়ই বরং অরুচির বস্তু এবং অপথ্যই রুচিকর হয়। ঔষধ ও পথ্যের প্রতি রোগীর কোন আসক্তি থাকে না তেমনি অনাসক্ত হয়ে ঔষধের মত বিষয়ভোগ করলে তাতে দোষ হবে না। মন যদি গোবিন্দে লাগে তাহলই কাজ হয়ে গেল। চিত্ত প্রিয়বস্তু ভালবাসে, তাকে প্রিয়বস্তু দিতে হবে। চিত্তকে রূপাদি পঞ্চক দিতে হবে। চিত্ত পরীক্ষা করবে। বরণীয় হলে তবে নেবে। কুলশীল উৎকৃষ্ট হলে মন বরণ করবে. এই বুঝতে কিছু সময় লাগে। তাই রুচিতে দেরী হয়ে যায়। মন বুঝতে পারলেই কাজ হয়ে যায়। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি হলেন চিন্ময়ী আর মায়া বহিরঙ্গা শক্তি হলেন গুণময়ী। চিন্ময়ীশক্তির

আস্বাদ বেশী। এ জগতের সব বস্তুই মায়ারচিত। ভগবানের রূপ লীলা চিন্ময়ী তাই তার আস্বাদ বেশী। মন কিন্তু শুধু কথা শুনলে ভুলবে না, উদাহরণ দেখতে চাইবে। বিষয় ছেড়ে গোবিন্দপাদপদ্ম কে ভজেছে? উদাহরণ আছে—রাজর্ষি ভরত, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি।

লীলারসামোদীর কাছে মুক্তিসুখও তুচ্ছ হয়ে যায়। এ সব মনকে ভাল করে বুঝাতে হবে। মনকে বুঝান পর্য্যন্তই যত কষ্ট স্বীকার। ভক্তচরিত্রই উদাহরণস্থল। তাই ভক্তমালগ্রন্থ অতি উপাদেয়। মন বিশ্বাস করলেই সব কাজ হয়ে যাবে। মনকে বুঝানোর জন্যই আচার্য্যের এইসব বাণী। প্রাকৃত রস অপেক্ষা লীলামাধুর্য্যের আস্বাদ যে বেশী এইটিই মনকে বুঝাতে হবে। সাধককে শিক্ষকের কাজ করতে হবে। সব সময় চাবুক ধরে মনকে দিয়ে ভক্তি অনুশীলন করিয়ে নিতে হবে। তখন এই মনই অনুরাগী হবে। বিদ্যারস অনুভব না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন বালক বিদ্যালয়ে যেতে চায় না তেমনি ভগবদনুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধককে লেগে থাকতে হবে। সাধকের মন যখন ভক্তিরসের আস্বাদ পেয়ে যাবে তখন আর তাকে কেউ নড়াতে পারবে না। তখন তার চিত্ত অক্ষোভ্য হবে। বর্ষাকালের জলে তরঙ্গিণী নদী উচ্ছলিত হলেও সাগর কিন্তু বৃদ্ধি পায় না। গ্রীষ্মকালে নদী শুষ্ক হয় কিন্তু সাগর শুকায় না। সাগরের যেমন জলের হ্রাসবৃদ্ধি নেই তেমনি মুনিকেও সমৃদ্ধিতে আনন্দিত এবং দুঃখে দুঃখিত হলে চলবে না। সাগরের মত অক্ষোভ্য থাকতে হবে। গীতাবাক্যে বলা আছে—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ —গীতা ২।৫৬

যিনি দুঃখে পড়লেও উদ্বিগ্ন হন না এবং সুখেতেও উল্লসিত হন না—অবশ্য এ সুখ বলতে প্রাকৃত সুখকেই বুঝাচ্ছে, আর যাঁর চিত্ত হতে রাগ (আসক্তি) ভয় (দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ) ও ক্রোধ (কামনার পরিপূরণ না হলেই ক্রোধ) দূর হয়েছে তিনিই স্থিতধী, তিনিই মুনি।

সাগরের কাছ থেকে অক্ষোভ্য গুণটি অবধূত গ্রহণ করেছেন। তাই সাগর অবধূতের এক গুরু।

সমুদ্র অবধূতের গুরু। সমুদ্র যেমন ঋদ্ধি সমাগমে বা বিগমে সুখী বা দুঃখী হয় না মুনিরও তেমনি সম্পদের আগমে বা বিগমে সুখী বা দুঃখী হওয়া চলবে না। ভগবান গীতাবাক্যে উপদেশ করেছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ —গীতা ২।৩৮

যে জায়গায় বুদ্ধি স্থিত হলে চিত্ত পরিবর্ত্তিত হবে না সেইখানে চিত্ত দিতে হবে। পরমার্থে বুদ্ধি স্থিত হলে চিত্তের আর পরিবর্ত্তন হবে না। যেমন যাবনিক খাদ্য যত মূল্যবানই হোক্ নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের কাছে তা যেমন সর্ব্বদা ত্যাজ্য তেমনি স্বর্গাদি সুখভোগ ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত মায়া অধিকৃত যা কিছু সম্পদ সবটাই ত্যাজ্য। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেছেন—যতদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়জনের কৃপা লাভ না হবে ততদিন ব্রহ্মকথা বা মুক্তিসম্পদকে তিক্ত বলে মনে হবে না। যখনই গৌরপ্রিয়জনের করুণা লাভ হবে তখনই সে লোকধর্ম বেদধর্ম ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

যদা যমনুগৃহ্নাতি ভগবান্ আত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

কেশবের অর্চ্চনা করলে সকল দুঃখের অবসান। নরকে পচতে দেখে যমরাজ দুঃখিত হয়ে তাই প্রশ্ন করেন—

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ
কিং ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥

হরি বলা ছাড়া উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নেই। আহার নিদ্রা যেমন একান্ত আবশ্যক তেমনি হরি বলাও একান্ত আবশ্যক বলে ধরতে হবে। যাকে এখানে ডাকতে অভ্যাস করা হবে তাকেই ওখানে গিয়ে ডাকতে হবে। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বললেন—আপনারে হও সাবধান। শুষ্ক বৈরাগ্যে কোন প্রয়োজন নেই। ভালবাসা বৃত্তি জীবের

সহজাত। এই ভালবাসা কাউকে না দিয়ে সে থাকতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রকে এই ভালবাসা দিয়েছে কিন্তু দিয়ে ফল পায়নি। বরাবরই ঠকেছে। এ জগতে ভালবাসার কোন পাত্র নেই। সব প্রেমই এখানে অচল। এ জগতের যে কোন প্রেমের পাত্র প্রেমের সম্মান রাখতে পারে না। একমাত্র গৌরগোবিন্দই ভালবাসার সম্মান রাখে, অসম্মান করে না। ভালবাসাকে আঘাত করে না। গোবিন্দের এমন স্বভাব যে 'স্বল্পামপি কৃতসেবাং বহুধাভ্যুপৈতি।' ভক্তের অল্পসেবাও তিনি বহু আদর করে গ্রহণ করেন। মায়ামোহে পড়ে থাকলে তো হবে না। সংসারকে আদর করতে হবে নিজেকে ভুলে নয়। মহাজন শ্রীশৌনক ঋষি নৈমিষারণ্য তীর্থক্ষেত্রে যাটহাজার ঋষির মুখপাত্র বলেছেন—যে জিহ্বা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে না সে জিহ্বা ভেকজিহ্বা সম। গৌরগোবিন্দ নিজে উচ্চারণ করতে হবে এবং আরও পাঁচজনকে বলাতে হবে। মৃত্যু আমাদের সমুপেত অর্থাৎ সম্যক্ উপেত। কারণ জন্মগ্রহণ করলেই মৃত্যু তার নিশ্চিত।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ। —গীতা ২।২৭

সে দেবতা উপাসকের পূজা গ্রহণের যোগ্য নন যিনি পূজা গ্রহণের বিনিময়ে তার কাজ করে দিতে না পারেন। জীব তো আনন্দ চায়—আনন্দপিপাসু জীব আনন্দের সন্ধানে নিত্য ঘুরছে। কিন্তু আনন্দ কোন্ পথে তা তার জানা নেই। দেবতা যদি উপাসকের পূজা গ্রহণ করতে চান তাহলে তার উপকার করুন। কি উপকার? এ জগতে সবচেয়ে বড় উপকার হল নিষ্কিঞ্চন ভক্ত পাইয়ে দেওয়া। দেবতা যদি উপাসককে নিষ্কিঞ্চন ভক্তসঙ্গ পাইয়ে দিতে পারেন যার ফলে মৃত্যুকে সে এড়াতে পারবে তাহলেই উপাসককে দেবতার উপকার করা হল। মৃত্যুকে না এড়ান পর্য্যন্ত কোন উপায় নেই। যেমন ফাঁসির হুকুম যার ওপর হয়েছে তাকে যদি দশদিন সময় দেওয়া হয় তাহলে তার পক্ষে সেটি কিছু নয়; তেমনি মৃত্যুরূপ কালসাপ যার পিছনে তাড়া করেছে তার তো সুখ কোথাও নেই। কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্মিণঃ? মরণধর্মীর কাছে সুখের বস্তু

কি হতে পারে ? যাকে শূলে চড়ান হচ্ছে তরে কাছে কোন কিছুই তুষ্টির কারণ হতে পারে না। এমন জীব যার বাসনা লুপ্ত হতে দেখা যায় তাকেও মুক্ত বলা চলে না। কারণ মৃত্যু প্রভাবে তার বাসনা লোপ হয়েছে। যেমন পশুর মধ্যে ছাগল (অজ), এদের চরম অজ্ঞতা। এরা অজ্ঞতার মূর্ত্তি। বিজ্ঞতা পাবার জন্য আমরা মানুষ হয়েছি। কিন্তু আমাদের মধ্যেও অজ্ঞতার চরম। কৃষ্ণমহিষী রুক্মিনী দেবী বলেছেন—

ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিটকফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥
—ভাঃ ১০।৬ ।৪৩

ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ, বাইরে আর ভিতরে যার মাংস অস্থি, রক্ত, কৃমি কীট কফ পিত্ত, বায়ু, মেদ মজ্জা বিষ্ঠা মূত্রে পূরিত এই দেহ যদি গোবিন্দ পাদপদ্ম মকরন্দ পান না করে তাহলে সে বেঁচে থেকেও মৃত ;

দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলেছিলেন এই মুখে বৈষ্ণবনিন্দা করেছি—এ অপরাধ ক্ষালনের উপায় কি? মহাপ্রভু তার উত্তরে বললেন—কেউ যদি ভুল করে বিষ খেয়ে নেয় তার বিষক্রিয়া হবে। এই বিষক্রিয়ার প্রতিকার হল অমৃত ভোজন। তাই বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ ক্ষালন হল বৈষ্ণববন্দনা। বৈষ্ণববন্দনা করলেই অপরাধ মোচন হবে।

বৈষ্ণবনিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণববন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি ॥

পরমায়ুর শ্বাসে শ্বাসে হরি কৃষ্ণ বলতে হবে।

নিঃশ্বাসে ন হি বিশ্বাসো কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি।
আবাল্যদেব জপ্তব্যং হরের্নামৈব কেবলম্ ॥

দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরিকে মহাপ্রভু উপদেশ করেছিলেন, 'শ্বাসে শ্বাসে কহ কৃষ্ণ হরি।' কেশবকাশ্মীরি নবদ্বীপে এসেছেন কিন্তু গৌর জানেন না। কারণ গৌর জানা তো সহজ নয়। গৌরকে জানানোর জন্য নবদ্বীপের অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গৌরের রূপ, গুণ, লীলা দ্বিগ্বিজয়ীর কাছে বলছেন। লীলাসঙ্গতি এতে ঠিকই হয়েছে। কারণ রূপ, গুণ, লীলা শুনলে তবে

তো তত্ত্ববোধ হবে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন নিমাইএর সঙ্গে কেশবকাশ্মীরির তর্ক বাধে। কারণ তাদের পক্ষে যে কোন পক্ষই হারুক বা জিতুক তাদের তাতে কোন ক্ষতি নেই। গঙ্গাতীরে দিগ্বিজয়ী ও নিমাইএর মিলন। কেশবকাশ্মীরি গঙ্গাস্তুতি করলেন। গঙ্গার বাবা নিমাই আজ গঙ্গা দর্শন করছেন। দিগ্বিজয়ী আগে পিতাপুত্রীর পরিচয় শাস্ত্র হতে জেনেছেন। আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। শাস্ত্র এসেছেন চেনা করিয়ে দেবার জন্য। একেই গৌরের তপ্তকাঞ্চন বর্ণ তার ওপর অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তিমাভা পড়ে যেন সৌন্দর্য্য শতগুণ বেড়েছে। এ রূপ থেকে চোখ ফেরানো যায় না। পণ্ডিত গঙ্গামহিমার স্বরচিত শ্লোক আরম্ভ করলেন।

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

—চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা

এই শ্লোকে 'ভবানীভর্ত্তুঃ' পদে মহাপ্রভু বিরুদ্ধমতিকারিতা দোষ 'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ' এখানে বিধেয়বিমশ দেখালেন। সম্মানী ব্যক্তির মান গেলে প্রাণ যাওয়ারই অবস্থা হয়। মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য এইটিই যে পরাজিত করেও সম্মান রক্ষা করেন। সরস্বতী দেবী স্বয়ং পণ্ডিতকে উপদেশ করেন বিদ্যালাভের প্রকৃত ফল হল গোবিন্দে রতি লাভ। টাকাকড়ি মান সম্মান প্রাপ্তি নয়। সূতমুনির বাক্য আছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

—ভাঃ ১।২।৮

যত ধর্ম অনুষ্ঠানই করা যাক কিন্তু ভগবানের কথা শ্রবণে যদি রুচি না জন্মায় তাহলে সব পরিশ্রমই বিফল। তাই সাক্ষাৎ গোবিন্দ দর্শন পাওয়ায় আজ তোমার প্রকৃত জয়লাভ হয়েছে। কেশবকাশ্মীরি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করে নিজ কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান তো আগে থেকেই উপদেশ দানের জন্য প্রস্তুত। মহাপ্রভু বললেন যতক্ষণ জিহ্বা নড়ে কৃষ্ণ বল। আরও বললেন, বাগ্‌দেবীর কাছে যা জেনেছ কারুর কাছে তা প্রকাশ কর না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পিতামাতা নিজে উপদেশ করে বা উপদেশ করিয়ে গৌরগোবিন্দ ভজাতে পারেন তিনিই প্রকৃত পিতামাতা। বস্তু পেলে বা না পেলে চিত্ত বিচলিত হবে না—এমন জায়গায় চিত্ত সন্নিবেশ করতে হবে। সমুদ্রের কাছ থেকে এই গুণটি শিক্ষা করতে হবে। সাগর যেমন সর্ব্বদা ভরপুর হয়ে থাকে চিত্তও তেমনি সর্ব্বদা ভরপুর হয়ে থাকবে। বর্ষা এলে সাগর যেমন উদ্বেলিত হয় না আবার বর্ষাশেষে সাগর যেমন শুকিয়ে যায় না মনের অবস্থাও ঠিক ঐভাবে তৈরী করতে হবে সম্পদ্ আগমে সুখ বা সম্পদ্ বিগমে দুঃখ করলে চলবে না। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলে তিনি ভার নেন। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

—গীতা ৯।২২

ভগবান বলছেন—অনন্যচিত্ত হয়ে ভার দিলে তার ভার আমি নিজে বহন করি। গীতাবাক্যে ভগবান বলেছেন—যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—যোগ পদের অর্থ হল অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি আর ক্ষেম পদে প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা। পতির সেবাই সতীর একান্ত কর্ত্তব্য। সতীর পতি-দৃষ্টিই থাকে, পুরুষ-দৃষ্টি থাকে না। গোবিন্দে পতিবুদ্ধি করলে তাঁর অভিন্ন স্বরূপ নারায়ণও তখন গ্রাহ্য হন না। গোপরামাগণ নারায়ণকেও গ্রাহ্য করেন নি। ভগবান বললেন—নিত্যাভিযুক্ত হতে হবে। অভিযুক্ত হবে কেমন করে? যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারে সংযুক্ত থাকার নামই অভিযুক্ত থাকা। সত্যযুগে এই সংযোগের ব্যবস্থা ছিল ধ্যান। যোগক্ষেম বহন করেন অর্থাৎ ওজগতের তো ভার নেনই এজগতের ভারও নেন। মহারাজ অম্বরীষের রাজ্য পাহারা দিয়েছেন, মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে

কৃষ্ণসেবা করেছিলেন। আমরা বাইরের ভৃত্যদের বশে রাখতে পারি না আর অম্বরীষ মহারাজ অন্তরিন্দ্রিয় তো বটেই বহিরিন্দ্রিয়কেও ভৃত্য করে বশে রেখেছিলেন। অনেকে বাইরের প্রজাকে আদেশ পালন করান কিন্তু ভক্তবীর অম্বরীষ দেহেন্দ্রিয়কে ভৃত্য করে তাদের আদেশ পালন করিয়েছেন। এমন রাজা খুব কম দেখা যায়। মহারাজ অম্বরীষের যে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবৎ সংযোগ এরই নাম নিত্যাভিযোগ। গোবিন্দ স্বয়ং তাঁর রাজ্যের ভার নিয়েছিলেন। অর্জুন মিশ্রের ভার তিনি নিজে বয়ে এনেছেন। পৃথিবী একটি অখণ্ড কিন্তু নিজের মনে করলেই তাতে কর্ত্তা হওয়া যায়। যেমন ভূমি একটাই—কিন্তু আল দিলেই এ জমি আমার এ জমি তোমার হয়। আল তুলে দিলে আর কোনটা কার জমি চেনা যায় না। তিনিই সংসারের চালক। আমরা কর্ত্তৃত্বের আল দিয়ে রাখি। বিষ্ণু পালনকর্ত্তা। সাধনপক্ষেও ভার তিনিই নেন। অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি তিনিই করিয়ে দেন। গীতাবাক্যে বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ —গীতা ১০।১০

জীবের কর্ত্তৃত্ব বলে কিছু নেই। অতএব ধীর হলে ভাল। চঞ্চল হয়ে কোন লাভ নেই। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই উচ্ছৃঙ্খল হয়। তাই ধীর থাকবার উপদেশ দিয়ে ভগবান বলছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। —গীতা ২।৩৮

সুখে দুঃখে চিত্তের সাম্য রাখা কঠিন। প্রহ্লাদ বলেছেন দৈত্যবালকদের কাছে—

অসারসংসারবিবর্ত্তনেষু মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।
—বিষ্ণুপুরাণ

বিবর্ত্তন পদের অর্থ হল এখানে দুঃখময় সংসারকে সুখের বলে মনে করা। এইটি আমরা ত্যাগ করতে পারি না। আমাদের আঠা কিছুতেই কমে না। এ বিবর্ত্তন অদ্বৈতবাদের নয়। রজ্জুতে সর্পবোধের মত বিবর্ত্তন নয়। গোস্বামিপাদ বলেছেন বিবর্ত্তবাদ কথা

সত্য কিন্তু মিথ্যা জায়গায় সেটি প্রযুক্ত হয়েছে। দুঃখময় জগতে সুখবোধ করা হয়েছে—এরই নাম বিবর্ত্তন। যেমন আকাশ আর কুসুম দুই বস্তুই সত্য কেবল সংযোগটিই মিথ্যা। বয়সই এগিয়ে চলেছে কিন্তু গৌরগোবিন্দ বলা অভ্যাস হল না। নিরন্তর অনুশীলন করতে হবে। চাবুকের তলায় সব সময় থাকতে হবে। কোন সময়েই স্বাধীন হওয়া চলবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সারথি আর মন অশ্ব। সারথি যেমন চালাবে অশ্ব তেমনি চলবে। মাটির দোকানে যত গঠনই থাক না কেন তার যেমন একটি বস্তু উপাদানগত সত্য সেটি হল মাটি, উপনিষদ বললেন মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। জগতের সব বস্তুই তেমনি দুঃখ উপাদানে গড়া। দুঃখই একমাত্র এ জগতে সত্য। সুখ বলে যে মনে হয় সেটি আর কিছু নয় চিনি মাখান কুইনাইনের মত। দোকানদার যেমন পচা মাল টাটকা করে দেখায় মায়া তেমনি পঞ্চবিষয় দিয়ে দোকান সাজিয়ে চৌদ্দ ভুবনে বাজার বসিয়েছে জীব খদ্দেরকে জিনিষ গছাবার জন্য। জীবতো আনন্দময়ের অংশ, সুখময়ের অংশ তাই দুঃখ তো সে নেবে না। তাই প্রহ্লাদ বললেন, জগতের সবটাই দুঃখ। এই দুঃখকে সুখের গুঁড়ি মিশিয়ে সুখী মনে করে সুখী হয়ো না। ভূঁইএঞা মালীর আতিথ্যে সনাতন প্রভু সুখী হন নি। ঈশান ভৃত্যকে সঙ্গে নিলেও গোস্বামিপাদের চলত কিন্তু ত্যাগের পথ যে কত বন্ধুর, সংস্কার যে কিছুতেই ছাড়ে না এইটিই জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য গোঁসাইএর ভৃত্য গ্রহণ। ভূঁইএঞা মালীর অকারণ আতিথ্য দেখে গোস্বামিপাদের মনে সন্দেহ হয়েছিল—অকারণে আমাকে আদর করে কেন ? এক গৌরগোবিন্দ ছাড়া অকারণে এ জগতে কেউ আদর করে না। সংস্কার কিছুতেই ছাড়ে না। ভূঁইএঞা মালী গোস্বামিপাদকে বলেন—গোঁসাই তুমি তো বিচক্ষণ আছ। এ জগতের মায়াও হল ভূঁইএঞা মালীর মত। এর আদরে যদি তৃপ্তিলাভ করা যায় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য্য। ভগবানকে ভুললেই মৃত্যু। প্রহ্লাদ বলছেন সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত মৃদ্‌গজভানবৎ। মাটির হাতি, মাটির ঘোড়া—সর্ব্বত্র যেমন মৃত্তিকা বুদ্ধিতে সমদৃষ্টি তেমনি মায়া তৈরী

যে কোন বস্তু হোক সব সমান। এইটিই বুঝতে হবে। কিন্তু মনকে বুঝান কঠিন যে জগতের সবটাই দুঃখময়। এই সমজ্ঞান লাভ করতে হবে। উপায় কি? উপায় গোবিন্দের পায়। অর্থাৎ যে গোবিন্দ আরাধনা করে সেই সমতা বুদ্ধি পায়। সমুদ্রের উপদেশ তাই বড় জটিল। সম্পদ্ সমাগমে বা বিপদ্ সমাগমে চিত্তকে সমান রাখতে হবে।

পতঙ্গ অবধূতজীর আর এক গুরু। জগতে সবই গুরুতত্ত্বের প্রকাশ। নিতে পারলেই লাভ। অবধূত বললেন রূপাসক্তির্নাশহেতুঃ। এখানে পুরুষ বললেও পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই নিতে হবে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী এবং স্ত্রীর পক্ষে পুরুষ নিতে হবে। কারণ পুরুষের আসক্তি স্ত্রীর প্রতি আবার স্ত্রীর আসক্তি পুরুষের প্রতি। আত্মাকে তৃণাচ্ছন্ন কূপের মত মনে করতে হবে। এ কথা বড় শক্ত। শাস্ত্র কথা তো শক্ত হবেই। চিকিৎসকের ছুরি তো ভোঁতা হলে চলবে না। যত ধারাল হবে রোগীর পক্ষে তত ভাল। তেমনি জীবের অবিদ্যা-বিস্ফোটক ভাল করতে হলে শাস্ত্রবাক্যকেও শাণিত ছুরির মত না হলে চলবে না। হিতবাক্য কখনও মনোহর হবে না। মহাকবি ভারবির কথা আছে—"হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ।' হিত কথা অথচ মনোহারি—এ জগতে দুর্লভ। সকল শাস্ত্রের চেয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ছুরি সকলের চেয়ে শাণিত। আমাদের যা হিত তা আমরা বুঝি না। প্রিয়তার খাতিরে দুঃখ কালসাপের গর্ত্তে হাত দেওয়াই আমাদের স্বভাব। সুখ আমাদের কখনও বর্ত্তমান হল না। হয় অতীত না হয় ভবিষ্যৎ হয়ে গেল। কলিকালে সুখের ব্যবস্থা এই প্রকার—যেটি চলে গিয়েছে সেইটিকেই সুখের বলে মনে হয়। কলের্গতং ধন্যম্। আনন্দের বোধ আমাদের হয় নি। আনন্দ আমাদের ফাঁকি দিয়ে যায়। আনন্দকে কখনও প্রত্যক্ষ করে আঁচলে বাঁধতে পারি না। ঐন্দ্রজালিকের টাকা যেমন চোখের রঙ্ মাত্র। এর মধ্যে বস্তু সত্তা কিছু নেই। তেমনি জগতে সুখের বস্তু যা আমরা আঁকড়ে ধরতে চাই তাতেও বস্তু সত্তা কিছু নেই। গৌরগোবিন্দ ছাড়া সুখ হয় না। তাই শ্রুতি বললেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়

নাটক বললেন, প্রচুরতর-ধনবান অপরমপি ধনিনং করোতি। বিভূচৈতন্য আনন্দময় না হলে অপরকে সুখী করতে পারে না। এ জগতের সব সুখই অল্প। মহাপুরুষের একটি নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি। এর তুলনায় আমাদের স্বল্পকাল যে কতটুকু তা আমরা বুঝতে পারি না। নীচের স্তরের পরমায়ু কত ক্ষীণ তা বুঝা যায়। পিঁপড়ের পরমায়ু যে কত অল্প তা আমরা বুঝি। তেমনি ব্রহ্মার দৃষ্টিতে দেবতারা অল্পায়ু। আবার প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু ব্রহ্মার পরমায়ু কম বলে ভাবেন। তাই শ্রুতি বললেন নাল্পে সুখমস্তি। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট বস্তু তাই অল্প আর স্রষ্টা হলেন ভূমা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সৃষ্টিতে মুগ্ধ হয় না স্রষ্টাকে নেয়। কল্পতরু যা দিতে পারে তা চায় না কিন্তু কল্পতরুকেই চায়। স্রষ্টাই সব। কারণ ভগবান বলেছেন—"মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" বুদ্ধিমান ব্যক্তি সৃষ্টিকে নেবে না স্রষ্টা গোবিন্দকে নেবে। প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি। এত শোনার পরেও বিষয়াভিনিবেশ থেকে যায়। নোঙর না তুলে বাইলে যেখানকার নৌকা সেখানেই থাকবে। এগুবে না একটুও। গৌরগোবিন্দে রতি হওয়ার লক্ষণ কি? বিষয়াভিলাষ কমবে। একটার মাত্রা বাড়লে আর একটার মাত্রা কমবে। পথে যে এগুনো হচ্ছে বুঝা যাবে কি করে? পথ কমলে বুঝা যাবে এগুনো হচ্ছে। আমরা মায়ার সংসারে আছি। পরপারে গোবিন্দ পাদপদ্ম আছে। সেখানে যেতে হবে। শাস্ত্র বললেন—নারায়ণপরা যত্র সাধবঃ সমদর্শিনঃ। পথ কাছে এলে বুঝতে হবে এগুনো হয়েছে। ভক্তি পথে সাহায্য পাওয়া যায়। আপনারে হও সাবধান। লোক ঠকান সহজ কিন্তু প্রকৃত পথে হাঁটা কঠিন। লোকে যা বলে বলুক গৌরগোবিন্দ পাদপদ্ম রোজগার করে যেতে। কৃপণের মত ভজন করতে হবে। কৃপণ যেমন ধন ভেঙে খায় না সাধকও তেমনি ভজন ভাঙবে না। প্রাকৃত সম্পদের জন্য প্রার্থনা করলে বা অপরাধ করলে ভজন ভেঙে যায়। হীরে বিক্রী করে যেন বিচুলি না কিনি। জীব জন্মমরণের দুঃখ যা সহ্য করে তা মনে থাকলে আর জন্মমৃত্যু কবলিত হয়ে এই মায়ার সংসারে আসতে চাইবে

না। স্ত্রীপুরুষের যে আসক্তি পরস্পরের পরস্পরের প্রতি এরই নাম হৃদয়গ্রন্থি। শ্রীঋষভদেবের উক্তি—তয়োর্মিথ হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ। কখন এই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হবে তাও শ্রুতি বলেছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টেঃ পরাৎপরে॥

পরমেশ্বরকে জানা ছাড়া এ গ্রন্থি ছেদনের অন্য কোন পথ নেই। রূপের সাগর ভগবানকে না দেখা পর্য্যন্ত হৃদয়গ্রন্থি কাটে না। মায়া কারও খাতির রাখে না। আত্মজ্ঞানের খাতির‌ও মায়া রাখে না। তাই চণ্ডীকার বললেন—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

আমি তোমার হলাম বলে সব ছেড়ে ঝাঁপ দিতে পারলে হয়। সে কৃপা করলে হয়। 'এ মায়ার নাটে কে হইবে স্থির?' যাকে তিনি স্থির করেন সে স্থির হয়। জাঁতায় যেমন সব কলাই ভাঙা হয়ে যায় কিন্তু যেগুলি খিলের ভিতরে পড়ে তা আর ভাঙে না তেমনি মায়ার জাঁতায় পড়ে সব জীবই শেষ হয়ে যায় কিন্তু মহৎপাদপদ্মরূপ খিলকে যে ব্যক্তি আশ্রয় করে থাকে তার আর ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অবধূতজী বলছেন—রূপাসক্তি যে নাশের হেতু এটি আমি পতঙ্গের কাছে শিখেছি।

ঐন্দ্রিয়ক সুখ স্বর্গে বা নরকে যে কোন জায়গায় পাওয়া যায়। রূপাদি পঞ্চবিষয়ের দ্বারে দ্বারে এতটুকু বিষয়ভোগের জন্য কামার্ত্ত জীব ঘোরে। উট কাঁটা চিবোয় তাতে মুখে দুই চোয়াল বেয়ে রক্ত ঝরে। মানুষ এর চেয়েও হীন। মানুষ বিষয় ভোগ করে ক্ষতবিক্ষত হয়। পরে যে তার হৃদয়ের চিন্তার স্রোত এ চিন্তার বা উদ্বেগের স্রোত নয়, এ হল উটের মুখের ক্ষতের রুধির ধারা। গাধা যে তার পরের বোঝা বওয়া সাজে কিন্তু মানুষেরও যদি পরের বোঝা বয়ে জীবন যায় তাহলে তার চেয়ে ঘৃণার বিষয় আর কি আছে? পরমপূজ্যপাদ শ্রীগুরুমহারাজ

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—

কামিনী সাপিনীর মালা
সাধ করে গলায় পরলে—

স্ত্রীর অনুগত হয়ে ক্রীড়ামৃগের মত জীব থাকে। মৃগের মত জীবের অবস্থা অল্প তৃণলোভে ক্রমশঃ সে এগিয়ে যায়—যে তৃণ এত অল্প যে তাতে পেটও ভরবে না—তাও আবার দুর্লভ—আর তার অবস্থা কেমন?

পশ্চাতে অগাধ জল দুইপাশে দাবানল
সম্মুখে সাধয়ে ব্যাধ বাণ

নেকড়ে বাঘের মত জীবের পরমায়ু কাললব অর্থাৎ দিন দিন এ পরমায়ুর ক্ষয় হচ্ছে। পিছনে ব্যাধ অর্থাৎ কৃতান্ত যম। কাল আগে থেকেই আয়ু বৃক্ষের গোড়া কেটে দেয়। তারপর যম একটু নাড়া দিলেই কাজ হয়ে যায়। হরিণ এখানে আত্মা। একে বাঁচাবে কে? ভগবান গীতাবাক্যে বললেন—

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। —গীতা ৬।৫

আত্মাই জীবের একমাত্র বন্ধু আর যে ব্যক্তি গৌর বলায়, গৌর শোনায়, গৌর ভাবায় সাহায্য করে সেই বন্ধু। অঙ্গনাশ্রম অর্থাৎ সংসার-আশ্রম এর প্রতিবন্ধক। গৌরগোবিন্দ ভজনের প্রতিবন্ধক সংসার-আশ্রম।

যদুমহারাজের সঙ্গে অবধূতজীর যে প্রসঙ্গ এ সংবাদ বড় প্রাচীন। সংসারত্যাগ সে যুগে সহজ হলেও এ যুগে সহজ নয়। তখনকার সাধন এখন এই কলিযুগে চলে না। কিন্তু তখনকার সরকারের ছাপ দেওয়া টাকা বাদশাহী আমলের টাকা অচল হলেও সেই টাকায় যে সোনা বা রূপা তা তো এখন অচল হয় নি। টাকা গলিয়ে যেমন সোনা বা রূপা নেওয়া যেতে পারে তেমনি সংসারাশ্রম ত্যাগ এ যুগে অসম্ভব হলেও সংসারাসক্তি ত্যাগ করা যেতে পারে। তাতে তো কোন বাধা নেই। আর বাধা নেই শুধু তাই নয়, আসক্তি ত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই গৃহে থাকার নিন্দা করেন নি বা বনে যাওয়ার প্রশংসা করেন নি—কিন্তু গৌর বলে ডাকার দাম দিয়েছেন।

গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
(ঠাকুর) নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ ।

এ বাক্য কোথায় আর আমরা কোথায় ? আমরা গ্রহণ করতে পারব না জেনেই পতিতপাবনের আবির্ভাব। সেকালের অচল টাকা গলিয়ে তার থেকে রূপো বার করে দেবে এমন কারিকর চাই। প্রেম হল সেই কারিকর। নিতাই গৌর পতিতপাবন। নিতাই-কৃপায় গৌর-অনুরাগ পাওয়া যাবে। অনুরাগ তো আমাদের আছেই কেবল তার জায়গাটি বদলাতে হবে। বিষয়ে অনুরাগ তো আছেই সেই অনুরাগটি গৌর-গোবিন্দে লাগাতে হবে। বাদশাহী টাকা এখন চলে না—ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ, অর্চ্চনা বাদশাহী আমলের টাকা, এ টাকা দামী সোনার তৈরী। কিন্তু কি করা যাবে ? বর্ত্তমান যুগে তো অচল। কারণ বর্ত্তমান গৌর সরকার সে টাকায় তো ছাপ দেন নি। বর্ত্তমান যুগের টাকা কাগজে তৈরী। কোন মূল্যই তার নেই। কিন্তু তবু তার দাম। কারণ বর্ত্তমান সরকার তাতে ছাপ দিয়েছেন। তাই কাগজ হলেও সচল। আর বাদশাহী সোনার টাকা বর্ত্তমান সরকারের ছাপ নেই বলে দামী হলেও অচল। তেমনি ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চনা দামী সাধন হলেও কলিপাবনাবতার গৌরসরকারের ছাপ নেই বলে তা এখন অচল। আর শ্রীমান সঙ্কীর্ত্তন দামে কম তো নয়ই বরং বেশী কিন্তু তাতে গৌরসরকারের অনুমোদন দেওয়া আছে বলে কগিযুগে নামযজ্ঞেরই দাম। কাগজের ওপরও সরকারের ছাপের জন্য দাম। হরি-নামের মহিমা সবযুগেই আছে। নারদ, হনুমানজী, প্রহ্লাদ প্রভৃতি তার উদাহরণ। সেই হরিনামই এ সরকারের চালু টাকা। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বসাধন শকতি পাওয়া যায়। হরিনাম করলে সর্ব্বসাধনের শকতি পায়—শ্রবণের অধিকার পাওয়া যায়। হরিকথা শুনতে বসেও অন্যমনস্ক হয়ে যায় বা ঘুমে ঢুলে পড়ে। কথা কানে যায় না। তাহলে বুঝতে হবে পূর্ব্বজন্মে অপরাধ আছে।

তবে জানি পূর্ব্বজন্মে আছে কত পাপকর্মে
তে লাগি বিধাতা তোরে বাম ।

আমাদের দেহ ভক্তিযাজনে অক্ষম। বিষ্ঠার কৃমি যেমন পারিজাত কুসুমে থাকতে অক্ষম। জীবের মধ্যে জাতরতি অবস্থা কম। কিন্তু হরিনাম অবলম্বন করলে এই সাধনশকতি বাড়ে। মা যেমন ছেলেকে জুজুর ভয় দেখান সে মিথ্যা বলতে মায়ের দোষ হয় না তেমনি যে মিথ্যা বললে ভক্তি পুষ্ট হয় সে মিথ্যা বললেও দোষ হয় না, পাপ হয় না। হরিনাম গ্রহণে বিষয়াসক্তি ত্যাগ হয়। স্ত্রী-পুরুষ দুই পক্ষ—তয়োর্মিথঃ হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ। এটিকে ত্যাজ্য বলে আমরা ভাবতে পারি না। আমরা এত পতিত যে হরিকথা শুনবার পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার নেই। নিমিরাজ আমাদের হয়ে বলেছেন—'হে মহাভাগ, আপনারা হরিকথা বলুন, যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।' পতিতপাবন নিতাইগৌর আমাদের শুনবার অধিকার দেবেন। শ্রীমদ্ভাগবত হলেন নিতাই কলেবর। নিতাই আশ্রয়তত্ত্ব গৌর বিষয়তত্ত্ব। শ্রীমতী রাধারাণী আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হলেন বিষয়তত্ত্ব। আশ্রয়তত্ত্বের কাজ হল বিষয়তত্ত্বকে প্রকাশ করা। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র আশ্রয়তত্ত্বের কাজ করেন—বিষয়তত্ত্বকে শ্রীগৌরগোবিন্দকে প্রকাশ করেন। রাধারাণী কৃষ্ণকে প্রকাশ করেন। রাধারাণীকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারা যাবে না। রাধারাণী কৃপা করলে তবে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে। কৃষ্ণ চন্দ্রকাল—নিকষ কাল দুষ্প্রাপ্য। খালি চোখে দেখা যায় না। বিজলীবরণী প্রেমময়ী ঠাকুরাণী রাধারাণী তাঁর পাশে উজোর প্রদীপ। রাধারাণীর কৃপার ছটায় কৃষ্ণ দেখা যাবে। তেমনি নিতাই কৃপায় গৌরতত্ত্ব উপলব্ধি হয়—তার সাক্ষী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী। গৌরচন্দ্র উপদেশদানে রঘুনাথকে ফিরিয়ে দিয়েছেন—এ উপদেশদান বঞ্চনামাত্র। একমাত্র বংশধর রঘুনাথকে সংসারী করবার জন্য পিতামাতার চেষ্টার অন্ত নেই কিন্তু ছেলে পড়েছে গৌর অনুরাগের টানে। উপায় কি? পাণিহাটি গ্রামে বটবৃক্ষমূলে কোটি সূর্য্যোদয় করে বসেছেন নিত্যানন্দ। এখন যদি প্রশ্ন হয় একটি সূর্য্যের প্রভাবই তো সহ্য করা যায় না তাহলে কোটি সূর্য্যের প্রভা কেমন করে সহ্য করা যাবে? মহাজনকথা আমরা বুঝতে পারি না বলে ধর্ত্তব্য নয় মনে করি কিন্তু বস্তুত তা নয়। তাঁরা যা বলেন

প্রতিটি বাক্যই সত্য। যাঁর একাংশ থেকে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ তিনি সাক্ষাৎ কোটি সূর্য্যের প্রকাশ করে বসবেন এতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাঁর প্রভাব ভক্ত সহ্য করতে পারে। মহাজন বলেছেন সোমজ্যোতি প্রতি ভক্তাদির। নিত্যানন্দ এখানে রঘুনাথকে কৃপা করলেন। নিত্যানন্দ-কৃপাচিহ্নিত রঘুনাথকে গৌর আর ফিরিয়ে দেন নি। আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবত আর শ্রীভগবান হলেন বিষয়তত্ত্ব। এই আশ্রয়তত্ত্ব বিষয়তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণভগবানকে প্রকাশ করেছেন। তাই নিতাইশক্তি শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যানন্দ-কলেবর। শব্দব্রহ্ম শ্রীমদ্ভাগবত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ। তাই কৃপা হলে অবধূতবাক্য বুঝা যাবে।

অবধূতজী পতঙ্গকে গুরুপদে বরণ করেছেন। তার কাছে যা শিক্ষা করেছেন সেটি বলছেন—

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

—ভাঃ ১১।৮।৭

এটি স্বাভাবিক বাক্য। রূপাসক্তির্নাশহেতুঃ। নাশ মানে ভগবৎ বিস্মৃতি। পরস্পরের আসক্তি—এর মধ্যে স্ত্রীপুরুষের আসক্তি সবচেয়ে বেশী। প্রহ্লাদ প্রার্থনা করেছেন যুবার যেমন যুবতীতে প্রীতি, আবার যুবতীর যেমন যুবাতে প্রীতি সেই রকম প্রীতি তোমাতে আমার হোক্। এই আসক্তির ফলেই সৃষ্টি রক্ষা হচ্ছে। আসক্তি হল আত্মকল্যাণকামনার বিরোধী। এই বিরোধিতা থেকে সাবধান হতে হবে। কারণ বলা আছে—'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।' মদ্য মাংস মৈথুন ভোগের কথা যে শাস্ত্র বলেছেন এটি বিধি নয়। বিধির মত দেখতে হলেও বিধি নয়। বিধির লক্ষণ হল অপ্রাপ্তপ্রাপণো বিধি। বিধি তিনপ্রকার—অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি এবং পরিসংখ্যা বিধি। এর মধ্যে অপূর্ব্ব বিধিই বিধি, অপর দুটি অভ্যনুজ্ঞা। অপ্রাপ্তপ্রাপণো অপূর্ব্ববিধি। যেমন অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। অনুপনীতের যখন উপনয়ন হল তখন তার পক্ষে

সন্ধ্যাবন্দনা অপ্রাপ্ত ছিল, এখন প্রাপ্ত হল। এইটিই অপূর্ব্ব বিধি। ব্যবায় প্রভৃতি অপ্রাপ্ত নয়। নিত্যপ্রাপ্তি হয়েই আছে। কাজেই এর ওপর বিধি হতে পারে না। যজ্ঞে গবালভন—এগুলি অভ্যনুজ্ঞামাত্র। এগুলি ব্যবস্থামাত্র, বিধি নয়। কিন্তু এগুলির আশু নিবৃত্তিই ইষ্টা। এইটিই লক্ষ্য রাখতে হবে। কাম্য কর্ম নিন্দিত। এগুলি দুঃখের মাত্রা বাড়ায়। নিষ্কাম কর্মই একমাত্র অনিন্দিত। নিবৃত্তিমার্গ ব্যতীত অন্য মার্গকে মার্গ বলা চলে না। শাস্ত্র অঙ্কুশের কাজ করে। অঙ্কুশ যেমন ধীরে ধীরে মত্ত হস্তীকে বশীভূত করে তেমনি কামাদি মত্ত হস্তীকে শাস্ত্র অঙ্কুশ বশীভূত করে। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিনপ্রকার শ্রদ্ধা তিনপ্রকার জীব—এ সব কথা গীতাবাক্যে স্পষ্ট করে বলেছেন। দোকানদার যেমন আলু বাছাই করে রাখে। সত্ত্বগুণের জীবই শাস্ত্রবাক্য বুঝতে পারে। রজঃ ও তমঃ গুণের জীব বুঝতে পারে না। গোবিন্দভজন ছাড়া কোন ভজন হয় না। শাস্ত্রগত যা বিধি তা সব জীব নেবে না। কিন্তু মাকে তো সব ছেলেকেই কোলে নিতে হবে। ঋষি, বেদ এঁরা হলেন মা। সবাই যাতে মায়ের কোলে স্থান পায় তার জন্য তামসিক ব্যবহারকেও ধর্ম মধ্যে ধরা হয়েছে। বীরাচারে পশ্বাচারে মায়ের আরাধনার বিধি আছে। পশ্বাচারে সাত্ত্বিকভাবে মায়ের আরাধনা করতে হবে। মায়ের ছেলে সবাই। জীব প্রবৃত্তির দাস। সবই তারা প্রবৃত্তির অনুকূলে নেবে। অসৃক্ (রক্ত) লিপ্ত মাংস মাকে উপহার দেবার বিধি আছে। পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে—অসৃক্ লিপ্ত মাংস মাকে উপহার দিয়ে যদি স্বর্গে যায় তাহলে নরকে যাবে কে? তবে এ কথা বলা হল কেন? অধিকারী ভেদে এ কথা বলা হয়েছে। শাস্ত্র যদি উপদেশ করতেন গোবিন্দ বলে কাঁদাই একমাত্র ধর্ম, অন্য কোনটিই ধর্ম নয় তাহলে সে ধর্ম সবাইকে নেওয়ান যেত না। অতি অল্প লোকেই সে ধর্ম নিত। তাই ধর্মকে এমন ব্যাপক করা হল যাতে ধর্মের গণ্ডীর বাইরে কেউ না পড়ে। শাস্ত্র তিন প্রকার—শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় বলা আছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

—গীতা ৯।২৫

মানুষ যদি ধর্ম আচরণ না করে তার জন্য শাস্ত্র দায়ী হলেন, ঋষি দায়ী হলেন। দেবতাও দায়ী হলেন। ঋষি ও দেবতা কৃপা করলে তবে মানুষ সাত্ত্বিক হবে। ভগবানের যশোগানই একমাত্র ধর্ম। জীবের স্বভাব যা সেইটিই পেতে চায়। অণুর স্বভাব বিভুর সঙ্গে মিলতে চায়। জীবাত্মা অণু। সে বিভুর সঙ্গ চায়। ধর্ম হল স্বাভাবিকতা। জীবাত্মা তার অণু স্বভাবে বিভুচৈতন্য গোবিন্দকে পেতে চাইছে, গোবিন্দের পায়ে পড়তে চাইছে কিন্তু বুঝা যাচ্ছে না। কারণ জীব অবিদ্যা ভুলের মধ্যে পড়েছে। ভগবানের একটি কৃপার প্রলেপ জীবের ওপর দেওয়া আছে। এ জগতে কোন বস্তুতে সে তৃপ্ত হচ্ছে না। কোন মানুষের যদি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে তাহলেও তার আচরণ দেখে অনুমান করা যায় সে কোন্ ঘরের। জগতের বিষয়ভোগে জীবের যে অতৃপ্তি—এই অতৃপ্তিই তাঁর কাছে যাবার সিঁড়ি। এই অতৃপ্তিটি ভগবানের করুণার দান। এইটিই করুণার সাড়া। বিধাতার কাজ জীবকে সুখী করা। ভগবান যে জীবকে এই সর্ব্বজনীন অতৃপ্তি দিয়েছেন এইটিই সবচেয়ে উত্তম পাওয়ানর কৌশল। এটি ভগবানের সৃষ্টি। আমাদের সৃষ্টি হলে তার ব্যবহার অন্যরকম হত। ভগবৎপাদপদ্ম ভুলেছি বলেই দুঃখকে আমাদের সুখ বলে মনে হয়েছে। কৃষ্ণদাস্যই শ্রেষ্ঠ চাকরি। অতৃপ্তি না থাকলে এগুনো যেত না। অতৃপ্তিই গোবিন্দের কাছে নিয়ে যাবে। এই অতৃপ্তি নিয়ে কত কোটি জন্ম কেটে যাবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বলেছেন—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ।

সব আসক্তি থাক। তাই নিয়েই গৌর ভজতে আরম্ভ করতে হবে। গৌর ভজতে ভজতে সব আসক্তি আপনিই চলে যাবে। ক্ষুধাকে লাঠি

দিয়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করলে ক্ষুধা যায় না কিন্তু উদরে অন্ন পড়লে তবে ক্ষুধা যায়। তেমনি নাম-অন্ন খেলে তবে প্রাকৃত ক্ষুধা যাবে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত তাই।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্॥ —ভাঃ ১।২।৭

ভক্তিকে পুষ্ট করতে হবে। তাহলে প্রাকৃত ক্ষুধা যাবে। অণু সব সময় বড় হতে চায়। বড় যে সেই ছোট হতে পারে, ছোট কখনও ছোট হতে পারে না। ভক্তি হলে তার থেকে জ্ঞান বৈরাগ্য হবে। অহৈতুক জ্ঞান বলেছেন অর্থাৎ যে জ্ঞান শুষ্ক কর্মাদির অগোচর। ভক্তি হলেন মহারাণী, জননী। তাঁর দুই সন্তান জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। অর্থাৎ ভক্তি হলে তার থেকে যে জ্ঞান বৈরাগ্য হবে সেই জ্ঞান বৈরাগ্য গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞান বৈরাগ্য যদি ভক্তির জনক হন তাহলে সে জ্ঞান বৈরাগ্য গ্রাহ্য নয়। নাম-অন্ন গ্রহণ করলে প্রাকৃত ক্ষুধা চলে যাবে। অবধূতজীর বাক্যে যে বলা হয়েছে—

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥ —ভাঃ ১১।৮।৭

এখানে স্ত্রী বলা হয়েছে সেটি উপলক্ষণে। উপলক্ষণের লক্ষণ হল স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বম্। নিজেকে প্রতিপাদন করেও অন্য বস্তুকেও যা প্রতিপাদন করে।

অবধূতজী যদুমহারাজকে কৃপাশক্তি সঞ্চার করে কথা বলছেন। তাই যদুমহারাজ হৃদয়ে সব কথা ধারণ করতে পেরেছেন। পতঙ্গ হলেন অবধূতজীর গুরু। রূপাসক্তি হল নাশের কারণ।

পতঙ্গ মাতঙ্গ কুরঙ্গ ভৃঙ্গ মীনা হতাঃ পঞ্চভিরের পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

পতঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ (হরিণ), ভৃঙ্গ, মীন এরা প্রত্যেকে বিনাশ পায় কারণ তাদের প্রত্যেকের একটি করে ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল। সেই দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় পথে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর মানুষ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী

—তারও একটি ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় সমস্ত প্রজ্ঞা বুদ্ধিবৃত্তি বিনাশ পেয়ে যায়।

শাস্ত্র তো মানুষের জন্য। মানুষজন্মটি কাজে লাগাতে হবে। বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার করে বলেছেন—যে ব্যক্তি এই সংসার হতে হরিকে হৃদয়ে ধারণ করে চলে যেতে পারে সেই ব্যক্তিই নরোত্তম, শুধু সিংহাসনে বসলেই তাকে নরোত্তম বলে না। বিদুরের সঙ্গে মৈত্রেয় ঋষির যে সংবাদ তাতে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের তৃতীয় চতুর্থ স্কন্ধ ভরে আছে। কঠিন মোহ, দুর্ব্বার মোহ তাই প্রচণ্ড আঘাত না করলে ছাড়বে না। বিদুর ভগবদ্ভক্ত, তাই নরোত্তমের লক্ষণ জানেন। কূর্ম্মের মত ব্যবহার করতে হবে। গীতায় ভগবান বললেন—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ —গীতা ২।৫৮

ইন্দ্রিয়ের পিপাসা যে পরিবর্ত্তন করে দিতে পেরেছে তারই প্রকৃত বৈরাগ্য হয়েছে বুঝতে হবে। চোখে কাপড় বেঁধে রূপ দেখব না বললে বৈরাগ্য হয় না। চোখে কাপড় বাঁধা বৈরাগ্যের সাধনা নয়—প্রাকৃত রূপাদিতে অরুচিই প্রকৃত বৈরাগ্য। বাঁদর যেমন কোন বস্তু গ্রহণ করলে তার চেয়ে অধিক লোভনীয় বস্তু তাকে দিয়ে আগের বস্তুটি ছাড়াতে হয় ইন্দ্রিয়ের স্বভাবও এই বাঁদরের মত। অন্য অধিক লোভনীয় দিলে তবে প্রাকৃত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ ছাড়বে। গৌরগোবিন্দপাদপদ্মই অধিকতর লোভনীয়। এই চরণামৃত নিত্য নিত্য পান করলে তবে ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্তি ত্যাগ করবে। সংসারে চোরের মত থাকতে হবে। চোর যেমন ঘরে ঢুকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু নিয়ে পালিয়ে যায় আমাদেরও সংসারে থেকে সেইরকম করতে হবে। সবচেয়ে ভাল ও মূল্যবান বস্তু হল গৌরগোবিন্দপাদপদ্ম। তাই চুরি করে এ সংসার থেকে পালাতে হবে। ভাল জিনিষ চুরি করলে দোষ তো হবেই না বরং যার জিনিষ চুরি করা হবে তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বলবেন তুমি যা চুরি করেছ

তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি—আরও সম্পদ তোমাকে দেব। এ জগতে সৃষ্ট বস্তু সবই ক্ষয়িষ্ণু, ভগবৎ স্বরূপই একমাত্র অক্ষয়, সুন্দর উত্তম বস্তু। যা পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়। সৃষ্টি যত উত্তমই হোক্ স্রষ্টার চেয়ে হীন। জন্য জনক সম্বন্ধ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে। পুত্র যত উত্তমই হোক্ সে পিতার চরণে প্রণত হবেই। শ্রীহরিভজন সর্ব্বোত্তম সম্পদ। এ জগতের সম্পদ ভোগ করেন বলে রাজাকে নরোত্তম বলা হয়। কিন্তু সে সম্পদ সবই ক্ষয়শীল। কিন্তু শ্রীগৌরগোবিন্দপাদপদ্মমকরন্দরূপ সর্ব্বোত্তম সম্পদ যিনি ভোগ করেন তিনিই নরোত্তম। উদ্ধবজীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগোবিন্দও বলেছেন শ্রেষ্ঠ লাভ হল — লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমা। তাই সাধুকে মহারাজ বলা হয়। শাস্ত্র মানুষের জন্য। গৃহ অন্ধকূপের মত—তাতে পা দিলেই মৃত্যু। তাই সাধু শাস্ত্র গুরু ভগবান—এঁরা দাঁড়িয়ে থেকে সাবধান করে দেন। কবির কথার বলতে হয়—

ওপথে যেওনা ফিরে এস বলে
কানে কানে কত কয়েছ।
আমি তবু চলে গেছি ফিরায়ে আনিতে
আমার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছ।
চির অপরাধী পাতকীয় বোঝা
নিজ হাতে তুমি বয়েছ।
আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে
আমায় কোলে টেনে তুলে নিয়েছ॥

আমরা তো গৃহান্ধকূপে পড়ে গিয়েছি। এখন তার থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ? কথায় বলে 'আছে বস্তু লয়ে বিচার' আর কোন উপায় নেই। 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' বলে চিৎকার করতে হবে। 'হা গোবিন্দ তুমি রক্ষা কর, হা গোবিন্দ উদ্ধার কর' বলে নিরন্তর ডাকতে হবে। ভগবান নিজেও এই উপায় বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।
—গীতা ৭।১৪

আমরা বিষয়ভোগরূপ কুপথ্য নিত্য সেবা করি। তাই ভজন কিছু করলেও তাতে ফলোদয় হয় না। রোগী কুপথ্য করলে ওষুধে কোন ফল হয় না। ভজন-খাদ্য খেলে আত্মা পুষ্ট হয়। ভজন করলেও ফল কিছু পাওয়া যায় না কেন? তাহলে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কুপথ্য করা হয়। ভজন করলে তার ফল তো পাওয়া যাবে। ষড়রিপু ক্রমশঃ দমিত হবে। লক্ষণ তো চাই। তা না হলে ভজন হচ্ছে কেমন করে বুঝা যাবে? কুপথ্য বেশী আছে বলেই ফল হয় না। অবধূত বললেন—

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূর্খঃ।
প্রলোভিতাত্মাহ্যুপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ।

—ভাঃ ১১।৮।৮

অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তিরা মায়ার তৈরী স্ত্রী, স্বর্ণাভরণ, বসন প্রভৃতি দ্রব্যে ভোগ্য বুদ্ধি করে এবং তাতে লুব্ধ হয়ে তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তার ফলে পতঙ্গের মত বিনাশ পায়। পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে লুব্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়।

এখানে অবধূতজী আমাদের মূর্খ বললেন। আমাদের মূর্খতা কোথায়? ঐন্দ্রজালিক যেমন তার ইন্দ্রজাল দিয়ে লোকদের মুগ্ধ করে মহামায়া তেমনি মায়ার জাল দিয়ে সব জীবকে মুগ্ধ করে। ঐন্দ্রজালিক আমড়ার আঁটিকে পাখী করে আর সত্ত্ব রজঃ তম—এই তিন কাঠির পাখী—মায়াও এই পাখী দিয়ে জগৎকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। মানুষের রূপ যার প্রতি আসক্তি তার প্রকৃত পরিণতি হল ভস্ম, কৃমি অথবা বিষ্ঠা। নিরন্তর এ বিচার করলেও নিরন্তর এ ভুল থেকে যায়। এর থেকে অব্যাহতি চাইতে হলে মায়াধীশের পাদপদ্ম ভজন করতে হবে। জীবের এ ভুল অনাদি। জীবের স্বরূপ হল জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। জীব তার স্বরূপ ভুলেছে, তারও আগে ভগবানের পাদপদ্ম ভুলেছে। ভগবানকে ভোলার অপরাধে মায়া তাকে দণ্ড দিচ্ছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুখ॥ —চৈতন্যচরিতামৃত

জন্ম, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ, শোক, ভয়, মোহ—এ জীবকে নিরন্তর

কষ্ট দিচ্ছে। এই গৃহাসক্তি দেহাসক্তি ভুলে, তাকে ত্যাগ করে নিজালয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে জীবের যেতেই হবে। বালিকা যেমন পুতুল ফেলে দিয়ে সত্যকার ছেলেমেয়ের কাছে যায়—তেমনি জীবও তার একান্ত প্রিয় ভগবানের কাছে গেলে জগৎকে বিনা ক্লেশে ফেলেই যাবে। ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত মায়ার দেওয়া দণ্ড। পরের ঘরে বাস যতই ভাল ঘর হোক্ ভাল লাগে না। বিবাহিতা বালিকার যেমন বাপের বাড়ী ভাল লাগে না—নিজের ঘরে যাবার জন্য অস্থির হয়, দীক্ষিত সাধকেরও তেমনি এ মায়ার সংসার ভাল লাগে না। নিজালয় কৃষ্ণপাদপদ্মে যাবার জন্য উন্মুখ হয়। মায়া জীবকে দণ্ড দিচ্ছে। দণ্ডের চেহারা হল—

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ —চৈতন্যচরিতামৃত

নিমাই পণ্ডিতের উক্তি আছে—

গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর।
সব পূজা ছাড়ি মোর পূজা কর॥

গোপকুমারকে প্রকৃতি (মায়া) প্রলোভন দেখিয়েছিলেন—আমাকে পূজা কর। আমি ভগবানের শক্তি, দাসী, ভগিনী। স্বর্গভোগের স্থান সেখানে মায়া ওঠায় আবার নরকে ডুবাবে বলে। চিৎকণ জীব—তাকে মায়া কিভাবে দণ্ড দেবে? এ দণ্ড দেবার কৌশল কি? অগ্নি কণা হলেও কাঠ তাকে ভয় করে। কারণ অগ্নির সঙ্গে কাঠের দাহ্য দাহক সম্বন্ধ। অগ্নি কণা হলেও দাহক আর কাঠ বেশী হলেও দাহ্য। তেমনি জীব দাহক আর মায়া দাহ্য। জীবকে মায়া ভয় করে। সেই মায়া জীবকে কি করে দণ্ড দেবে? মায়া জীবের একটি ছিদ্র পেয়েছে। জীব কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুলেছে—এই অপরাধে এই ছিদ্রপথে মায়া চোর তার ঘরে ঢুকেছে। মায়ার কৌশল কি? অস্মৃতি এবং বিপর্য্যয়—এই দুটি হল মায়ার দেওয়া দণ্ড। কি ভুল হওয়াতে জীবের অস্মৃতি হল? স্মৃতি কি ছিল? স্মৃতি ছিল জীবের আত্মজ্ঞান। জীব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। এই স্বরূপকে সে হারাল মায়া আক্রমণের ফলে। এই আমি বোধ

হারানোর ফলে জীবের অস্মৃতি ঘটল। জীবের এই বিমুখতা রূপ দুর্ব্বলতার ফলে এর পরে বিপর্য্যয় ঘটল এবং এই বিপর্য্যয়ের ফলে দ্বিতীয় বস্তুকে অর্থাৎ আত্মা অতিরিক্ত প্রথম দ্বিতীয় বস্তু দেহকে আমি ও দৈহিক বস্তুকে আমার বলে বুদ্ধি হল। আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুতে আত্মবুদ্ধি হল। জীবের অনাদি কৃষ্ণবিমুখতা দোষে মায়া জীবের কাছে অস্মৃতি ঢুকিয়েছে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লোপ করিয়েছে। অস্মৃতির ফলে বিপর্য্যয় অর্থাৎ অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধি অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। এটি তো সত্য ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু এখন উপায় কি? মায়া জীবকে নিজের অধীন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এর চিকিৎসা কি? নিদান জানলে তবে চিকিৎসা হয়। বিমুখতা যদি নিদান হয় তাহলে উন্মুখতাই হবে চিকিৎসা। উন্মুখতার বাধকই তো প্রকৃত বাধক। মায়া জীবের অস্মৃতি ঘটিয়েছে কিন্তু নিজে যে দাস্য এটিও মনে আছে এবং তার জন্য তার ভয় আছে। তাই মায়া জীবকে কবলিত করলেও আবার জীবকে তুষ্টি দান করবার জন্য চেষ্টা করে। জীবের জন্য তাই নব নব বিষয়ভোগ তৈরী করছে। এই কথাটিই নাম করে করে অবধূত বললেন—স্ত্রী, স্বর্ণাভরণ প্রভৃতি। যে ব্যক্তি মায়ার এই সামগ্রীতে মুগ্ধ হয় সে মূর্খ তো বটেই। আচার্য্য শঙ্করও বলেছেন—মূঢ় জহিহি ধনাগমতৃষ্ণা। হে মূঢ় (মূর্খ) ধনাগমের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর।

বস্তু থাকবে কিন্তু ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করতে হবে। অবধূত বললেন ‘পতঙ্গবৎ নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ।’ জ্ঞান নাশ হয়ে ভ্রষ্ট হয়। গীতাবাক্যে ভগবান বলেছেন—

স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। —গীতা ২।৬৩

এখন প্রশ্ন হতে পারে জীব তো নিত্য, তার বিনাশ কেমন করে হয়? এখানে ভগবৎবিমুখতাই হল মৃত্যু। বলাও আছে তাই—

মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।

রাজার ছেলে যদি পাগল হয়ে যায় সেইটিই তার মৃত্যু। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই বোধ ভুল হওয়ার নামই মৃত্যু। অন্ধকারের দিকে যত

এগুনো যাবে সূর্য্যের থেকে তত দূরে সরে যাওয়া হবে। তেমনি মায়ার দিকে যত এগুনো যাবে ভগবানের কাছ থেকে তত দূরে সরে যাওয়া হবে। মায়ার দিকে এগুনো মানে দুঃখ আর ভগবৎভজনামৃত পরম সুখময়। কিন্তু আমরা তো মায়ার সংসারে পড়ে গেছি, এখন উপায় কি ? যার মায়ায় এই অঘটন ঘটেছে তার থেকেই রেহাই পেতে হলে যার মায়া তাকে ভজতে হবে। ভগবান বলেছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

—গীতা ৭।১৪

সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ দিয়ে তেখিয়ে সূতো দিয়ে শক্ত করে জাল তৈরী করা হয়েছে যে জাল জীববন্ধনে পটু। জীবপাখী তাতে পড়বে, ছট্‌ফট্ করবে, জাল ছিঁড়তে পারবে না। এই জাল ছিঁড়বার একটাই পন্থা—কাতর প্রাণে 'আমায় উদ্ধার কর' বলে ডাকতে হবে। শ্রুতি বললেন—

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ —শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

সাধু গুরু বৈষ্ণব শাস্ত্রের উপদেশে কাজ হয়। তেতাস খেলায় যেমন তাদের নিজেদের দলের লোকই হারে বা জেতে ভগবানও তেমনি তাঁর নিজজন দিয়ে শিক্ষা দেন। অবধূতের শিক্ষা জীবনে গ্রহণ করতে পারলে কাজ হবে। ৫-৮

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্ত্তেত যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥ ৯
অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥ ১০
সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্লীত ভিক্ষিতং।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী॥ ১১
সায়ন্তনং শ্বন্তনং বা ন সংগৃহ্লীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্লন্ সহ তেন বিনশ্যতি॥

বঙ্গানুবাদ

মধুকরের নিকট শিক্ষা—যতদিন দেহ জীবিত থাকবে ততদিন মুনি ব্যক্তি অল্প অল্প গ্রাস গ্রহণ করবেন। কোন প্রাণী হিংসা না করে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে থাকবেন। ৯

ভ্রমর যেমন নানা কুসুম থেকে সার মধুটুকু আহরণ করে তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র থেকে সার গ্রহণ করবেন। ১০

মধুকর দুই প্রকার—এক ভ্রমরজাতি আর দ্বিতীয় মধুমক্ষিকা। ভ্রমরের কথা বলা হল এখন মধুমক্ষিকার কাছে শিক্ষা—মুনি ব্যক্তি ভিক্ষার সংগৃহীত অন্ন পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করবেন না। হস্তমাত্র বা উদরমাত্র পাত্র করে জীবন নির্ব্বাহ করবেন—তবু মক্ষিকার মত সঞ্চয়ী হবেন না। ১১

ভিক্ষুক ভিক্ষার অন্ন (আহার্য্য) ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করবেন না, যদি করেন তাহলে মক্ষিকার মত আহার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনাশ পাবেন। ১২

এর পরে অবধূতজীর আর একজন গুরু হলেন মধুকৃৎ অর্থাৎ ভ্রমর—যে ফুলে ফুলে ঘুরে একটু একটু করে মধু গ্রহণ করে। পরমার্থ পথের পথিক সবাই। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী সকলেই। এখন কথা হচ্ছে অবধূতজীর এই বাক্য কার পক্ষে প্রযোজ্য? তার উত্তরে

বলা যায় মুনির পক্ষেই প্রযোজ্য। মুনি মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করে থাকবেন। অবধূতজী বললেন—

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহ বর্ত্তেত যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥ —ভাঃ ১১৷৮৷৯

যতদিন এই দেহে থাকা হবে ততদিন মুনি অল্প অল্প গ্রাস অর্থাৎ আহার গ্রহণ করবেন—কোন গৃহস্থকে হিংসা করবেন না। মধুকর যেমন প্রতি পুষ্প হতে অল্প অল্প মধু আহরণ করে। এই মাধুকরী বৃত্তি মুনি অবলম্বন করবেন।

দেবর্ষিপাদ নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—'যাবৎ ভ্রিয়েত জঠরম্'—যতক্ষণ উদরপূর্ত্তি না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, তার বেশী নয়। মুনি যদি কিছু জোগাড় করে সঞ্চয় করতে যান তাহলে তার দণ্ড হবে। গৃহস্থের বৃত্তিকে গার্হস্থ্য ধর্ম বলা হয়েছে। ভাগবত কাজে লাগানই হল শ্রবণের ফল। হরিনাম শুনে কাজ হচ্ছে কিনা বুঝা যাবে কেমন করে? হরিনাম জিহ্বায় উচ্চারণ করতে হবে। তবে বুঝতে হবে শোনার ফল হচ্ছে। চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করতে সুবিধা পান যদি রোগী তার রোগের অবস্থা খুলে বলে। মুনি কখনও সঞ্চয় করবেন না। এর থেকে ধ্বনি উঠছে গৃহী সঞ্চয় করবেন। গৃহীর পক্ষে সঞ্চয় দরকার। কিন্তু নারদ যে গৃহস্থ ধর্মের হিসাব দিয়েছেন তাতে নারদের বাক্য তো সঞ্চয়ের বিরোধী। কিন্তু গৃহস্থের সঞ্চয় না থাকলেও তো হবে না। কথা হল গৃহস্থ তার সঞ্চিত অর্থ নিজের বলে ভাববেন না। তাঁর মনে সব সময় এই ভাব থাকবে—সঞ্চিত অর্থ আমার নয়, ভগবানের। যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিতরণ করবেন। সাধুর বৃত্তি কিন্তু সঞ্চয় নয়। ত্যাগী যিনি তিনি গৃহস্থের দরজায় দরজায় ঘুরবেন মধুকরের মত অল্প অল্প গ্রাস গ্রহণ করবেন। উদরভরণের প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্য এবং এই বেঁচে থাকাও ঈশ্বর আরাধনার জন্য। সাধুর প্রতি উপদেশ হল মাধুকরী বৃত্তি করে জীবিকানির্ব্বাহ করা। স্থূলভিক্ষা করা উচিত নয়। গৃহস্থকে পীড়া না দিয়ে মাধুকরী গ্রহণ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এক জায়গায়

যদি মুনি বেশী করে পেয়ে যান তাহলে কি নেবেন না ? না, নেবেন না। ভ্রমর যেমন চঞ্চল, একটু খেয়ে চলে যায় মুনিও তেমনি এক এক গৃহস্থের দরজায় এক এক গ্রাস নিয়ে চলে আসবেন। ভ্রমরের মনের এই চঞ্চলতা ঈশ্বরের কৃপা। শ্রীস্বামিপাদ এবং চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেছেন—এক জায়গায় বেশী মধু নিতে গেলে আটকে যাবে। মুনিও যদি এক গৃহস্থের বাড়ীতে বেশী নিতে যান তাহলে গৃহস্থের প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়ে যাবে। তাতেই তার বিনাশ। লালাবাবুর বৈরাগ্য ও মাধুকরী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অভিমান ত্যাগের জন্যই মাধুকরী গ্রহণের ব্যবস্থা। লালাবাবুর গুরুজী তাঁকে দীক্ষা কিছুতেই দেন না। কেবলই বলেন দেরী আছে। লালাবাবু ভাবেন, 'আমার বৈরাগ্য তাহলে এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।' অবশেষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শেঠজীর বাড়ীতে যখন ভিক্ষা করতে গেলেন তখন প্রচুর দ্রব্য তাঁর মাধুকরীর জন্য শেঠজীরা দিতে চাইলে লালাবাবু বললেন,—'এই ঝুলিতে তো এক মুঠির বেশী ধরবে না।' এমন সময় গুরুজী এসে বললেন, 'এতদিনে তোমার দীক্ষার লগ্ন উপস্থিত হয়েছে।' সৌভরি মুনির যে বিষয়ভোগ এ সব তাঁদের আচরণ নয়—এ সবই জীবশিক্ষার জন্য। বেদাদি কত কত ছোট বড় শাস্ত্র আছে তামসিক রাজসিক শাস্ত্র, অণু মহৎ পারমার্থিক শাস্ত্র—প্রত্যেক পুষ্পের কাছ থেকে সার অর্থাৎ মধু সংগ্রহ করে নেবে। কোন্ পুষ্প কেমন তা বিচার করবে না। অনেক পুষ্প তাই বহুবচন দেওয়া হয়েছে। কোনও পুষ্পে কটাক্ষ করবে না। ভ্রমরের পক্ষে তো পুষ্প এবং সার হল মধু কিন্তু মুনির পক্ষে কি ? মুনির পক্ষে পুষ্প হল শাস্ত্র আর সার হল গোবিন্দভজনের অনুকূল বাক্য। মধুকর যেমন মধুচক্র তৈরী করে মুনিরাও তেমনি শ্রীমদ্ভাগবত মধুচক্র তৈরী করে রেখে গেছেন। আচার্য্য বেদব্যাস নিজেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রশংসা করে বলেছেন—নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রকে সর্ব্বশাস্ত্রের সার বলা হয়েছে—

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।

বৃক্ষের তাৎপর্য্য হল ফলে। তেমনি বেদকল্পতরুর তাৎপর্য্য হল ভাগবত

ফলে। কোন্ গাছের কোন্ ফল চেনা না থাকলে ফল দেখলেও সেই ফলের কোন্ গাছ তা চেনা যায় না। বেদ হলেন কল্পতরু এবং তার ফল হলেন শ্রীমদ্ভাগবত। গাছ এবং ফল একসঙ্গে এক ব্রহ্মাই দেখেছেন আর কেউ দেখে নি। গৃহস্থের বাড়ীতে যে যাই খরচ করুক না কেন সব যেমন গৃহস্বামীর টাকা তেমনি সব শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বেদ।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরা ক্রিয়াঃ॥

—ভাঃ ১।২।২৮

বেদ পরোক্ষবাদসম্পন্ন। ব্রহ্মা বেদবক্তা কিন্তু বেদজ্ঞ নন। কারণ ব্রহ্মার বুদ্ধি কর্মেতে আসক্ত। তাই তাঁর বেদে জ্ঞান হয় নি। ভগবান বলেন ব্রহ্মা হলেন কর্মধী অর্থাৎ কর্মেতে তাঁর বুদ্ধি আসক্ত। তাই তাঁর ওপর সৃষ্টিকাজের আদেশ আসে। কিন্তু তিনি যদি সব ছেড়ে আমার পাদপদ্ম ভজেন তাহলে তাঁর ওপর আর আদেশ হয় না। অহং থাকলেই আদেশ আসে। ক্রীতদাসের যেমন নিজের স্বাতন্ত্র্য নেই সেইভাবে সর্ব্বদা আত্মসমর্পণ করতে হবে। ব্রহ্মার কর্মাসক্তি আছে তাই আদেশ করা হয়। সমগ্র বেদের সারাংশ হলেন শ্রীমদ্ভাগবত। সন্তানদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে যেমন গৃহস্বামীর অবস্থা অনুমান করা হয় তেমনি বেদের তাৎপর্য্য সর্ব্বশাস্ত্রেই পাওয়া গেলেও ভাগবতে তার সার বলা হয়েছে—অর্থাৎ ভাগবতেই বেদের তাৎপর্য্য সবচেয়ে বেশী করে বুঝা যায়। শ্রীবৃহৎভাগবতামৃত গ্রন্থে উত্তরা-পরীক্ষিৎ সংবাদে মাতা উত্তরাদেবী পুত্র মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে ভাগবত সারাংশ চেয়েছেন। ক্ষীরসাগর মন্থন করে যেমন অমৃত উঠেছিল তেমনি শ্রীমদ্ভাগবত হলেন ক্ষীরসাগর, মা বলছেন,—তোমার বুদ্ধিকে মন্থনদণ্ড করে ভাগবতরূপ ক্ষীরসাগর মন্থন করে যে প্রেমামৃত উঠবে তাই আমাকে দাও। পুত্রের রোজগার তো মা পায়। শ্রীমদ্ভাগবতের সারাংশ হল গোপীপ্রেম। মন্থন করতে যেটুকু সময় লাগে সেইটুকু সময় লেগেছে গোপীপ্রেম দিতে। ভাগবত-সারাংশ নিপুণধী হয়ে গ্রহণ করবে।

এর পরে অবধূতজী আরও দু'প্রকার মক্ষিকা গুরুর কথা বললেন। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—দু'প্রকার মক্ষিকা—এক হল অসংগ্রহশীল আর একপ্রকার সংগ্রহশীল। দুইপ্রকার মক্ষিকার কাছে দুইপ্রকার শিক্ষা। যদুমহারাজের পক্ষে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ প্রশ্ন করেছেন, মুনি যে উদরভরণ করবে কোন্ পাত্র গ্রহণ করবে ? তার উত্তরে বলছেন—কোন পাত্রের প্রয়োজন নেই। হাতে করে এনে উদরে রাখবে। যেমন মক্ষিকা সংগ্রহ করে কিন্তু নিজে ভোগ করতে পারে না। মধুর সঙ্গে মক্ষিকাও বিনষ্ট হয়। মুনিও তেমনি অন্ন সংগৃহীত করলে অন্নের সঙ্গে তারও মৃত্যু হবে। সুতরাং মুনি কোন পাত্র গ্রহণ না করে করপাত্রে উদর ভরণ করবে। ৯-১২

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ॥ ১৩
নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ।
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা॥ ১৪
ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতং।
ভুঙ্ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু॥ ১৫
সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্॥ ১৬
গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ।
শিক্ষেত হরিণাদ্বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ॥ ১৭
নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাং।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ

স্পর্শ বিষয়ে আসক্তি যে বিনাশের হেতু এটি গজের নিকট শিক্ষা পেয়েছেন। ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) কাঠের তৈরী যুবতী মূর্ত্তিকে চরণ দিয়েও স্পর্শ করবেন না। যদি স্পর্শ করেন তাহলে হস্তিনীর স্পর্শে হস্তী যেমন মুগ্ধ হয়ে গর্ত্তে পড়ে বিনাশ পায় তাঁরও সেইরূপ হবে। ১৩

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও কোন স্ত্রীলোকে আসক্ত হবে না। যদি হয় তাহলে একটি গজ যেমন অন্য গজের দ্বারা বিনাশ পায় সেইরকম বলবান পুরুষ দ্বারা নিহত হবে। ১৪

হে মহারাজ! যে অর্থ সঞ্চয়ে দান বা ভোগ হয় না তা অন্যে গ্রহণ করবে এ বিষয়ে মধুহা অর্থাৎ মধুমক্ষিকার কাছে শিক্ষা পেয়েছি। যে লোভে পড়ে অতিকষ্টে অর্থ সঞ্চয় করে অথচ দান বা ভোগ করে না তার সঞ্চিত ধন অন্যলোকে এসে ভোগ করে। যেমন মধুমক্ষিকা মধু সংগ্রহ করে কিন্তু অন্যলোকে তা ভোগ করে। ১৫

গৃহসর্ব্বস্ব এবং নিজের কল্যাণকামীর দুঃখে উপার্জ্জিত অর্থ মধুহা

অর্থাৎ ভ্রমরের মত সন্ন্যাসী ব্যক্তি প্রথমে ভোগ করবে। ১৬

হরিণের নিকট শিক্ষা—বনচর সন্ন্যাসী ভগবদ্গীত ছাড়া কখনও গ্রাম্যগীত শুনবে না। ব্যাধের গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে হরিণ যেমন আবদ্ধ হয় তারও সেইরকম অবস্থা হবে। ১৭

এই প্রসঙ্গে হরিণীপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকেও গুরুপদে গ্রহণ করেছেন। কারণ ঐ মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীলোকের ক্রীড়ায় মুগ্ধ হয়ে তাদের বশীভূত হয়েছিলেন। ১৮

এর পরে অবধূতজীর গুরু হলেন গজ। গুরু যখন তখন উপদেশ দেন নিশ্চয়ই। গজ কি উপদেশ দেন? স্পর্শশক্তি বিনাশের কারণ। এখানে স্পর্শ বলতে পুত্রস্পর্শকে বুঝাবে না। স্ত্রীর পক্ষে পুরুষের স্পর্শ এবং পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের স্পর্শই বুঝাবে। 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি।' স্ত্রীপুরুষ স্পর্শ সম্বন্ধেই এখানে বলা হয়েছে। উদ্ধবজীকে বলছেন ভগবান শ্রীগোবিন্দ নিজে যদুমহারাজের সঙ্গে অবধূতজীর এই প্রসঙ্গটি। উদ্ধবজী তো শাস্ত্রবিদ্। তাঁকে আবার উপদেশ দেবার কি প্রয়োজন? কিন্তু ভগবান সেখানে বক্তা। ভগবানের মত উপদেষ্টা যেখানে সেখানে উদ্ধবের বোকা সাজতে ইচ্ছা করে। শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূতবাক্য স্থান পায় নি। কিন্তু অবধূতপ্রসঙ্গ যা শ্রীকৃষ্ণজী শ্রীমান্ উদ্ধবকে বলেছিলেন সেটি স্থান পেয়েছে। আচরণেই বুঝায়। মুখে বলা কিছু কাজের হয় না। ঈশ্বরের বাক্যই পালনীয়। আচরণ পালনীয় নয়। যদি কোথাও আচরণ বাক্যের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে সে আচরণ পালনীয় নতুবা নয়। নিজে আচরণ করে কথা বললে সে কথার দাম হয়। উপদেশমত আচরণ হলে সে আচরণ নেওয়া চলে। আচরণ হল লোক-ব্যবহার। সত্য অর্থাৎ পাল্য। উপদেশবাক্যের সঙ্গে যে আচরণের মিল আছে সেই আচরণ গ্রহণ করবে। অন্য আচরণ নেবে না। চাণক্যবাক্য আছে—ন দেবচরিতং চরেৎ। চাণক্য অবশ্য এখানে 'দেব' বলতে রাজাকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু 'দেব' শব্দটি এখানে ব্যাপক। কাজেই

'দেব' শব্দটি ভগবানে গিয়ে লাগবে। অণুচৈতন্য জীব, বিভুচৈতন্য ঈশ্বর। জীব মায়াবশ আর ঈশ্বর হলেন মায়াধীশ। দুজনের পৃথক লক্ষণ। ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীবকোটিতে পড়েন। কারণ তাঁরও গতাগতি আছে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

—গীতা ৮।১৬

এরা সকলেই অনীশ্বরের পর্য্যায়ে। জীব ব্রহ্মা হয়। বলা আছে কোন মানুষ যদি শতজন্ম স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে থাকে তাহলে সে ব্রহ্মার পদ পেতে পারে।

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি।

মহাজন গর্হিত আচরণ করলেও আমরা কটাক্ষ করতে পারব না। কটাক্ষ করা তো দূরের কথা এমনও বলা আছে 'নিন্দার আছুক দায় হাসিলেও মরি।' ব্রহ্মাকে নিজ কন্যার প্রতি ধাবিত হতে দেখে মরীচিপুত্রগণ হেসেছিলেন তার ফলে তাদের পতন হল। সমুদ্র বিষ থেকে জগৎ রক্ষা করা প্রভুর কর্ত্তব্য। বিষ পান করেও শিব মৃত্যুঞ্জয়ী। অনীশ্বর অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর নন তিনি কখনও মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারবেন না। অবধূত বললেন—'স্পৃশন্ করী ইব।' সন্ন্যাসী ব্যক্তি চরণ দিয়ে কাঠের স্ত্রীমূর্ত্তিকেও স্পর্শ করবে না। যদি স্পর্শ করেন তাহলে করিণী অর্থাৎ স্ত্রী হাতী যেমন পুরুষ হাতীর স্পর্শে অঙ্গসঙ্গে মুগ্ধ হয়ে গর্ত্তে পড়ে প্রাণ হারায় তারও সেইরকম অবস্থা হবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের মৃত্যুস্বরূপ কোনো স্ত্রীলোকে আসক্ত হবে না। যদি হন তাহলে যেমন অন্য গজের দ্বারা অন্য গজ বিনষ্ট হয় সেইরকম বলবান পুরুষের দ্বারা নিহত হবে।

এর পর অবধূতজী আর একজনকে গুরুপদে বরণ করছেন—তিনি হলেন মধুহা। অর্থাৎ মধুমক্ষিকার মধুক্রম থেকে যিনি মধুগ্রহণ করেন তাঁকে অবধূত গুরু করেছেন। তাঁর কাছে কি শিক্ষা? যে লোভী ব্যক্তি অতিদুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে অথচ দান বা ভোগ করে না তার সঞ্চিত ধন অন্য লোকে এসে ভোগ করে। যেমন মক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে

কিন্তু সে নিজে ভোগ করতে পায় না, অন্য লোকে এসে তা গ্রহণ করে নেয়—এও সেইরকম।

এ বিচার কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে। সন্ন্যাসীর ধনসঞ্চয় নিষিদ্ধ। গৃহস্থের কিন্তু নিঃস্বতা দুঃখের কারণ। গৃহীর সঞ্চয়ের হিসাব আছে। গৃহস্থের সঞ্চয়ের অগ্রভাগ সন্ন্যাসী ভোগ করবে। সন্ন্যাসীর জন্য গৃহস্থ মুষ্টিভিক্ষা রাখবেন। গৃহস্থ পক্ক অন্ন সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীর জন্য রাখবেন। গৃহস্থ যদি তা না দেন তাহলে তাঁকে চান্দ্রায়ণ করতে হবে। সঞ্চয়ের সময় গৌরগোবিন্দ বলে রাখতে হবে। মাধুকরী দান করতে হবে। এইটিই সন্ন্যাসী পালনের বিধি। ঋষি হলেন সত্যদ্রষ্টা। কায়মনোবাক্যে তাঁরা কখনও মিথ্যা বলেন না। সব ছেড়ে গোবিন্দ ভজতে হবে। সন্ন্যাসীর ভজনের আনুকূল্য করতে হবে। যাঁরা সব ছেড়ে ভজন করছেন তাঁদের কৃপা সঞ্চয় করতে হবে। তাহলে তাঁরা তাঁদের ভজনের অংশ আমাদের দান করবেন। এর ফলে ভজনের সামর্থ্য মনোবল পাওয়া যাবে।

গৃহস্থ তার আয়ের অগ্রভাগ ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীকে দেবে। সন্ন্যাসী অন্ন বিনা চেষ্টাতেই পান কাজেই অন্ন আহরণের জন্য চেষ্টা করবেন না। যাঁর ওপর ভরসা করে সন্ন্যাসী থাকেন তিনিই তাঁকে রক্ষা করেন। তুলসীদাসজীর পদ আছে—

যো যাঁকো শরণ লয় সো রাখে তেরি লাজ।
উলট জলে মছলি চলে পড়ে গজরাজ।

জলই মাছের প্রাণ মন ধন। কাজেই উজান জলেও মাছ স্বচ্ছন্দগতিতে যাতায়াত করে কিন্তু মহাবলশালী গজরাজও তাতে পড়ে যায়—প্রাণ হারায়। তিনি যে রক্ষা করেন এটি শরণ নেওয়ার তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। তবে এটি নিশ্চিত দেখা গিয়েছে তাঁর চরণে অকপটে শরণ নিয়ে কেউ কখনও ব্যাহত হয় নি। বিপদে তিনি রক্ষা করেনই করেন। এর পক্ষে সাক্ষী আছেন প্রহ্লাদ। শরণ নিলেও তিনি রক্ষা করেন না এই বলে যদি কেহ ভগবানের বিরুদ্ধে মামলা করে তাহলে সে মামলা

টিকবে না। কারণ সাক্ষী দেবেন প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের মত বিপদ তো আর কারো হয় নি। মাটির তলে একুশ দিন পুঁতে রাখা, কারাগারে উপবাসী রাখা, টাটকা বাঘের খাঁচায় ছেড়ে দেওয়া, হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া, পাহাড় থেকে নীচে ফেলা, ফুটন্ত তেলের কড়াতে ফেলে দেওয়া, প্রহ্লাদের বিপদের মত বিপদ কারো হয় নি। প্রহ্লাদ একান্তভাবে যাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছেন তিনিই তাঁকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। মহতের ক্রোধে অশুভ বাসনা আর মহতের অনুগ্রহে শুভ বাসনা হয়। এরই নাম উতি। তা না হলে ভগবানের নিজ জন জয় ও বিজয় দ্বারী—তারা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ অসুর হবে এ তো অসম্ভব। এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে একমাত্র মহতের ক্রোধে। সনকাদি মুনির ক্রোধে বৈকুণ্ঠের চিরদাস আজ ভগবানে বিদ্বেষপরায়ণ হয়েছে। আবার মহতের কৃপায় শুভ বাসনায় উদয় হয়। কশ্যপ মুনির কৃপায় এবং নারদের কৃপায় অসুর বালক হিরণ্যকশিপুর পুত্র হয়েও প্রহ্লাদ ভক্তবীর। দিতির ওপর কশ্যপমুনির ক্রোধ—সন্তান পরসন্তাপক হবে। আবার অনুনয়ের ফলে পরে ক্রোধ শান্ত হলে বললেন—'তোমার নাতির দ্বারে জগতের সন্তাপ কমবে।' নারদমুনির সেবা করে কয়াধু ইচ্ছা প্রসব বর পেলেন। মহতের অনুগ্রহে প্রহ্লাদের মতি গঠন হল। প্রহ্লাদকে দেবর্ষিপাদ নারদের ভাগবতধর্মের উপদেশ বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করেছে। বাবা ভাল না হতেও পারেন কিন্তু মা যদি ভাল হন তাহলে ছেলে ভাল হবেই। প্রহ্লাদ দৈত্যবালকদের কাছে বলেছেন—মা স্ত্রীলোক এবং অনেকদিনের ঘটনা বলে স্মরণ করতে পারেন না কিন্তু আমার স্মরণ আছে এই ভক্তিধর্মের কথা।

তাই সাবধান হতে হবে। মহতের অনুগ্রহ উৎপাদনের চেষ্টা করতে হয়। মহতের ক্রোধ যাতে উৎপন্ন না হয়। এর থেকে সাবধান হতে হবে। গোবিন্দ পরিরক্ষিত দেহ প্রহ্লাদের তাই জহ্লাদের তরবারির আঘাত তাকে কাটতে পারল না। ঠাকুর হরিদাসের ওপর যে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত হয় তা মহাপ্রভু নিজ অঙ্গে ধারণ করেছেন। হরিদাস

ঠাকুরকে প্রহার করতে করতে যখন প্রাণত্যাগ হল না তখন প্রহারকর্ত্তারা প্রমাদ গণলেন। তাঁরা মারতে পারেন নি বলে তাঁদের প্রাণ যাবে শুনে হরিদাস ঠাকুর মৃতপ্রায় হলেন। সদ্‌গতি হবে না মনে করে তাঁকে গাঙে ফেলা হল। ঠাকুর হরিদাস গিয়ে ফুলিয়ায় উঠলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাতপ্রহরিয়াভাবে শ্রীবাস অঙ্গনে নিজের উত্তরীয় খুলে পিঠে চাবুকের দাগ দেখিয়েছেন। অদ্বৈতপ্রভুকে ডেকে মাথায় চরণ দিয়ে নিজের ভগবত্তা প্রকাশ করেছেন। সেইটিই প্রমাণ। কাজেই নিশ্চিন্তে গৌর-ভজন করা যায়। শ্রীধর, হরিদাস সকলকে ডেকে মহাপ্রভু নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে যাকে শরণ নেয় সে তাকে রক্ষা করে। ভগবান গীতাবাক্যে বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

—গীতা ৯।২২

বিপদে যদি তিনি রক্ষা না করেন তাহলে বুঝতে হবে শরণ নেওয়ায় ত্রুটি আছে। মা যেমন করে শিশুকে আগলে রেখে রক্ষা করেন তেমনি করে শিশুর মত শরণ নিলে ভগবানও মায়ের মত রক্ষা করেন। শিশুর মত একান্তভাবে শরণ নিতে হবে। যতির (সন্ন্যাসীর) পক্ষে আহারের জন্য চেষ্টার দরকার নেই। নিশ্চিন্তে সন্ন্যাসী বসে বসে খেতে পারবে। গৃহস্থ তাকে দেবে। কিন্তু কোন্ স্বার্থে দেব। মহৎস্বার্থ দেখলে তবে গৃহস্থ তার কষ্টের রোজগার থেকে কিছু দিতে পারে। গৃহস্থেরও মহৎ স্বার্থ আছে। গৃহী তো নিশ্চিন্ত মনে ভজতে পারে না। যার বিষয় নেই সেও মনে বিষয় টেনে নিয়ে ভোগ করে। শাস্ত্র বলেছেন—

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতি র্ন নিবর্ত্ততে।

মন হল বিষয়ী। বিষয় না থাকলেও মন বিষয় টেনে এনে ভাবে। শাস্ত্র উপদেশ করেন যে হে গৃহী, তোমরা তো নিশ্চিন্তে ভজন করতে পারছ না, উপায় খোঁজ। উপায় হল মহৎকৃপা। মন যদি চঞ্চল হয় যাদের মন ধীর হয়েছে তাদের কথা আলোচনা করতে হবে। যেমন দাস রঘুনাথ,

রূপ-সনাতন প্রভৃতি ভক্তচরিত্র আলোচনা করতে হবে। মনকে অচঞ্চল করবার জন্য কৃপা প্রার্থনা করতে হবে দাস রঘুনাথ রূপ সনাতনের কাছে। গৌরপাদপদ্মে আসক্তি পাবার জন্য কৃপা প্রার্থনা করতে হবে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে। ঠাকুর হরিদাসের কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে হবে নামগ্রহণে রুচি পাবার জন্য। গৃহী যতির ভজনের আনুকূল্য করে যতির কাছে ভগবৎ শরণাগতিরূপ কৃপা প্রার্থনা করবে। এই শরণাগতি দ্বারে হরিভজনের কৃপা পাবে, তাতেই হরিভজনের বল পাবে, ইচ্ছা পাবে, সময় পাবে।

অবধূতজীর পরবর্ত্তী গুরু হলেন হরিণ। গরুড়পুরাণে বলা আছে—

কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গ মীনাদি পঞ্চভিরের পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরের পঞ্চ।

হরিণ গান শুনে মুগ্ধ হয়। ব্যাধের জালে ধরা পড়ে তার মৃত্যু হয়। এটি আমরা প্রত্যক্ষ করি। আমাদেরও যে এইরকম গ্রাম্যবার্ত্তা শুনে মৃত্যু হয় এটি চোখে দেখতে পাই না বলে বিশ্বাস করি না। শাস্ত্রবাক্যকে মিথ্যা বলা যাবে না। কারণ আমাদেরও মৃত্যু হয়। ছ ঘণ্টা প্রাকৃত গান শুনলাম। কিন্তু কই মৃত্যু হল বলে তো বুঝলাম না। কিন্তু ঠিক বিচার করে দেখতে গেলে দেখা যাবে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু কাকে বলে? মৃত্যু হল অত্যন্ত বিস্মৃতি। মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।

সা হানিস্তৎ মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ॥

মৃত্যু শুধু দেহত্যাগ নয়। ভগবৎপাদপদ্মবিস্মৃতির নামই মৃত্যু। হরিণ তো শুধু গান শোনে কিন্তু প্রাণে মরে। আর আমাদের যে স্বভাবতঃ অজ্ঞানতা আছে প্রাকৃত বিষয় বার্ত্তা গ্রহণের পর তাতে আরও একটি আবরণ পড়ে। রাজার ছেলে যদি মুচির ঘরে ভিক্ষা করে খায় তাহলেই তো তার মৃত্যু। প্রাণে বেঁচে থাকলেও তার মৃত্যুই বলতে হবে। আমরা তো ভগবানকে ভুলে আছি। কাজেই এইটিই আমাদের মৃত্যু। জীব তো অমৃতের পুত্র—'শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' জীবেরও 'জীব নিত্য

কৃষ্ণদাস'—এই স্বরূপবোধটি ভুল হয়েছে। তাই তার ব্যবহারিকতার মৃত্যু হয়েছে। ভগবদ্বিমুখতারূপ অপরাধটি জীবের নিজের কৃত। এ অপরাধ যদি তার না হয় তাহলে মায়া তার গলায় বাঁধত না। জীবের সত্তা যেমন অনাদি, জীবের বিমুখতাও তেমনি অনাদি। শ্রীকবিযোগীন্দ্র বলেছেন—'ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ' প্রথমে জীবের অস্মৃতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লোপ—স্বরূপ বিস্মৃতি। জীব যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব এটি জীবের ভুল হয়ে গিয়েছে মায়ার আক্রমণে। জীব যে জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা রোগ শোক ভয় মোহের অধীন নয় এটি জীবের আর মনে নেই—এই স্বরূপবিস্মৃতির ফলে মায়ার দেওয়া পরবর্ত্তী চাবুক বিপর্য্যয় অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্তবস্তুতে আত্মবুদ্ধি। যেটি যা নয় তাকে তাই মনে করার নামই হল বিপর্য্যয়। শ্রীপ্রেমানন্দদাসজীর পদ আছে—

যে দেহ আপর জ্ঞানে যত্ন কর রাত্রিদিনে
বসন ভূষণ কত বেশ।
পরমাত্মা ভগবান যবে হবেন অন্তর্ধান
ভস্ম কীট কৃমি অবশেষ॥

দেবসংজ্ঞিত দেহ হলেও অর্থাৎ এই দেহের নাম ভূদেব, নরদেব যাই হোক না কেন দেহের পরিণতি কিন্তু হয় ভস্ম না হয় কৃমি কীট না হয় শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য। সুতরাং এই দেহের যত্ন করে কি লাভ? বৈকুণ্ঠে থাকাই জীবের স্বভাব। যে বৈকুণ্ঠধাম সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে যেখানে বস্তু মেলে—এমন যে বৈকুণ্ঠধাম সেই বৈকুণ্ঠপার্ষদও যে গোলোকাধীশের সন্ধান পায় না তার দাস হল জীব। আমরা কোন দুর্দৈববশে কোন অচিন্তিতপ্রভাবে মায়িক জগতে এসে পড়েছি। সম্রাটের পুত্র আমরা মুচির ঘরে পড়েছি। সম্রাটের পুত্র যদি মুচির ঘরে ভিক্ষা করে খায় যারা তাকে সম্রাটের পুত্র বলে চেনে তাদের তাকে দেখলে দয়া হয়। তেমনি সম্রাটের পুত্র জীব আজ কতভাবে মায়ার সংসারে ঘুরছে—পিতা, মাতা, ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত, পশু, পাখী, কৃমি কত ভাবে মায়ার দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। সাধু শাস্ত্র গুরু এঁরা দয়ালু, এঁরা জীবের

স্বরূপ জানেন—তাকে সম্রাটের পুত্র বলে জানেন তাই জীবের দুঃখে তাঁরা দুঃখী হন। মহাজন কাতর প্রাণে বুকফাটা আর্ত্তনাদ করেন—ভাইরে তোদের পায়ে পড়ি—বল বল ভাই গৌর বল। আর কিছু লাগে না ভাল। জীব উদ্ধারের জন্য সাধুদের দয়ালুতারই গরজ। শাস্ত্রের অনুশাসনে তাই সর্ব্বত্র দয়ালুতারই প্রকাশ। শাস্ত্র তিরস্কারই করুক আর মহিমাই প্রকাশ করুক দুটিই দয়ালুতা। যেমন পিতা স্নেহের সুরেই কথা বলুন আর তিরস্কারই করুন দুইই তাঁর স্নেহের প্রকাশ। তাই সাধু শাস্ত্র, গুরু তাঁদের দয়ালুতার গরজে বললেন—ভজন কর বাবা। আমরা ভজনের প্রণালী বহন করে এনেছি। জীব তখন বলে ভজন করেছে এমন উদাহরণ দেখতে চাই। তাই সাধু নিজে ভজন আচরণ করে জীবকে দেখিয়েছেন। গুরুরূপে ভজন উপদেশ করেছেন। সাধু গুরু শাস্ত্র না হলে জীবের উদ্ধারের আশা ছিল না। সম্রাটের পুত্র বনে হারিয়ে গিয়েছে। তার গায়ে অনেক গয়না—জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি। জীবের গায়ে অনেক গয়না। কামক্রোধাদি ডাকাত জীবকে (সম্রাটের পুত্রকে) ধরে নিয়ে গিয়ে মায়ার রাজ্যে (বনে) ফেলেছে। মায়ার ঘরে দিন দিন জীব বাড়ছে। তার আচরণ শিক্ষা দীক্ষায় বড় হচ্ছে। এমন সময় সর্ব্বজ্ঞ (শ্রীগুরুপাদপদ্ম) রাজার জয় দিয়ে বললেন আমি আপনার পুত্রকে ফিরিয়ে এনে দেব। সর্ব্বজ্ঞের 'জয়' শব্দ উচ্চারণ নিরর্থক নয়। কারণ তাঁর সর্ব্বজ্ঞতার ত্রুটি নেই। সর্ব্বজ্ঞ পুত্র এনে দেবেন সৈন্যসামন্ত কিছু লাগবে না। প্রয়োজন একখানি ছোটো আয়নার (দর্শন—দৃশ্যতে অনেক ইতি দর্শনম্) সম্রাটের পুত্রকে শুধু দেহটাকে নয় পুত্রকে সর্ব্বতোভাবে সম্রাটের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার গরজ সর্ব্বজ্ঞের। সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বজ্ঞতায় সকলের বিশ্বাস হয়েছে। রাজকুমার কেন বিশ্বাস করবে না। রাজকুমার পাছে নিজের স্বরূপ জানতে পারে এইজন্য তাকে এতদিন আয়না দেখতে দেওয়া হয় নি। সর্ব্বজ্ঞ যে রাজকুমারের কাছে আসেন ডাকাত সর্দ্দার অর্থাৎ মায়া এবং মায়ার চর যেন টের না পায়। তাহলে আয়না ভেঙ্গে দেবে। জীবের স্বরূপ দর্শনে দেখলে দেখবে সে নিত্যশুদ্ধ-

বুদ্ধমুক্তস্বরূপ। সম্রাটের রূপের মতই তার রূপ। সম্রাটের রূপগুণের কথা অর্থাৎ ভগবানের রূপগুণের কথা তাই সর্ব্বজ্ঞের মুখে শুনতে তার ভাল লাগে। সর্ব্বজ্ঞের কাছে শুনছে সম্রাটের রূপগুণের কথা। মুখে সম্রাটের কাছে যাব বলছে বটে কিন্তু তখনও প্রকৃতপক্ষে যাবার ইচ্ছা হয় নি। চৌদ্দ ক্রোশ বন অর্থাৎ চৌদ্দ ভুবন পার হতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগবে। কামক্রোধাদি ছয় রিপু পার হতে যে সময় সেই সময় অতিক্রম হয়ে গেলেই বুঝা যাবে মায়া অতিক্রম হয়েছে। সম্রাট তাঁর হারানো পুত্র জীবকে কি করে ফিরে পাবেন? গুরুতত্ত্ব ভগবানের কাছে অঙ্গীকার করলেন আমি তোমার পুত্রকে এনে দেব। ডাকাতের দলে পড়ে রাজকুমার কাঁচা মাংস খায়। মায়ার রাজ্যে পড়ে জীবও তেমনি মায়ার খাদ্য জড় অচিৎ খাদ্য খায়। সর্ব্বজ্ঞ যখন রাজকুমারকে নিয়ে সম্রাটের কাছে যাচ্ছেন তখন কামাদি ডাকাত আবার এসে তাকে ধরেছে। সর্ব্বজ্ঞের আদেশে জীব তখন জ্ঞান অসি দিয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিল। এইভাবে জীব যখন জ্ঞান অসি দিয়ে প্রাকৃত শত্রু কামক্রোধাদি জয় করে তখন সর্ব্বজ্ঞের সঙ্গে গিয়ে রাজকুমার প্রথম রাজধানী দেখল। সর্ব্বজ্ঞ সম্রাটের চরণে পুত্রকে প্রণত করিয়ে পিতাপুত্রের আনন্দমিলন দেখলেন। এইটিই সর্ব্বজ্ঞের লাভ। সর্ব্বজ্ঞের পাওনা বা দক্ষিণা এইটিই—পিতাপুত্রের আনন্দমিলন। সম্রাট পুত্রকে আনতে গেলে পুত্র পেতেন কিন্তু তার দেহটা পেতেন মাত্র, পুত্র পেতেন না। গুরুতত্ত্ব (সর্ব্বজ্ঞ) জীবসন্তানকে কৃষ্ণপাদপদ্মে উন্মুখ করে ভগবানের কাছে নিয়ে আসেন। শ্রীগুরুআনুগত্যে জীবকে একটু একটু করে অভ্যাস করতে হবে। যতটা সময় স্মরণ মননে কাটাতে পারা যায় ততই লাভ। সংসার যে বিষয় থাকলেই হয় তা নয়। বিষয় না থাকলে মনেও সংসার হয়। ভজনের মাত্রা বাড়াতে হবে। মৃত্যু তো অতিক্রম করতে হবে। মায়ার সংসারে থেকে আলাদা থাকা অভ্যাস করতে হবে। ক্রমেই বোধ হবে—কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান। এ জ্ঞানটি হয়েছে জেনেছি মাত্র কিন্তু লোভ হয় নি। লোভ জাগাতে হবে। ভজনের সময় বাড়ালেই

গৌরগোবিন্দে পেঁছুতে দেরী হবে না। যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসী যিনি হবেন তিনি গ্রাম্যগীত শুনবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

গ্রাম্যবার্তা না কহিবে না শুনিবে কভু।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—গ্রাম্যবার্ত্তা শুনবে না—এর থেকে বুঝা গেল ভগবদ্গীতই শুনবে। উদর পূর্ণ করতে হবে। সুস্বাদু অন্নে যদি উদরপূর্তি হয়ে যায় তাহলে আর কদন্নে উদরপূর্ত্তির প্রয়োজন হয় না। হরিকথায় যদি কান পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আর জলসায় যেতে হবে না।

শ্রীঅবধূতজী তাঁর হরিণ গুরুর কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছেন গ্রাম্যবার্ত্তা কখনও কানে শুনবে না। কারণ শব্দের প্রতি আসক্তি হলে সেটিও বিনাশের কারণ হয়। শব্দ শ্রবণে আসক্তি হলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তার দৃষ্টান্ত হরিণ। হরিণকে গুরুপদে বরণ করায় সেই হরিণীপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকেও গুরুপদে বরণ করতে হবে। কারণ ঐ মৃগীসূত ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীলোকের নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ক্রীড়ায় বিমুগ্ধ হয়ে তাদের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন। তার থেকে শিক্ষা প্রাকৃত কথাতে যেন আসক্তি না আসে। তাহলে ঋষ্যশৃঙ্গের মত অবস্থা হবে। যে জন্য রাজর্ষি ভরত তৃতীয় জন্ম অর্থাৎ জড়ভরত জন্মে কারও সঙ্গে কথা বলেন নি। মূক না হয়েও মূকের মত আচরণ করেছিলেন। কারণ কথা হল আসক্তির দ্বার। মহাজন নিজেরা আচরণ করে জীবকে শিক্ষা দেন। রাজর্ষি ভরতের মৃগজন্ম অঙ্গীকার লোকশিক্ষার জন্য। জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন—তোমরা যেন হরি ভজতে গিয়ে কেউ হরিণ ভজ না, তাহলে আমার মত দুর্গতি হবে। ১৩-১৮

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥ ১৯
ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।
বর্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্দ্ধতে॥
তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥ ২০
পিঙ্গলা নাম বেশ্যাসীদ্বিদেহনগরে পুরা।
তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন॥ ২১
সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতী।
অভূৎ কালে বহির্দ্বারি বিভ্রতী রূপমুত্তমম্॥ ২২
মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ।
তাঞ্ছুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্মেনেঽর্থকামুকী॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ

রসবিষয়ে আসক্তি নাশের হেতু। এইটি মীন অর্থাৎ মৎস্যের নিকট শিক্ষা। দুর্জয়া ক্ষোভকারিণী জিহ্বা দ্বারা রসবিষয়ে কখনই মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়। যদি মুগ্ধ হয় তাহলে রসলোভে যেমন বড়িশবিদ্ধ মৎস্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় তারও এইরকম অবস্থা হবে। ১৯

মনীষী ব্যক্তি সাধারণত রসনা ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেন নিরাহার ব্যক্তির রসনার আসক্তিই বাড়ে। কিন্তু পুরুষ যতই ইন্দ্রিয় জয় করুন না কেন যতদিন রসনাকে জয় করতে না পারেন ততদিন তাঁর জিতেন্দ্রিয়তা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু রসনা জয় হলে তবে তিনি সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় হন।

পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যার কাছে নৈরাশ্য শিক্ষা। পুরাকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করত। তার কাছে যা শিক্ষা করেছি তা বলি মহারাজ! আপনি শ্রবণ করুন। ২১

একদিন সেই স্বৈরিণী উত্তম বেশভূষা করে পথিক কান্তকে সঙ্কেত

স্থানে নিয়ে যাবার জন্য সন্ধ্যাকালে বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে রইল। ২২

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। পরে সেই অর্থকামুকা স্বৈরিণী পথের মাঝে পুরুষদের আসতে দেখে এক এক করে সকলের সম্বন্ধেই মনে করতে লাগল—"ইনি ধনবান, ইনি আমাকে ধন দেবেন।" ২৩

আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী।
অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ॥ ২৪
এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্য্যবলম্বতী।
নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত॥ ২৫
তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ।
নির্ব্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ॥ ২৬
তস্যা নির্ব্বিণ্ণচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম॥ ২৭
নির্ব্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ।
ন হ্যঙ্গাজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি॥ ২৮

বঙ্গানুবাদ

সেই সঙ্কেতোপজীবিনী বেশ্যা এইভাবে সকলকে আসতে যেতে দেখতে এবং তাদের নিজের গৃহে আসতে না দেখে মনে করল যে অন্য কোন ধনবান ব্যক্তি এসে আমাকে বহু ধন দান করে ভজনা করবে। ২৪

পিঙ্গলা দুরাশায় বিনিদ্র হয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে একবার করে ভিতরে যায় আবার বাইরে আসে—এইভাবে নিশীথকাল উপস্থিত হল। ২৫

পরে সেই পিঙ্গলার ধনের আশা করতে করতে মুখ শুকিয়ে গেল। দীনচিত্ত হয়ে সুখাবহ চিন্তায় তার হৃদয়ে বৈরাগ্য এসে উপস্থিত হল। ২৬

সেইসময়ে পিঙ্গলা সেই অবস্থায় যা করেছিল বা বলেছিল তা বলছি—শুনুন মহারাজ॥ ২৭

হে রাজন্! বৈরাগ্যই মানুষের আশাবন্ধন ছেদন করে তাই যার বৈরাগ্য হয় নি তার পক্ষে আশাপাশ ছেদন হবার কোন উপায় নেই। ২৮

অবধূতজীর এর পরবর্ত্তী গুরু হলেন মীন। মীন অর্থাৎ মৎস্যের কাছে শিক্ষা করলেন—'রসাসক্তির্নাশহেতুঃ'। রসে আসক্তি রাখা চলবে না—কারণ সেটি বিনাশের কারণ। জিহ্বার লোলুপতায় যে সর্ব্বনাশ হয় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মৎস্য। মৎস্য তার সামনেই অন্যান্য বহু

মৎস্যকে বঁড়শিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখে। কিন্তু সে নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারে না। সে জিহ্বার লালসায় চার (মাছের খাদ্য) গ্রহণ করে বঁড়শিবিদ্ধ হয়ে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবধূতজী বলছেন, মহারাজ! আমি মীনকে দেখে এই শিক্ষাটি তার কাছে লাভ করেছি যে জিহ্বার লালসা রাখা চলবে না। তাহলে মীনের মত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জিহ্বাকে সংযত রাখলে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি—

জিহ্বার লালসে যে বা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

রসনাকে জয় করতে পারলে সব জয় হবে। কারণ লোভই হল সকলের মূল। তাই কথা আছে—

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ সংবরণ॥

শ্রীগোবিন্দ সখা অর্জ্জুনকে বলেছেন—

কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

—গীতা ২।৬২-৬৩

ভগবান বলছেন—কামনা প্রতিহত হয়ে ক্রোধে পরিণত হয়। ক্রোধ থেকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ যাকে বিবেক বলে সেটি নষ্ট হয়। বিবেক নাশ হলে শাস্ত্রাচার্য্যগণ যে উপদেশ দেন তার সংস্কারের স্মৃতি লোপ হয়। স্মৃতিবিভ্রম থেকে মানুষের সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয় এবং বিচারবুদ্ধি নষ্ট হলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়।

তাই মৎস্যের কাছ হতে এই শিক্ষা, অত্যন্ত ক্ষোভকারিণী দুর্জয়া জিহ্বা দ্বারা রসবিষয়ে মুগ্ধ হওয়া চলবে না। মুগ্ধ হলে মীনের মত নিশ্চিত মৃত্যুগ্রাসে পড়তে হবে। জিহ্বাকে যে দুর্জয়া বলা হল তার কারণ কি? টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—রূপ গন্ধ

স্পর্শ শব্দ রস—এই পঞ্চবিষয়ে পাঁচ জন মুগ্ধ। এ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে আছে। তারা হল পতঙ্গ, মধুকর, গজ, হরিণ, মীন। এদের যথাক্রমে নিতে হবে। অর্থাৎ পতঙ্গ রূপে, মধুকর গন্ধে, গজ স্পর্শে, হরিণ শব্দে এবং মীন রসে লুব্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। তাই শাস্ত্র বলেছেন—

কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গমীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।

একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ইতি।

এই পাঁচটি দৃষ্টান্তে দেখা গেল একটি প্রাণীর যদি একটি বিষয়ের লোভে বিনাশ হয় তাহলে মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই যদি লুব্ধ হয় তাহলে তার বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলছেন—'কিন্তন্যেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিপ্রদং রসনেন্দ্রিয়মেবানর্থকারীত্যতস্তস্য জয়ে প্রযত্নং কূর্ব্বীত।' অনেক সময় দেখা যায় নিরাহার মনীষীরা রসনা ছাড়া আর সব ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন। কারণ আহার ত্যাগ করলে অন্য ইন্দ্রিয় জয় হয় বটে কিন্তু রসনা ইন্দ্রিয়ের জয় তো হয়ই না বরং রসনার লালসা উত্তরোত্তর বাড়ে। আবার যদি বা আহার গ্রহণ করে তখন রসে আসক্তির জন্য সকল ইন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়। কাজেই রসনা ইন্দ্রিয়কে অবশ্যই জয় করতে হবে। তখন তার অনুবর্ত্তী হয়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের জয় আপনা আপনিই হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই রসনা ইন্দ্রিয়কে জয় করার কি উপায়? শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলছেন—'তাদৃশোরসনেন্দ্রিয়স্য জয়স্তু রসনয়ৈব ভগবদুচ্চনামকীর্ত্তন রসাস্বাদাদ্ভবেৎ।' এই রসনা ইন্দ্রিয়ের জয় একমাত্র সেই রসনা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তন করা এইটাই একমাত্র উপায়। এতেই রসনা ইন্দ্রিয়কে জয় করা যাবে। ভগবানও বলেছেন—

রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। —গীতা ২।৫৯

পরমেশ্বর শ্রীভগবানের দর্শন হলে বিষয় এবং বিষয়তৃষ্ণা দুটিরই চিরতরে উচ্ছেদ হয়।

এর পরে অবধূতজী পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা বলছেন। এই পিঙ্গলার কাছে তিনি জীবনে নৈরাশ্য শিক্ষা

পেয়েছেন। এই উপাখ্যানটি অবধূত বলছেন—মহারাজ, পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করত। একদিন সেই স্বৈরিণী পথিক কান্তকে নিজের রতিগৃহে নিয়ে যাবার জন্য নিজের দেহকে খুব ভালভাবে সাজিয়ে (পথিককে আকর্ষণ করবার মত) বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় আছে। পথ দিয়ে তো কত পথিকই যাচ্ছে আবার আসছে। প্রত্যেককে দেখে পিঙ্গলা আশা করছে—ইনি ধনবান, আমাকে প্রচুর ধন দেবেন। কারণ এই নারী অত্যন্ত অর্থকামুকী। অর্থলোভেই এইরকম ভাবছে। এইটিই তো তার উপজীবিকা। সে দেখল বহু পুরুষ যাচ্ছে আসছে বটে কিন্তু কেউই তার ঘরে আসছে না। তাই দেখে সে মনে আরও দুরাশা পোষণ করল যে এর পরে এদের চেয়ে আরও ধনবান ব্যক্তি কেউ আসবে এবং সে আমাকে প্রচুর ধন দেবে। সে আরও ভাবছে যে সেই ধনবান ব্যক্তি আমাকে শুধু ধন দেবে তাই নয় প্রচুর অর্থ দিয়ে আমার ভজনা করবে।

এইভাবে পিঙ্গলা দুরাশায় দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে তার ঘুম নেই। একবার আশা নিয়ে ঘরের বাইরে আসছে আবার নিরাশ হয়ে ভিতরে যাচ্ছে। এইভাবে রাত্রির প্রায় অর্দ্ধেক কেটে গেল। এরপরে ধনের আশা করতে করতে যখন বিফলমনোরথ হয়েছে পিঙ্গলা, তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। আর চিত্তও দীন হয়েছে। পরম সুখের চিন্তায় তার হৃদয়ে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হল। চিত্ত দীন না হলে তো দীননাথের কৃপা হয় না। দীননাথের কৃপায় পিঙ্গলার এই বৈরাগ্যলাভ। পিঙ্গলার যে এই দুরাশা তার কিন্তু সুফল ফলেছে। অবধূতজী বলেছেন পিঙ্গলা পরম নির্ব্বেদ লাভ করেছে। এখানে টীকাকার দীপিকাদীপনকার বলছেন—এই নির্ব্বেদ কেমন —সকল বিষয়ে তার ত্যাজ্যবুদ্ধি হয়েছে। লৌকিক বিষয়ে তার বৈরাগ্য দৃঢ় হয়েছে। অবধূত বলেছেন সুখাবহ চিন্তাহেতু পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েছে পিঙ্গলা। দীপিকাদীপনটীকায় টীকাকার সুখাবহ পদে অর্থ করেছেন—'সুখাবহ ইতি সুখং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ানুরাগজানন্দং আবহতি প্রাণয়তীতি তথা।' পরমসুখঘন আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অনুরাগজনিত

আনন্দ তার হৃদয়কে উল্লসিত করেছে। কিন্তু বিত্তচিন্তার ফলে তো ভগবদনুরাগ হয় না তাই টীকাকার মন্তব্য করলেন এটি আপাততঃ আমাদের মনে হচ্ছে বটে কিন্তু কথা তা নয়। প্রকৃতপক্ষে পিঙ্গলার পূর্ব্বসংস্কারই এই কৃষ্ণানুরাগ জাগিয়ে তুলেছে। “বিত্তচিন্তৈব হেতু র্যস্যেত্যাপাতবোধার্থমেব তস্য পূর্ব্বসংস্কারহেতুকত্বাৎ।”

পিঙ্গলার চিত্তে যখন খাঁটি বৈরাগ্যের উদয় হল তখন তার যে অন্তরের আকূতি ভাষার মাধ্যমে ফুটেছে সেটি অবধূতজী যদুমহারাজের কাছে প্রকাশ করছেন। বলছেন, মহারাজ পিঙ্গলার এই নির্ব্বেদবাক্য মন দিয়ে শুনুন। কারণ প্রকৃত বৈরাগ্য না হলে মানুষের আশাপাশ কখনও ছিন্ন হয় না। আমাদের মনে হতে পারে পিঙ্গলার এই গীত (নির্ব্বেদবাক্য) শুনে আমাদের কি লাভ হবে? এটি শুনবার একান্ত প্রয়োজন আছে—এটি উপাদেয় শিক্ষা। কারণ শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—সংসারে মানুষকে বেঁধে রাখবার রজ্জুই হল একমাত্র আশা। কারণ আশা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তৃষ্ণা থেকেই আশার জন্ম। তাই সংসারের লক্ষণ করা আছে—“বিষয়তৃষ্ণা এব সংসারঃ।” বিবাহ করে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বসবাস করাকে সংসার বলে না। এখন কথা হচ্ছে এই সংসারবন্ধনকে তো ছেদন করতে হবে। রজ্জুছেদনের জন্য যেমন নিশিত তরবারি দরকার তেমনি সংসারের আশারূপ পাশকে (দড়িকে) ছেদন করতে নির্ব্বেদ (খাঁটি বৈরাগ্য) হল শাণিত অসি। মানুষকে তো এই সংসারবন্ধন মোচন করে যেতে হবে। মানুষই পারে। এই সঙ্কল্প করতে হবে যে দেহত্যাগের সময় যেন কোন বাসনা না থাকে। তাই পিঙ্গলার এই নির্ব্বেদবাক্য আমাদের পক্ষে পরম উপকারী। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই বৈরাগ্যের বাণী যদি হৃদয়কে এতটুকুও স্পর্শ করে তাহলেও পরম উপকার। অবধূত বলছেন, শুনুন মহারাজ, পিঙ্গলার সেই গীত। ১৯-২৮

পিঙ্গলোবাচ।

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ।
যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা ॥ ২৯
সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায় ।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা ॥ ৩০
অহো ময়াত্মা পরিতাপিতো বৃথা সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া।
স্ত্রৈণান্নরাদ্যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী ॥ ৩১
যদস্থিভির্ন্নির্ম্মিতবংশবংশাস্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধং।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা ॥ ৩২
বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।
যান্যমিচ্ছত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ ॥ ৩৩

বঙ্গানুবাদ

পিঙ্গলা বলল,—হায়! আমি অত্যন্ত বিবেকহীনা, মোহসম্পন্না, অজিতাত্মা। তাই মূর্খের মত অতিতুচ্ছ কান্তের কাছে কাম্যবিষয় প্রার্থনা করছি। ২৯

হায়! হায়! আমি অন্তরে আনন্দপ্রদ ও বিত্তপ্রদ নিত্য সৎপদার্থের উপাসনা না করে অজ্ঞের মত অকামদ, দুঃখ, শোক, ভয় এবং পীড়াদায়ক অতিনিকৃষ্ট পুরুষকে ভজনা করছিলাম। ৩০

হায়! এতদিন পর্য্যন্ত অতিনিন্দিত অতিকদর্য্য সাঙ্কেত্যবৃত্তি দ্বারা মিছামিছি আত্মাকে কষ্ট দিয়েছি—কারণ আমি ক্রীতের মত লম্পট, অর্থকামুক ও অনুশোচনীয় পুরুষ থেকে রতি ও বৃত্তি পাওয়ার ইচ্ছা করছিলাম। ৩১

বাঁশের খাঁচার মত অস্থিনির্মিত ও ত্বক্ রোম নখাদি দ্বারা আবৃত এবং ক্লেদক্ষরিত নবদ্বারবিশিষ্ট বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ অতি হেয় এই কান্ত শরীরকে একমাত্র আমি ছাড়া আর কে আদর করে থাকে? ৩২

এই বিদেহ নগরে আমিই একা মূঢ়বুদ্ধি, কারণ আমি আত্মপ্রদ অচ্যুতকে ত্যাগ করে অন্যের কাছে কামভোগ ইচ্ছা করেছি। ৩৩

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাং ।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩৪
কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্য্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ ॥ ৩৫
নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্ম্মণা ।
নির্ব্বেদোঽয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ ॥ ৩৬
মৈবং স্যু র্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্ব্বেদহেতবঃ ।
যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি ॥ ৩৭
তেনোপহৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ ।
ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥ ৩৮

বঙ্গানুবাদ

দেহধারীর আত্মাই হল প্রিয়তম সুহৃদ্ । সেই ঈশ্বরের কাছে এই দেহ নিবেদন করে তাঁকে ক্রয় করে লক্ষ্মীর মত তাঁর সঙ্গে রমণ করব । ৩৪

এ জগতের যাবতীয় কাম্যবিষয়, কামী পুরুষ এবং কালকবলিত দেবগণ সকলেই অনিত্য । তাই তারা কি কামিনীদের প্রিয় সাধন করতে পারে ? সেটি কিছুতেই সম্ভব হয় না । কেবলমাত্র এক বিষ্ণু ভগবান ইহলোক পরলোক সকল লোকেরই সুখবিধান করতে পারেন । ৩৫

আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয় আমার কোন অলক্ষিত কর্মের দ্বারা ভগবান বিষ্ণু আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যেজন্য আমার এখন এই সুখাবহ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে । ৩৬

ধনপ্রাপ্তির আশা করে ক্লিষ্ট হয়েছি বলে যে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন না এমন কোন কথা নেই । যদি আমার ভাগ্য মন্দই হত তাহলে যে বৈরাগ্য লাভ হলে মানুষ স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে পরম শান্তি আশ্রয় করে সেই সুখ হেতু বৈরাগ্য আমার কখনই লাভ হত না । ৩৭

ভগবানের কৃপায় নির্ব্বেদরূপ উপকার আমি সযত্নে মস্তকে ধারণ করে গ্রাম্যক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়সঙ্গত দুরাশা ত্যাগ করে সেই পয়মেশ্বরের শরণাপন্ন হলাম । ৩৮

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥ ৩৯
সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণং।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥ ৪০
আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্ব্বিদ্যেত যদাখিলাৎ
অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেৎ গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥ ৪১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

এবং ব্যবসিতমতি দুর্রাশাং কান্ততর্ষজাং।
ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা ॥ ৪২
আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে পিঙ্গলাগীতমষ্টমোঽধ্যায়ঃ। ৮

বঙ্গানুবাদ

আমি যথালাভে জীবিকানির্ব্বাহ করে শ্রদ্ধা করে সন্তুষ্ট হয়ে সেই রমণস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে বিহার করব। ৩৯

ব্রহ্মাদি দেবতাকে ত্যাগ করে কেবল যে বিষ্ণুভগবানের শরণাপন্ন হচ্ছি তার কারণ হল সংসারকূপে পতিত, বিষয়মোহে অন্ধ এবং কালসর্প দষ্ট এই আত্মাকে উদ্ধার করতে তিনি ছাড়া আর কে সমর্থ হবে? ৪

যখন এই জগৎ কালসাপ গ্রাস করবে তখন জীব অপ্রমত্ত হয়ে সকল প্রকার ভোগ থেকে বিরত হবে এবং আত্মার দ্বারাই আত্মাকে রক্ষা করবে। ৪১

ব্রাহ্মণ বললেন—পিঙ্গলা এইভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় করে কান্ততৃষ্ণাজনিত দুরাশা ছেদন করল এবং প্রশান্তি লাভ করে নিজের শয্যায় উপবেশন করল। ৪২

হে মহারাজ। এ জগতে আশাই পরম দুঃখের কারণ আর বৈরাগ্যই পরম সুখ। যে জন্য পিঙ্গলা কান্তবিষয়ে আশা ত্যাগ করেই সুখে নিদ্রিত হয়েছিল অর্থাৎ ভগবানকে আশ্রয় করেই সুস্থ হতে পেরেছিল। ৪৩

ইতি একাদশে অষ্টম অধ্যায়।

পিঙ্গলা গীত

পিঙ্গলার এ বাক্য যদি ঠিক ঠিক বোধগম্য হয় তাহলে বড় উপকার। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন জীবের আত্মবোধ হয় না। কথা শোনা যায়, বলা যায় কিন্তু করা যায় না। বোধ হয় না যে বললেন এ বোধটি কেমন? লঙ্কা ও গুড় খাওয়ার মত। লঙ্কা খেলে যে ঝাল লাগে বা গুড় খেলে যে মিষ্টি লাগে সেটি তার নিজের বোধ। এ বোধটি অন্য কাউকে বুঝান যায় না। ভাগ্যবানেরই একমাত্র এ বোধ হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ভাগ্যবান কে। মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ভাগ্যবান। ভগবানও বলেছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ —গীতা ৭।১৬

চারপ্রকার ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে অর্জুন। আর্ত্ত যেমন গজরাজ অথবা দ্রৌপদী—বিপদে পড়ে ভগবানকে ভজেছেন। জিজ্ঞাসু অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু যেমন শৌনকাদি ঋষি। অর্থার্থী যেমন ধ্রুব—রাজ্যকামনায় গোবিন্দ ভজেছেন আর জ্ঞানী যেমন চতুঃসন—সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষি। আমি নিজে ভক্ত হয়েছি এ কথা মনে রাখলে আর ভক্ত হওয়া চলবে না। অর্থকামনায় যদি কেউ বলেন লক্ষ্মীর উপাসনা করব তাতেও কিন্তু খুঁত আছে। কারণ লক্ষ্মীঠাকুরাণী সম্পদ্ দিতে পারেন বটে কিন্তু তিনিও তো স্বয়ংসম্পূর্ণা নন। ধ্রুবের জননী সুনীতি দেবী ধ্রুবকে বলেছিলেন—

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্।
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন॥

যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া।
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া॥ —ভাঃ ৪।৮।২৩

পদ্মপলাশলোচন হরি ছাড়া দুঃখনিবৃত্তি করবার আর কেউ নেই। কারণ লক্ষ্মীঠাকুরাণীও তাঁরই উপাসনা করেন।

দেবর্ষিপাদ নারদ বলছেন—

ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ।
একমেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্॥ —ভাঃ ৪।৮।৪১

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যে যাই পেতে ইচ্ছা করুন না কেন সকলের মূল হল হরি আরাধনা।

আর্ত্ত হলেই ভগবানকে ভজবে এমন কোন কথা নেই। আর্ত্ত যদি সুকৃতিসম্পন্ন হয় তাহলে ভজবে। তা না হলে অন্য দেবতার আরাধনা করবে। যে কামনা পূরণের জন্য যে দেবতার ভজনের বিধি শাস্ত্রে আছে। এই সুকৃতি পদে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় কৃষ্ণভক্তের কৃপাকেই বুঝিয়েছেন। এ কোন পুণ্যজনিত সুকৃতি নয়। রোগের সময় আমরা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে ডাকি তাতে রোগের মাত্রা না কমে বরং বাড়ে। তাই আত্মীয়কে না ডেকে পরমাত্মীয়কে ডাকতে হবে। প্রাকৃত শুভ বা অশুভ কখনও সুকৃতি হতে পারে না। মহাজন বলেছেন—

ধর্মাধর্ম পরিহরি হও নিতাইএর দাস।

এ ভক্তি কোটিকল্পের সাধন বলেও মেলে না।

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।

একমাত্র হরি দিলে এ ভক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু হরিও বড় একটা এ কাউকে দেন না। শ্রীশুকদেব বললেন—

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ —ভাঃ ৫।৬।১৮

কিন্তু ভগবান এ ভক্তি ভক্তের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন তাই ভক্ত যদি করুণা করে দেন তাহলে এ ভক্তি পাওয়া যায়। তাই এ সুকৃতি হল মহৎকৃপাপ্রাপ্তিজনিত সুকৃতি। পিঙ্গলার নির্ব্বেদ না হয় এল আশ্রাক্ষীণ হয়ে, কিন্তু তার সঙ্গে কৃষ্ণানুরাগ আসবার হেতু কি? একমাত্র মহৎ-

কৃপাতেই এটি সম্ভব হয়েছে। দত্তাত্রেয় ঋষি (অবধূত) সে রাত্রিতে যদৃচ্ছাক্রমে পিঙ্গলার অঙ্গনে শয়ন করেছিলেন। তাঁর কিছু পরিচর্য্যা পিঙ্গলা করেছিল। সেই সূত্রে কৃপা পেয়ে গিয়েছে। যার ফলে নির্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানুরাগ হয়ে গিয়েছে। তাই সখেদে পিঙ্গলা বলছেন—

অহো ময়াত্মা পরিতাপিতো বৃথা সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া।
স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী।

—ভাঃ ১১।৮।৩১

একমাত্র শ্রীগোবিন্দের ভজন ছাড়া কোন কামনা পরিপূরণ হওয়া সম্ভব নয়। লক্ষ্মীপতি ছাড়া লক্ষ্মী কেউ দান করতে পারে না। পুত্র যদি বিমুখী হয় তাহলে পিতামাতা যেমন অনুশোচনা করেন তেমনি বিমুখ জীবনিচয়ের জন্য সাধুগুরুবৈষ্ণবেরও অনুশোচনার অন্ত নেই। মাতৃগর্ভে জীব কত কাতরভাবে প্রার্থনা জানায় এবার আমায় জনম দাও। এবার জন্মে তোমায় ভজব। কিন্তু

ভূমিষ্ঠ হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল রে।
প্রণব জঠর স্মৃতি অন্তর্হিত হইল রে॥

সারাজীবন হেলায় কাটল মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়ে হরি বললে আর কোন উপায় নেই। কারণ তখন বলবার সামর্থ্য নেই। মহাজনের অনুভূত বাক্য—

যে জন ভিক্ষায় বের হয় সন্ধ্যাকালে
সে ভিখারীর কি ভিক্ষা মেলে?

সকালবেলাতেই ভিক্ষায় বের হবে। তাই প্রহ্লাদ বললেন—

কৌমার আচরেদ্ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

—ভাঃ ৭।৬।১

দিন কাটে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায়, কুটুম্বপালনে, রাত্রি কাটে নিদ্রায় অতএব হরিভজনে সময় কোথায়। পিঙ্গলার নির্ব্বেদের পর আরও একটি গীত বলেছেন—

যদস্থিভির্নির্মিতবংশবংশ্যস্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধং।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্ বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা॥

—ভাঃ ১১।৮।৩২

ভিতরে অস্থির বাঁশ দিয়ে কাঠামো তৈরী করা আর উপরে ত্বক, রোম, নখ দিয়ে ঢাকা—আবার শুধু উপর দেখলে হবে না ভিতরটি দেখতে হবে। এই দেহ আগারে নটি ছিদ্র। কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীদেবীও এই কথাই বলেছেন—

ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥

—ভাঃ ১০।৬০।৪৫

কৃষ্ণচন্দ্র পরিহাসছলে যখন বললেন—রুক্মিণী, তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে আমি ত্যাগ করে শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি যাকে তোমার পছন্দ তার হাতে তোমাকে অর্পণ করতে পারি। এই কথা শুনে রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণ ত্যাগ করবেন এই আশঙ্কায় তাঁর শরীর কৃশ হয়ে গিয়েছে। হাতের বলয় খসে পড়েছে। ব্যজন হাত থেকে পড়ে গিয়েছে। ভাবের শরীর তাই এটি সম্ভব হয়েছে। কৃষ্ণপ্রিয়তাই রুক্মিণীর দেহের উপাদান। যে ব্যক্তির ভগবানে রতি হয় নি সে অন্যত্র রতিলাভ করতে পারে কিন্তু যার ভগবানে রতি হয়েছে সে অন্য কোথাও তৃপ্তি লাভ করে না।

তদ্রসামৃততৃপ্তানাং নান্যত্র স্যাৎ রতিঃ ক্বচিৎ॥

পিঙ্গলা বলছেন—বিদেহপুরে আমিই একমাত্র মূঢ়ধী—

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।

—ভাঃ ১১।৮।৩৩

অন্য সকলকে বিজ্ঞ মনে করে নিজেকে মূঢ়ধী মনে করাই ভক্তির রাস্তা। এইটিই কৃপার রাস্তা। কাশীতীর্থে শ্রীসরস্বতীপাদ প্রথমে নিজেকে বিজ্ঞ মনে করতেন এবং আর সকলকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা থেকে বঞ্চিত বলে মনে করতেন। মহাপ্রভু শুনে বুঝলেন সরস্বতী এখনও ভক্তির পথই ধরে নি। পরে যখন সরস্বতীর বাক্য শুনলেন—

বিশ্বং গৌররসে মগ্নং বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি
বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥

তখন মহাপ্রভু বুঝলেন সরস্বতী এতদিনে ভক্তির ঠিক রাস্তা ধরেছে। মহাজনের আস্বাদিত বাণী—

এমন প্রেমসিন্ধু অবতারে জগৎ ভেসে গেল
ডুবে গেল
আমি রইলাম বাকী রে
প্রেম পেতে রইলাম বাকী এক বিন্দু পরশ হল না রে
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে দিয়ে ফাঁকি প্রেম পেতে রইলাম বাকী।

পিঙ্গলার আক্ষেপ, যে অচ্যুতকে ভজনা করলে তিনি নিজেকে পর্য্যন্ত দান করেন সেই আত্মদ অচ্যুতকে বাদ দিয়ে আমি অন্য পুরুষকে ভজনা করেছি অতএব আমিই একমাত্র মূঢ়ধী। এর পরে পিঙ্গলা বলছেন—

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ —ভাঃ ১১।৮।৩৪

দেহধারীদের যে দেহ অত্যন্ত প্রিয় এবং সুহৃৎ তাকে অচ্যুতের কাছে নিবেদন করে অচ্যুতকে ক্রয় করে তার সঙ্গেই রমণ করব যেমন রমা (লক্ষ্মী) করেছেন। ভগবানকে 'নাথ' বলে সম্বোধন করছেন। ব্রহ্মাও স্তুতি করেছেন—

অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি।
—ভাঃ ১০।১৪।১০

অজা অর্থাৎ প্রকৃতি স্পর্শে অবলেপ অর্থাৎ গর্ব্বরূপ অন্ধতা আসে তাতে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে তোমাকে দেখতে দেয় না। আমি সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা বলছেন—আমারই যদি এই গতি হয় তাহলে আমার সৃষ্ট সৃষ্টের কি গতি হবে? তুমি আমাকে নাথবান ভেবে অতএব অনুকম্পা করার যোগ্য ভেবে ক্ষমা কর। নাথবান্ বলতে কি বুঝায়? তুমি এইটিই মনে কর যে আমি ছাড়া ব্রহ্মার আর কেউ নেই। তুমিই আমার একমাত্র প্রভু। পিঙ্গলাও তেমনি

এখানে 'নাথ' সম্বোধন করে বলছেন, হে নাথ, আমি আমার দেহ তোমাকে দান করব। তুমি বিক্রীয় (এখানে বিক্রয় করা অর্থ নয়) কিন্তু তুমি বিশেষরূপে সেটি ক্রয় করবে অর্থাৎ তুমি আমার দেহ কিনে নেবে। আমি গোবিন্দ কিনে নেব। মূল্য কি? আত্মসমর্পণ মূল্য। যেমন গৌরনাগরী আত্মসমর্পণ করে গৌরপূজা করে। গোবিন্দে আত্মসমর্পণ করলে গোবিন্দও তাকে আত্মসমর্পণ করেন। তাই গোবিন্দকে আত্মদ বলা হয়। যেমন দেহ দান করে ভগবানকে ভজেছেন লক্ষ্মী। পিঙ্গলার এখন আর প্রাকৃত পুরুষ লালসা নেই। একমাত্র অচ্যুত ছাড়া অন্য কেউ যে সেব্য নেই এটি পিঙ্গলা মনে প্রাণে বুঝেছেন। তাই পরবর্ত্তী বাক্য বলছেন—

কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্য্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ॥

—ভাঃ ১১।৮।৩৫

পিঙ্গলার নির্ব্বেদ—এটি নিশ্চয় অর্থাৎ এতে কোন সংশয় নেই। অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে দেখান হয়েছে। পিঙ্গলার নিশ্চয় যে গোবিন্দকে বশীভূত করব। ভগবানের বাক্য আছে দুর্ব্বাসা ঋষির কাছে। ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ বলছেন—অহং ভক্তপরাধীনঃ। পিঙ্গলা আত্মা দিয়ে ভগবানকে কিনেছে। ভগবানও তাই তাকে নিজের আত্মা দিয়েছেন। পিঙ্গলা সব ত্যাগ করে ভগবদ্ভজন স্থির করেছেন। অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে দুইভাবেই স্থির করেছেন। অর্থাৎ অচ্যুত ছাড়া অন্য কাউকে ভজব না। এজগতে ও ওজগতে একমাত্র অচ্যুত ছাড়া 'অন্যঃ কোঽপি ন সেব্যঃ'। কামনা পূরণ করতে পারে এমন কোন দেবতা বা নর কেউ নেই। পিতামাতা অভিমান করেন সন্তানের মঙ্গল করব বলে। কিন্তু করবার সময় করতে পারেন না। কারণ পিতামাতার কোল থেকেও পুত্রের মৃত্যু হয়। প্রহ্লাদ বলেছেন—"বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ" দেবতারা নিজেরাই কালবিদ্রুত কালকবলিত। অতএব তাঁরা কি করে অপরকে কালের কবল থেকে রক্ষা করবেন? যে নিজে কালগ্রস্ত

সে অপরকে কালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। যে যা কিছুই করছে সবই ভগবানের স্বরূপ। প্রহ্লাদ বললেন—

যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাৎ —ভাঃ ৭।৯।২০

তোমাকে উপেক্ষা করে কিছু করার উপায় নেই। আদি এবং অন্ত যাদের আছে তারা কি কখনও সুখ দিতে পারে? ভগবান বলেছেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

—গীতা ৫।২২

স্তম্ব থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই কালবিক্রুত। ভগবানই একমাত্র কালাতীত। ভগবানের চেষ্টা থেকে কালের জন্ম। কাল দুই প্রকার। স্বরূপ ও ছায়া। স্বরূপ কালের দ্বারা লীলাজগতের বিধান হয় আর এ জগতের বিধান হয় ছায়া কালের দ্বারা। ভগবান ও তাঁর নিত্য-দাস কালগ্রস্ত নয়। জীবের ক্ষীণ পরমায়ু—গৌরগোবিন্দ বলব বলব মনে করতে করতে জীবন শেষ হয়ে গেল, বলা আর হল না। ছেলেরা যেমন ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছাদের আলসেতে গিয়ে ঠেকে আর একটু হলেই পড়ে যাবার সম্ভাবনা। আমাদের জীবনও তেমনি আলসেতে এসে ঠেকেছে। ওখানে ছেলেকে যেমন মা বাপ সাবধান করেন এখানেও সাধু গুরু বৈষ্ণব সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন জীবন শেষ হতে চলল গৌর বলা হল না। আদ্যন্তবন্ত বস্তুতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আনন্দ পান না। সেব্য এবং উপাস্য একমাত্র তিনিই যিনি কালবিক্রুত এবং আদ্যন্তবন্ত নন। বাক্‌পতি ব্রহ্মাও ভগবানকে স্তুতি করবার সময় বলেছেন—হে ঈড্য, অর্থাৎ হে স্তুত্য, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি ছাড়া আর কেউ স্তুত্য নেই। তুমিই একমাত্র স্তুত্য। আর যদি কাউকে স্তুত্য বলা হয় সে স্তুতিযোগ্যতা তোমার কাছ থেকে ধার করা। কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন দেবতার ভোগ হয় না। শ্রুতি বললেন তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ভগবান নিজে চতুঃশ্লোকী ভাগবতে বললেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎসদসৎপরম্ —ভাঃ ২ ৯।৩২

অহমেব আসম্—শ্রীজীবপাদ ব্যাখ্যা করেছেন ভগবান তর্জ্জনী বক্ষে স্পর্শ করে বলেছেন সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই একা ছিলাম। অন্য কেউ ছিল না। সকলের জন্ম বিষ্ণুর জন্মের পরে। কাজেই তেন অশিতম্ অশ্নন্তি, ঘ্রাতং জিঘ্রতি, পীতং পিবন্তি ইত্যাদি। বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন দ্বারা দেবতান্তরের উপাসনা করবে। দীর্ঘবিষ্ণু, মহাবিষ্ণু বা মহানারায়ণই প্রথম প্রদীপ। তার থেকে অন্যান্য দেবতার উৎপত্তি। ব্রহ্মা বলেছেন—প্রথম প্রদীপ গোবিন্দ। একটি প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ জ্বাললে যেমন প্রথম প্রদীপ থেকে তাকে অভিন্ন বলা হয় সেইরকম মৎস্য প্রভৃতি অবতারের ভগবান গোবিন্দ হতে উৎপত্তি বলে অভিন্নত্ব স্বীকার করা হয় তবু বিচারে গোবিন্দই প্রধান। হরি হর একাত্মা। তাই শিবের কাছে নিজ শক্তি নারায়ণীকে গচ্ছিত রেখেছেন তাই মা দুর্গাকে নারায়ণী বলে প্রণাম করা হয়। মায়ের পূজা পশ্বাচারে ও বীরাচারে দুই প্রকারে করা যায়। কিন্তু পশ্বাচারে পূজা প্রবৃত্তির বিরোধী বলে প্রায়ই লোকে নিতে চায় না। কর্মমোক্ষের জন্যই বৈদিক কর্মের বিধান। কর্মমোক্ষায় কর্মাণি। মহাপ্রসাদের মহিমা প্রচারের জন্য বিমলাদেবী শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। শিব উর্দ্ধমুখে মায়াবাদ প্রচার করেন বলে উর্দ্ধমুখের নির্মাল্য অগ্রাহ্য। এটি দেবীর অভিশাপ। পিঙ্গলা এখন বুঝেছেন যে অচ্যুতই একমাত্র সেব্য। এই কৃষ্ণানুরাগের একটি কারণ পিঙ্গলা নিশ্চয় করেছেন—'নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্মণা।' আমার কোনো কর্মে ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয় প্রীত হয়েছেন। তা না হলে এমন হতে পারে না। ভগবান যে প্রীত হয়েছেন তার লক্ষণ কি? 'নির্ব্বেদোঽহয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ।' সুখপ্রাপক নির্ব্বেদ যে আমায় জন্মেছে এটি ভগবানের প্রীতি ছাড়া জন্মে না। কারণ বলা আছে—

কৃষ্ণকৃপার হয় এক স্বাভাবিক ধর্ম।
রাজ্য ছাড়ি করায় তারে ভিক্ষুকের কর্ম॥

মাটির তলায় অনেক রকম বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু অঙ্কুর বেরুলে

বুঝা যায় কোনটি কার বীজ। মহৎকৃপারূপ বীজও তেমনি সর্ব্বত্র ছড়ান আছে। নির্ব্বেদরূপ অঙ্কুর এবং পাতা যখন বেরুবে তখন বুঝা যাবে। এই নির্ব্বেদ হলে তা চিনবার লক্ষণ কি? সংসার তেতো লাগবে আর ভগবানকে মিষ্টি লাগবে। ভক্তের বৈরাগ্যের দিকে নজর দিতে হবে না ভক্তি পুষ্ট হচ্ছে কি না সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ভক্তি পুষ্ট হলে বৈরাগ্য আপনিই হবে। তা না হলে শুষ্ক বৈরাগ্যে দৃষ্টি দিয়ে লাভ নেই। কারণ সে বৈরাগ্য স্থায়ী হবে না। যেমন পেট ভরা থাকলে খাদ্যে প্রয়োজন নেই আপনিই বলা হয়। তেমনি ভগবানের মাধুর্য্যে উদয় স্ফূর্ত্তি হয়ে গেলে সংসারের বিষভোগে দরকার নেই আপনিই বলা হবে। উদরপূর্ত্তি হয় ভোজন করলে আর এখানে ভক্তিপথে ভোজন হল নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন। গোবিন্দ-লীলারসে হৃদয় পূর্ণ হলে ইন্দ্রপদ ব্রাহ্মপদ পর্য্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যাবে। সংসার মরুতে জীবের অহরহ বাস। মাথার উপর মধ্যাহ্ন ভাস্কর, পায়ের তলায় উত্তপ্ত বালুকা, শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায় কাতর, প্রাণঘাতী তৃষ্ণা, হঠাৎ যদি দেখা যায় ওপরে নীচে কোথাও তাপ অনুভূত হচ্ছে না, কণ্ঠ শুষ্ক নেই, প্রাণঘাতী তৃষ্ণা নেই, পরম প্রশান্তিতে কণ্ঠ ভরে গেছে—এক নিবিড় শান্তির প্রলেপ সর্ব্বত্র অনুভূত হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে ভগবানের কৃপা হয়েছে। ভগবান প্রসন্ন হলে তবে নির্ব্বেদ আসে। ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কিছু তো করতে হবে। পিঙ্গলা শুধু অনুমান নয় নিশ্চয় করলেন—আমার কোন কর্ম্মের দ্বারা ভগবান সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কিছু কর্ম করতে হবে—এইটিই পিঙ্গলার মন্তব্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—প্রাচীন মত অনুসারে জানা যায় দত্তাত্রেয় ঋষির কৃপায় পিঙ্গলার এই নির্ব্বেদ লাভ। প্রহ্লাদের গায়ের বাতাসে সুকৃতি সম্পন্ন হবে। ভক্তিকাজে যারা সহায়ক সকলেই ভজনযোগ্য দেহ পাবে। যে লতাগুল্মের ফুল, যে গাভীর দুধ, যে গাছের ফল ভগবানের সেবায় লাগে তারা সকলেই ভজনযোগ্য দেহ পাবে। তাহলে দেখা গেল ভক্তসেবায় ভগবান প্রীত হন। ভগবানের তুষ্টি হলেই নির্ব্বেদ আসে। ভগবান তুষ্ট হয়েছেন তাই পিঙ্গলার নির্ব্বেদ।

স্বামিপাদ টীকার প্রশ্ন তুলেছেন—পিঙ্গলা সারারাত্রির অবসাদে ক্লিষ্ট হয়ে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েছেন। ভগবান তুষ্ট হয়েছেন বলে তার নির্ব্বেদ প্রাপ্তি—এ কথা বলা হল কেন? এখানে ক্লিষ্টা হয়ে নির্ব্বেদপ্রাপ্তি তা বলা যাবে না—কারণ পিঙ্গলার নির্ব্বেদ সুখাবহ। ভগবান সন্তুষ্ট না হলে নির্ব্বেদ সুখাবহ হয় না।

পিঙ্গলার নির্ব্বেদ সুখাবহ তাই বুঝতে হবে ভগবান প্রীত হয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য আছে—

কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়।

ভিক্ষুক খেতে না পেয়ে যদি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয় সে নির্ব্বেদে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত হয়—তাতে ভবসাগর পার হওয়া যায় না। যে ক্লেশে হরিপাদপদ্ম ভজায় সে ক্লেশ কম হয়। পিঙ্গলার যে ভগবৎ রতি তার মূলে রয়েছে নির্ব্বেদ এবং তার মূলে যে ক্লেশ এ ক্লেশ ভগবানের কৃপায় আসে। ক্লেশ অনেক রকমে আসে। প্রহ্লাদের ক্লেশে ভগবৎ রুচি বেড়েছে। প্রহ্লাদ যত অত্যাচার সহ্য করেছেন ততই তাঁর ভগবানে রতি বেড়েছে। পাণ্ডবদের দুঃখ দেখে ভীষ্ম বলছেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে—'মহারাজ বিপদ যে আপনাদের কেমন করে হয় তা তো আমি বুঝে উঠতে পারি না। আপনার মত ধার্মিক রাজা যেখানে সিংহাসনে আসীন, ভীম যেখানে গদাধারী, অর্জুন যেখানে গাণ্ডীবধারী এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ যেখানে সখা, সুহৃদ, পরমাত্মীয় প্রিয়জন সেখানে বিপদ কি করে আসে তা তো বুঝতে পারি না!' তবে ভগবানের ইচ্ছায় যে পাণ্ডবদের বিপদ এটি ভীষ্ম নির্ণয় করেছেন তবে তার কারণ যে কি এটি ভীষ্ম বলতে পারেন নি। এর কারণ নির্দ্দেশ করেছেন শ্রীহনুমানজী। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে শ্রীহনুমানজী দেবর্ষিপাদ নারদকে বলেছেন—পাণ্ডবদের ঘরে যে বিপদ তার দুটি কারণ। একটি হল পাণ্ডবেরা নূতন নূতন বিপদ তৈরী করেন—কারণ বিপদে পড়লে অন্যলোকে যা করে করুক পাণ্ডবদের স্বভাব কিন্তু একমাত্র গোবিন্দপাদপদ্ম স্মরণ করা। গোবিন্দপাদপদ্ম যে স্মরণ করেন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নয়। হরিপাদপদ্ম স্মরণ করলে

বিপদ যে থাকে না এটি তো নিশ্চিত—সেজন্য নয় কিন্তু হরিস্মরণ করলে হরি তো তাঁদের কাছে না এসে পারবেন না এবং হরি এলে তাঁর পাদপদ্ম অনায়াসে তাঁরা দর্শন পেয়ে যাবেন। এইজন্যই পাণ্ডবেরা হরি স্মরণ করেন। আর একটি কারণে তাঁদের বিপদ। কৃষ্ণ ইচ্ছা করে বিপদ তাঁদের কাছে পাঠান। কিন্তু কৃষ্ণ তো পাণ্ডবদের ভালবাসেন। যে যাকে ভালবাসে তার কাছে বিপদ পাঠায় নাকি? হনুমানজী বলেছেন পাণ্ডবদের ধৈর্য্য, বল, তিতিক্ষা, সংযম কতখানি পরীক্ষা করবার জন্য, সমাজে পাণ্ডবদের স্বনামধন্য করবার জন্য, সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কৃষ্ণ বিপদ তৈরী করে পাণ্ডবদের কাছে পাঠান। পাণ্ডবচরিত্র-সোনাকে বিপদ-কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে জনসমাজে পাণ্ডবদের সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই কৃষ্ণের এই প্রয়াস। কারণ যে যাকে ভালবাসে তাকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। পাণ্ডবদের বিপদকে "সুসেবিত মহোত্তমা" বলা হয়েছে। কারণ মহৎ ব্যক্তির সেবার ফল যেমন গোবিন্দদর্শন পাণ্ডবদের বিপদও তেমনি গোবিন্দদর্শন করায়। তাহলে দেখা গেল ভগবান প্রীত হলেও কষ্ট আসে। তবে কষ্ট যেটি এসেছে সেটি কর্মফলে না ভগবানের প্রীতিতে কেমন করে বুঝা যাবে? পার্থক্য বুঝা যাবে। কষ্ট হলে যদি ভগবানে স্বাভাবিকভাবে রতি আসে তাহলে বুঝতে হবে এ কাজটি ভগবানের কাছ থেকে এসেছে। কারণ যার থেকে যার উৎপত্তি তাতে তার স্বাভাবিক রুচি থাকে। যেমন পিতাতে পুত্রের, সাগরে জলবিন্দুর স্বাভাবিক প্রীতি দেখা যায়। তেমনি দুঃখ যদি ভগবানের প্রীতি থেকে আসে তাহলে সে দুঃখ ভগবানেতেই যাবে। এই দুঃখকে লক্ষ্য করেই তুলসীদাসজী বলেছেন—

দুখমে বলিহারি যাই
সুখমে পড়ুক বাজ—

পাণ্ডবজননী কুন্তী এই দুঃখ এই বিপদই প্রার্থনা করেছেন। কুন্তীমা এমনই ভক্ত যে ভগবানের কাছে বিপদ প্রার্থনা করেছেন। তাই তাঁর ধারে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। কুন্তীমার প্রার্থনা শুনে সমস্ত জগৎ

বিস্মিত হয়ে গিয়েছে। কুন্তীমার প্রার্থনায় ব্রহ্মাণ্ড বিচলিত হয়েছে। কৃষ্ণভক্ত সব পারে। পৃথুরাজাও বলেছেন—হিতৈষী পিতা যেমন পুত্রের হিত ও প্রয়োজন বুঝে জিনিস দেন তুমিও জগতের পিতা সেইরকম বুঝে জীবকে দিও। এই পর্য্যন্ত পৃথুরাজ অগ্রসর হয়েছেন—তাই তাঁকে ধন্য বলা হয়। এরও অনেক ওপরে কুন্তীমায়ের কথা। গোবিন্দবদন রূপ ধন্বন্তরির যদি আবির্ভাব হয় তাহলে বিপদ তক্ষক আসুখ না কেন তাতে ক্ষতি কি? গোস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত হল ভগবানের নাম উচ্চারণমাত্রে প্রারব্ধ পর্য্যন্ত নাশ হয়ে যায় অপ্রারব্ধ যে চলে যাবে তার আর বেশী কথা কি? ভক্তি প্রারব্ধহারিণী। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ভক্তিমহারাণীর লক্ষণ করেছেন—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥

এই ভক্তিরসের আস্বাদ যারা পেয়েছে তাদের কাছে মোক্ষও খাতোদকের মত তুচ্ছ বলে মনে হয়। ভগবানের কথারূপ অমৃতসাগরে যারা নিরন্তর সন্তরণ করে তাদের কাছে চতুর্ব্বিধা মুক্তি, অষ্টসিদ্ধি, নবনিধি সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা পদের অর্থ হল ভক্তি অনুষ্ঠান করলে সে ভগবানের আনন্দ এনে দেবে তা নয় ভক্তিমহারাণী নিজেই আনন্দময়ী। এই ভক্তির আনন্দ পাবার জন্য ভগবান নিজেও লুব্ধ। যে আনন্দ আস্বাদনের লোভে পড়ে গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়েছেন। রাধাপ্রেম আস্বাদনের জন্যই গোবিন্দের গৌর অবতার। ভক্তির পরিপাক দশায় প্রেমলাভ। জীবকোটিতে এই প্রেম পর্য্যন্ত হয়। প্রেমের পরে যে যে অবস্থা আছে তা জীবে হয় না—সেগুলি থাকে ভগবানের নিত্যপরিকরকে আশ্রয় করে। প্রেম ঘন হলে স্নেহ, স্নেহ ঘন হলে মান, মান ঘন হলে প্রণয়, প্রণয় ঘন হলে রাগ, রাগ ঘন হলে অনুরাগ, অনুরাগ ঘন হলে ভাব, ভাব ঘন হলে মহাভাব। এই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। নদী ছেড়ে যেমন মাছ বাঁচে না, সাগর ছেড়ে যেমন মকর বাঁচে না তেমনি কৃষ্ণার্ণব ছেড়ে গোপী বাঁচে না। যে

কূল শীল মর্য্যাদা কিছুতেই লঙ্ঘন করা যায় না গোপীকুলশিরোমণি শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী কৃষ্ণপিপাসার আধিক্যে সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেছেন। রাধার কৃষ্ণভক্তি বললেও ঠিক বলা হল না। কৃষ্ণভক্তিই রাধা। এইটি বললে তবে ঠিক বলা হয়। রস ঘন হয়ে হয়ে ঘন হয়ে হয়ে ক্রমে গুড়, চিনি, মিছরি, সিতা মিছরি হবে। তেমনি প্রেম ঘন হয়ে মহাভাবে পেঁছয়। প্রেম হলে তবে ভগবদ্দর্শন। কৃষ্ণভক্তির চরম পরম অবস্থা হলেন শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। সূর্য্যের জ্যোতি বলা হয় কিন্তু সূর্য্যই জ্যোতি। তেমনি রাধার কৃষ্ণভক্তি বলা হয় কিন্তু কৃষ্ণভক্তিই রাধা। কৃষ্ণভক্তি বস্তুটি কৃষ্ণের নিজের নেই। ভক্তের কাছে সেটি আছে। যেমন মধু পদ্মে থাকে বটে কিন্তু সে মধু পদ্মের কাছে গেলে তো পাওয়া যাবে না—পাওয়া যাবে মধুকরের কাছে গেলে যে মধু সংগ্রহ করে রাখে। নদীর জলে মাছ থাকে কিন্তু নদীর জলে মকরের গা ডোবে না। তেমনি কৃষ্ণসাগর ছাড়া গোপী মকর বাঁচে না। কৃষ্ণহারা হয়ে তাহলে গোপী মকর কেমন করে বাঁচে? তারা তো কৃষ্ণসাগর ছাড়া বাঁচে না। তারা তো অন্য জলে তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। কৃষ্ণহারা অবস্থায় কৃষ্ণলীলাকথামৃতসাগরে গোপী মকর বেঁচে আছে। কৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ নিয়ে চলে গেছেন। তাঁর স্বরূপে তাঁর স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু তাঁর কথায় তাঁর কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। কৃষ্ণহারা অবস্থায় কৃষ্ণকথা নিয়ে গোপীরা বেঁচে আছে। কৃষ্ণকথা কওয়া মানেই ভক্তি। এই ভক্তিমহারাণীর স্বরূপ হলেন সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা। ভক্তি নিজের স্বরূপের আনন্দেই মগ্ন। এই আনন্দে গোবিন্দ স্বয়ং লুব্ধ। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে সাধকের কাছে এনে দেয়। তাই তাঁকে বলা হয়েছে ‘শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা।’ ভক্তিকে ক্লেশঘ্নী বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয়বিধ পাপ বিনাশ করে। পাপের বীজ হল অবিদ্যা। এই অবিদ্যা থেকেই ত্রিবিধ তাপের উৎপত্তি—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ জ্বালা। জ্ঞানাগ্নি সাধনে প্রারব্ধ নষ্ট হয় না। অপ্রারব্ধ নাশ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র বলেন ভক্তি প্রারব্ধকেও নাশ করে। গোপবালারা

বললেন—তব কথামৃতম্……তোমার কথামৃত কল্মষাপহম্। স্বামিপাদ টীকায় বলেছেন—তোমার কথামৃত স্বর্গের অমৃত ও জ্ঞানামৃতকেও তুচ্ছ করে। সবচেয়ে উত্তম হল তোমার কথামৃত। স্বর্গের অমৃত কামাদি সন্তাপ বৃদ্ধি করে। জ্ঞানামৃতও গোবিন্দপাদপদ্মমাধুর্য্য আস্বাদনের বিরহ-সন্তাপ বাড়ায়। একমাত্র ভগবানের কথামৃত ভগবানের বিরহজ্বালার নিবৃত্তি করে। তাই শ্রীশুকদেব বলেছেন—

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥ —ভাঃ ২।১।৭

আত্মারাম মুনিগণও প্রায় ভগবান হরির কথারসে নিমগ্ন হন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভক্তির বলে যদি প্রারব্ধই নাশ হয় তাহলে দেহ থাকে কেমন করে? কারণ প্রারব্ধের ফলেই তো দেহ ধারণ হয়। প্রারব্ধ নাশ হলে দেহও তো নাশ হবে। কারণ "নিমিত্তস্য অপায়ে (বিনাশে) নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়ঃ স্যাৎ।" ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে প্রারব্ধ নাশ হয় না তাই মুক্ত হলেও তাদের দেহ থেকে যায়। এর ফলেই জ্ঞানীদের জীবন্মুক্ত দশা হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভক্তির দ্বারা যে প্রারব্ধ নাশ হয় এ বুঝা যাবে কেমন করে? কপিলভগবানকে মাতা দেবহূতি বলেছেন—"শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।" চণ্ডাল যখন সবনযোগ্য (যজ্ঞ করবার যোগ্য) দেহ পেল ভক্তির আবির্ভাবে তখন বুঝতে হবে ভক্তিস্পর্শে চণ্ডালের দুর্জাতিত্ব চলে গিয়েছে। তার চণ্ডালদেহের নাশ হয়ে গিয়েছে। দেহই যদি নাশ হয় তাহলে ভক্ত বেঁচে থাকে কেমন করে? এই ভক্তের দেহরক্ষার দায় ভগবানের নিজের। প্রারব্ধ তার নাশ হয়ে যায় কিন্তু দেহ থাকে; তার কারণ হল প্রারব্ধের মত আর একটি কর্ম তার তৈরী হয়, তার নাম অপূর্ব্ব। এই অপূর্ব্ব কর্ম প্রারব্ধবৎ কিন্তু প্রারব্ধ নয়। কিন্তু প্রারব্ধের মতই যদি হয় তাহলে প্রারব্ধ আর প্রারব্ধের মত এই দুইএর মধ্যে তফাৎ কি? এই তফাৎটিই পিঙ্গলা বলেছেন ক্লেশ সকলেরই হয় কিন্তু ভগবানের দেওয়া ক্লেশ ভগবানেতেই রতি জন্মায় আর অন্য ক্লেশ ভগবানেতে বতি জন্মায় না। যেমন সোনা আর

সোনার মত। কষ্টিপাথরে ঘসলে বুঝা যাবে খাঁটি সোনা কোনটি। ভগবানের দেওয়া ক্লেশ থেকে যে নির্ব্বেদ তার থেকে ভগবানে রুচি হয়। মহারাজ যযাতি, সৌভরি মুনি নির্ব্বেদ পেয়ে পরম মঙ্গল পেয়েছেন। এ নির্ব্বেদে গৌরগোবিন্দে রুচি হয়। পিঙ্গলা বলছেন—অতএব ভগবানের দেওয়া এ উপকার আমি কখনও ভুলব না। "তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ। ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্।" তাঁর দেওয়া নির্ব্বেদ মাথায় করে নিলাম। বিষয়বাসনা দুরাশা ত্যাগ করে একমাত্র জগদীশ্বরকেই শরণ নেব। পিঙ্গলা মনে মনে ভাবছেন যথালাভেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আমি এখন যে সংসারকূপে পড়ে ছিলাম বিষয় সম্পদ্ আমাকে গ্রাস করে নিয়েছিল—কালরূপ ব্যালসর্প আমাকে গ্রাস করে রেখেছিল, তার থেকে আমাকে একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন আর কে রক্ষা করতে পারে? শ্রীভগবানের করুণায় যে নির্ব্বেদ আমি লাভ করলাম এই নির্ব্বেদই আমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে—এইটিই আমার নিশ্চিতা মতি। এর থেকে আমি আর কখনও বিচলিত হব না।

পিঙ্গলার এই নির্ব্বেদ অনুভব করে অবধূতজী মন্তব্য করছেন—এইভাবে নিশ্চিতামতি পিঙ্গলা জগতের প্রতি তৃষ্ণা ত্যাগ করে প্রাকৃত পুরুষলালসা ত্যাগ করল। এর পরে পরম শান্তি ও নির্ব্বেদ লাভ করে শয্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে উপবেশন করল। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে আশা করলেই এ জীবনে দুঃখ পেতে হয় আর যদি আশা করা না যায় তাহলেই পরম সুখ। যেমন পিঙ্গলার যতদিন প্রাকৃত পুরুষের প্রতি লালসা ছিল ততদিন তার সুখ ছিল না। কিন্তু যখনই কান্তের প্রতি আশা ত্যাগ করেছে তখনই সুস্থির হয়ে সুখে নিদ্রা যেতে পারল। তাই প্রাকৃত আশা করে অপ্রাকৃত পরম-পুরুষে তৃষ্ণা দিতে পারলেই পরম সুখ লাভ করা যায়। ২৯-৪৩

ইতি শ্রীএকাদশে অষ্টম অধ্যায়ে টিকাসম্মত ব্যাখ্যা।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্‌যৎ প্রিয়তমা নৃণাং।
অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্‌ যস্ত্বকিঞ্চনঃ ॥ ১
সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত ॥ ২
ন মে মানাপমানৌ স্তো ন চিন্তা গৃহপুত্রিণাং।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ ॥ ৩
দ্বাবেবাচিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ।
যো বিমুক্তো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥ ৪
ক্বচিৎ কুমারী আত্মানং বৃণানাং গৃহমাগতান্‌।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ

নবম অধ্যায়ে কুররাদি সাতজন গুরুর কাছে অবধূতজী যে শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়সখা উদ্ধবজীর কাছে বর্ণনা করছেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—হে মহারাজ। কুরর পক্ষীর কাছে শিক্ষা মানুষের যে যে বস্তুর প্রতি অত্যন্ত প্রিয়তা সেই সেই বস্তুর প্রতি আসক্তিতেই মানুষ দুঃখ পায়। অতএব যে ব্যক্তি অকিঞ্চন অর্থাৎ সব ত্যাগ করতে পারে তারই অনন্ত সুখ লাভ হয়। ১

নিরামিষ বলশালী কুররপক্ষী সামিষ বলহীন পক্ষীকে বধ করে তার আমিষ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে যদি আমিষের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে তাহলেই সুখী হয়। কারণ যতক্ষণ আসক্তি ততক্ষণই দুঃখ॥ ২

অবধূতজীর আর একজন গুরু হলেন বালক। বালকের যেমন মান

অপমান বোধ নেই অথবা গৃহ পুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন চিন্তা নেই সেইরকম আমিও আত্মক্রীড় আত্মরতি হয়ে এ জগতে বালকের মত বিচরণ করি। ৩

অজ্ঞ চেষ্টাশূন্য বালক এবং অজ্ঞানের পরপারে যাঁরা গিয়েছেন পরম জ্ঞানবান হয়ে ঈশ্বরকে পেয়েছেন এই দুই ব্যক্তিই চিন্তারহিত ও পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। ৪

এক অবিবাহিতা কন্যা (কুমারী) অবধূতজীর আর একজন গুরু। কোনও একদিন এক কুমারীর পিতামাতা গৃহে উপস্থিত ছিলেন না— ঠিক সেই সময় বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে কুটুম্ব আসে। কুমারী তাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করেছিল। ৫

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব ।
অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ ॥ ৬
সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ ॥ ৭
উভয়োরপ্যভূদ্‌ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্বশঙ্খয়োঃ ।
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্ধ্বনিঃ ॥ ৮
অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম ।
লোকাননুচরন্নেতান্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ॥ ৯
বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি ।
এক এব বসেত্তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ

হে মহারাজ । পরে সেই কুটুম্বদের ভোজন করাবার জন্য কুমারী নির্জনে উদূখলে মুষল দিয়ে কতকগুলি ধান অবহনন করতে লাগল (ধান ভানতে লাগল)। সেই অবঘাতে তার হাতের শঙ্খবলয়ের শব্দ হতে লাগল। ৬

তখন কুমারী তাতে লজ্জা পেয়ে (কারণ কুটুম্বরা তাদের দারিদ্র্য জানতে পারবে এই আশঙ্কায়) দুই হাতে দুই দুই গাছি শাঁখা রেখে আর বাকী শাঁখা সব ভেঙ্গে ফেলল যাতে আর শব্দ না হয়। ৭

এর পরে আবার ধান ভানতে লাগল—তখনও দুই গাছিরই শব্দ হতে লাগল দেখে আবার এক গাছি করে দুগাছি শাঁখা দুই হাতে রাখল অন্য দুগাছি ভেঙ্গে ফেলল। তাতে দেখল আর শব্দ হচ্ছে না। ৮

হে অরিন্দম অর্থাৎ শত্রুনাশন্! লোকতত্ত্ব জানবার জন্য আমি যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করতে করতে সেই কন্যা থেকে এই উপদেশ গ্রহণ করেছি। এটি আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। ৯

বহু লোক একত্র বাস করলে কলহ অবশ্যম্ভাবী। এমনকি দু'জন যদি এক জায়গায় বাস করা যায় তাহলেও পরস্পরের কথোপকথনে বিবাদ

হবেই। তাই সাধুব্যক্তির কর্ত্তব্য হল কুমারীর কঙ্কণের মত সর্ব্বদা একাকীই বাস করবে। ১০

এই নবম অধ্যায়ই অবধূতসংবাদ প্রসঙ্গে শেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সাতজন গুরুর কথা অবধূতজী বলেছেন। তাঁদের কার কাছে কি কি শিক্ষা পেয়েছেন সেটি যদু মহারাজের কাছে বললেন – এই প্রাচীন প্রসঙ্গটি আবার শ্রীকৃষ্ণভগবান তাঁর প্রিয় সখা উদ্ধবজীর কাছে বলেছেন।

শ্রীঅবধূতজী মন্তব্য করছেন—এই পৃথিবীতে যে কোন বস্তুকে প্রিয়তম বলে গ্রহণ করা যায় সবই দুঃখের কারণ হয়। প্রিয়তমের গ্রহণই দুঃখের। এটি সূত্ররূপে বিধান করলেন। শ্রীসপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদজী বলেছেন—যেখানে যেখানে মমতা সেখানে সেখানে দুঃখের শলাকা পোঁতা আছে। প্রিয়বস্তুর গ্রহণই যে দুঃখময় এ বোধ আমাদের কিছুতেই হল না। যার থেকে দুঃখই পাব, সুখ কিছুতেই পাব না তাই পয়সা দিয়ে কিনে আনি। জ্যান্ত বিছে কেউ যদি পয়সা দিয়ে কিনে আনে সে যেমন অত্যন্ত নির্ব্বোধ আমরাও তেমনি অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত আয়ু মূল্য দিয়ে নশ্বর জিনিস কিনে আনছি। শ্রীতুলসীদাসজী বলেছেন—

দেনে কো টুকরা ভাল।
লেনে কো হরিনাম॥

প্রকৃতির বিষয় তো চারিদিকে ছড়ান আছে। তাকে এড়ানোর কোন উপায় নেই। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় তা এড়ান যায়। লব্ধবুদ্ধি শুধু হতে পারা যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায়। "শ্রীগুরুচরণ-প্রসাদাৎ লব্ধবিবেকঃ।" এই গুরুকৃপা মানুষ পায় কখন?

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
শ্রীগুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

অবধূতজী এখানে বললেন—যে ব্যক্তি অকিঞ্চন তদ্বিদ্বান্ (বিষয় ভোগ দুঃখের বলে বুঝেছে) সে ব্যক্তি অনন্ত সুখ লাভ করে। অর্থাৎ গুরুরূপী কৃষ্ণপ্রসাদ যে লাভ করেছে সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্; বই মুখস্থ

করার নাম বিদ্যা নয়—যস্তু ক্রিয়াবান্ স বিদ্বান্। সমাধি বৈশ্য ও সুরথ-রাজা তাদের জ্ঞানের কোন দাম নেই যদি মেধস মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ না হত। যারা মদ্যপান করে তারা সর্ব্বনাশ হচ্ছে জেনেও যেমন তা ছাড়তে পারে না আমরাও তেমনি প্রাকৃত বিষয় ভোগ করে নিত্য ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছি বুঝতে পেরেও বিষয় ভোগ ছাড়তে পারি না। শাস্ত্রে তাই ভগবান নিজে বললেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

—ভাঃ ১১।২৬।২৬

একমাত্র মহৎ করুণা ছাড়া আসক্তি ত্যাগের আর কোন উপায় নাই। গৌরগোবিন্দ দর্শন না হলে এ চোখ দিয়ে কি কাজ হবে? অবধূতের এক গুরু কুরর পক্ষী। কুরর পক্ষীর কাছে অবধূত কি শিক্ষা করেছেন তাই বলছেন—কুরর পক্ষীর মুখে মাংসখণ্ড দেখে অন্য নিরামিষ বলবান পক্ষী তাকে তাড়া করে, যখন সে মুখ থেকে মাংসখণ্ড ফেলে দেয় তখন সে নিশ্চিত হতে পারে। আমরাও তেমনি চিত্ত-মুখে বিষয়-মাংসখণ্ড গ্রহণ করে অনবরত কালের ঠোক্কর খাই। ভগবান হলেন নির্ব্বিষয় তাই তাঁর আশ্রয় নিলেই একমাত্র বিষয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। যার যত সম্পদ্ তার তত বিপদ্। কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। বিষয়গ্রহণ করা খারাপ নয় কিন্তু তাতে প্রিয়তা বুদ্ধি না রাখলেই হল। প্রিয়তাই দুঃখ সৃষ্টি করে। বিষয় ছাড়া যায় না কিন্তু বিষয়ের প্রতি প্রিয়তা বুদ্ধি ছাড়তে হবে। কর্মফলে আমরা এসেছি। এ জগতের আত্মীয়স্বজন কারুর সঙ্গেই আমার কোন সম্বন্ধ নেই। যে বস্তুতে যত মমতা তার বিয়োগে তত দুঃখ। বলা আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় যেমন জলসত্রে পথিকে পথিকে দেখা হয় সেইরকম। পথিকে পথিকে পথের আলাপন। ‘প্রপায়ামিব সুব্রত।’ কর্মফল শেষ হলেই জীবন চলে যাবে। আমার আমার বোধটি কমলেই দুঃখ কমবে। তাই অবধূত বললেন তদ্বিদ্বান্ অর্থাৎ এটি জানলেই দুঃখের পরিমাণ কমবে। অকিঞ্চন

ব্যক্তি সুখফল পাবে। বিষয় ফেলে দিলেই পরিত্রাণ। শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ এঁরা সকলেই বিষয়বিষ পরিত্যাগ করেছিলেন।

অবধূতের পরবর্ত্তী গুরু এক বালক। বালকের যেমন মান অপমান কোন চিন্তা নেই, গৃহ পুত্র সম্বন্ধে কোন চিন্তা নেই। সে নিজের মনে খেলা করে, নিজের আনন্দে নিজে বিভোর—আত্মক্রীড় আত্মরতি। অবধূত বলছেন এই বালকের মত আমি বিচরণ করি। তাহলে কি অজ্ঞ ও বিজ্ঞ একই পর্য্যায়ে পড়বে? না, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ এক পর্য্যায়ে পড়বে না। না জেনে অর্থাৎ অজ্ঞানতার ফলে অজ্ঞ আর সম্পূর্ণ জেনে বিজ্ঞ। প্রকৃতিপারঙ্গত ও শিশু দুইই সমান।

এর পরবর্ত্তী গুরু শ্রীঅবধূতজীর এক কুমারী। অবধূত যদু মহারাজকে সম্বোধন করে বলছেন—'হে পার্থিব, হে রাজন্, সাধারণ গৃহস্থের ঘরের কথা বলি শুনুন। আপনি তো রাজা, তাই বুঝতে পারবেন। এক কুমারী আমার গুরু। একদিন অবধূতজী ভ্রমণ করতে করতে এক গৃহস্থের ঘরে অতিথি হন। গৃহস্থ এবং তাঁর স্ত্রী সেদিন বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের একটি অবিবাহিতা কন্যা ঘরে আছে—সেদিন আবার তার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কুটুম্বরা তাকে দেখতে এসেছেন। কুমারী নিজেই ধান ভেনে কুটুম্বদের খাওয়াবে। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলেছেন—"তৎ শাল্যবহননং দারিদ্র্যদ্যোতকত্বাৎ জুগুপ্সিতম্।" দারিদ্র্যের দ্যোতক বলেই মহতী অর্থাৎ বুদ্ধিমতী কুমারী লজ্জিতা হয়েছিল। কারণ ধান ভানার শব্দে কুটুম্বরা ভাববে যে এরা এতই দরিদ্র যে অতিথি এলে ধান ভেনে চাল করে তবে রান্না করে খাওয়াতে হয়—এতেই তার লজ্জাবোধ। অবধূত বলছেন—লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া কুমারীর আচরণ আমি শিক্ষা করেছি। মহাজনের আচরণ শিক্ষণীয়।

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম।
লোকাননুচরন্নেতাঁল্লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া॥ —ভাঃ ১১।৯।৯

কুমারীর দুই হাতে কতকগুলি শাঁখা ছিল—ধান ভানার সময় ঝনঝন করে

শব্দ হওয়ায় পাশের ঘরে কুটুম্বরা জানতে পারবে তাতে লজ্জা বোধ হওয়ায় কুমারী দুই হাতেরই কয়েক গাছি করে শাঁখা ভেঙ্গে ফেলল—এ হাতে দুগাছি ও আর একহাতে দুগাছি রাখল। পরে আবার ধান ভানছে—দেখল তাতেও ঠুংঠাং শব্দ হচ্ছে। তখন একগাছি করে ভেঙ্গে ফেলে এ হাতে একগাছি ও হাতে একগাছি করে রাখল। তাতে দেখল আর শব্দ হচ্ছে না—তখন কুমারী নিশ্চিন্ত হল। অবধূত বলছেন কুমারীর কাছে আমি এইটিই শিক্ষা করলাম—

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্ বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ॥ —ভাঃ ১১।৯।১০

কুমারীর যেমন বহু শাঁখায় বেশী শব্দ হচ্ছিল, যখন দুগাছি করে ছিল তখনও অল্প শব্দ হচ্ছিল আর যখন একগাছি করে রইল তখন যেমন আর শব্দ হয় নি—কুমারী নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল, তেমনি সাধনক্ষেত্রে বহুলোক একত্র থাকলে বিবাদ বিসংবাদ কলহ হয় আর যদি দু'জন একায়গায় থাকা যায় তাহলেও একটু কথাকাটাকাটি হবেই। তাই সাধনপথে একাকী বিচরণ করতে হবে কুমারীর কঙ্কণের মত। একাকী থাকলে আর বিবাদ বিসংবাদের সম্ভাবনা নেই—নিশ্চিন্ত হয়ে সাধন করা যাবে। এইটিই উপদেশের সার। শ্রীএকাদশে নবযোগীন্দ্র উপাখ্যানে বাক্য আছে প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের—

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্॥

—ভাঃ ১১।৩।২৩

সব সঙ্গ ত্যাগ করে একাকী থাকবার উপদেশ করেছেন কিন্তু প্রথমে সাধুসঙ্গের উপদেশ করা হয়েছে। অন্যত্র ভগবান বলেছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

—ভাঃ ১১।২৬।২৬

জনসঙ্গ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে কিন্তু সাধুসঙ্গ করতে বলা হয়েছে। কারণ সাধুর সঙ্গকে সঙ্গদোষ যাকে বলে সে সঙ্গদোষ বলা হয় নি। অর্থাৎ সঙ্গ-

জনিত যে আসক্তি সে দোষ সাধুসঙ্গে প্রবেশ করে না। বিশেষ করে সাধুসঙ্গ মানুষের জীবনে একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীনামসংকীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভু যৌথ ভজনের কথা বলেছেন—

বাপে মায়ে ঝিয়ে মিলে কর সংকীর্ত্তন।

এই সংকীর্ত্তনের আদর্শস্থল হল কৈলাস। সেখানে পিতামাতা শিব শিবানী পুত্র গণেশকে নিয়ে নামসংকীর্ত্তন করেন। ভক্তিঅঙ্গ যাজন কোথাও নিঃসঙ্গ বলা হয় নি। শ্রীতৃতীয়েও বলা আছে সাধুসঙ্গের সূত্র ধরেই মুক্তির দরজা খুলবে। সাধুসঙ্গ মুক্তির দরজা খোলার সূত্র কেমন করে হয়? প্রশ্ন হতে পারে এই সাধু কে? সাধু হলেন ভগবানের প্রিয়জন। ভগবানের প্রিয়জনকে ভালবাসলে ভগবানের দৃষ্টি তার ওপর পড়ে। সেই সূত্রে অনাদিকালের অবিদ্যা মালিন্য মোচন হয়ে যায় এবং মুক্তির দরজা খুলে যায়। ভক্তিধর্মে নিঃসঙ্গ জীবনের প্রশংসা প্রায় করা হয় নি। ধ্রুবও ভগবান বৈকুণ্ঠনাথের কাছে সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করেছেন—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো।
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্॥
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং।
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ —ভাঃ ৪।৯।১২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত উপদিষ্ট ভজনপন্থা হল যৌথভজন এই সংকীর্ত্তন। শ্রীজীবপাদ সংকীর্ত্তনের লক্ষণ করেছেন—বহুভির্মিলিত্বা গানসুখম্। বর্ত্তমান সরকারের ছাপ দেওয়া মুদ্রা যেমন স্বীকার করতেই হয় তা সে যত কমমূল্যই হোক্। বেশী দামের টাকাও (স্বর্ণমুদ্রা) বর্ত্তমান সরকারের ছাপ দেওয়া না হলে সেটিও অচল। সংকীর্ত্তনে বর্ত্তমান যুগাবতার গৌর সরকারের ছাপ দেওয়া আছে—তাঁর অনুমোদিত, তাই সেটি সচল। মহাপ্রভু বড় হর্ষে বলছেন—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥

এখানে অবধূত যে বললেন একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে বিচরণ করবে অথচ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে উপদেশ যৌথভজন দুটিতে যে বিরোধ দেখা যায়। না, এখানে বিরোধ নয়—দুটি বাক্যের দুটি দিক্ আছে। অবধূতের বাক্য জ্ঞানমার্গ ঘেঁসা। ভক্তিমার্গের কথা নিঃসঙ্গ নয়। ভক্তিমার্গে ভক্তসঙ্গ চাই-ই। তা না হলে ভক্তি পুষ্ট হয় না। প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণে যোগীন্দ্র বলেছেন—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ —ভাঃ ১১।২।৪৭

ভগবানকে বিধিমত আরাধনা করেও যারা ভক্ত আরাধনা করে না তারা প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত। ভক্তিরসের আস্বাদন তাদের হৃদয়ে তখনও প্রবেশ করে নি। কারণ ভক্ত আরাধনা ভগবানের আরাধনার চেয়েও বড় এ বোধ তাদের হয় নি। ভগবানের নিজের বাক্য আছে—মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা। শিববাক্য আছে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

ভক্ত বৈষ্ণব জগতে দ্বাদশজন প্রসিদ্ধ। ধর্মরাজ যম বলেছেন—

স্বয়ম্ভুঃ নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলি বৈয়াসকিঃ বয়ম্॥

এই দ্বাদশজন ভাগবতধর্মবেত্তা। ভাগবতধর্ম বলতে গোবিন্দভজনধর্ম। নারদ এবং কুমার (চতুঃসন) ব্রহ্মার পুত্র। এঁদের মধ্যে নারদ কনিষ্ঠ তথাপি নারদের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে, পরে বলা হয়েছে কুমারের নাম। কারণ বয়সে কুমার বড় হলেও ভক্তিমার্গে কৃপা আগে যিনি লাভ করেছেন তাঁরই জ্যেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়েছে। কুমারগণ প্রথমে জ্ঞানমার্গে ছিলেন। পরে ভক্তকৃপায় পিতা ব্রহ্মার কৃপায় তাঁদের ভক্তিলাভ হয়। তাই কুমারদের নাম পরে করা হয়েছে। যেমন সনাতন বড় হলেও কৃপা পরে পাওয়ায় সনাতনের নাম পরে উল্লেখ করা হয়েছে—

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

ভক্তিপথে ভক্তগোষ্ঠী চাই। ভক্তগোষ্ঠীতে না গেলে ভক্তিরস আস্বাদন হয় না। ভক্তিমার্গে নিঃসঙ্গ হলে ভক্তি আস্বাদন হয় না। কলিযুগের সাধন নামকীর্ত্তনের ওপর গৌর সরকারের ছাপ দেওয়া আছে। তাই তাতে ষোল আনাই পাওয়া যাবে। যেমন বর্ত্তমানে কাগজের টাকার কোন মূল্য না থাকলেও ষোল আনাই পাওয়া যায়। ভগবানের নাম তার দাম সব যুগেই সমান। কোনকালেই তার দাম কম নয়। প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমানজী, গোপরামাগণ স্বয়ং সকলেই এই নামের সাধক। যে হরিনামের এত মহিমা কোন যুগে যার দাম কিছু কম নয় সেই হরিনামের ওপর কলিজীবের সৌভাগ্য বশে গৌর সরকার ছাপ দিয়েছেন। আমাদের কর্ত্তব্য হল মুখে গৌরগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করতে হবে। দাম দেওয়ার কথা যার নাম সে বুঝবে। মহাজন সাধুসঙ্গের প্রশংসা করে বলেছেন—

সাধুসঙ্গ ঘেরা করি সজ্জান প্রহরী ধরি
অনুরাগে থাকিয়া সদাই
কাম ক্রোধ আদি ছাগ খেদারিয়ে দিবে তাক্
জালি শাখা পল্লব চাবায়।

ছোট চারা গাছকে যেমন গরু ছাগলের মুখ থেকে বাঁচাতে হলে বেড়া দিয়ে রাখতে হয় তেমনি শ্রীগুরুদত্ত ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হলে কামক্রোধাদি দ্বারা সে অঙ্কুর নষ্ট হবে, তাই সাধুসঙ্গের ঘেরা দিতে হয়। শ্রীগুরুকৃপা অযাচিতভাবেই আসে। অনেক জায়গায় মনে হয় আমি চাইবার পরে তো কৃপা করেছেন তবে অযাচিত হল কি করে। এখানে সমাধান হল আমি যে তাঁর কাছে কৃপা চাইছি সে কৃপা চাওয়াও তাঁর কৃপার ফলেই সম্ভব হয়েছে। কাজেই কৃপা অযাচিতই থাকল। তাই মহাজন বললেন—

অযাচিত মো হেন পতিত হেরি যো পঁহু
যাচি দেওল হরিনাম।

শ্রীগুরুদত্ত বীজ তো কাজে লাগাতে হবে। মাটি খুঁড়ে জল দিতে হবে। মাটি খোঁড়া হল নিজের দুর্ভোগ স্মরণ করা। দেহান্তে দেহের কি অবস্থা স্মরণ করতে হবে। আর জলসেচন হল শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধুসঙ্গে ভক্তের

সঙ্গে নিজেকে অনুক্ষণ রাখতে হবে। ভক্তিপুষ্টির পক্ষে সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। এখানে নিঃসঙ্গ হলে কাজ হবে না। তবে অবধূতজী যে একাকী বাস করবার কথা বললেন—এটি জ্ঞানমার্গের কথা।

যৌথভজনে গোপীরা শ্রীযমুনাপুলিনে একত্র মিলিত হয়ে কৃষ্ণগুণগান করে তাঁদের হারানো কৃষ্ণকে ফিরে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ গোপরামাগণের পাওয়াই ছিল—কিন্তু সেই কৃষ্ণ হারিয়ে গিয়েছে সেই হারানো কৃষ্ণ ফিরে পাবার একমাত্র উপায় হল নামসংকীর্ত্তন। অর্থাৎ কৃষ্ণগুণ গান করা। কারণ কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়। মহাজন বলেছেন—

বৃন্দাবনেঽথবা নিজমন্দিরে বা
কারাগারেঽথবা কনকাসনে বা
শ্রীকৃষ্ণভজনমৃতে ন সুখং কদাপি॥

তাঁকে প্রাণভরে বার বার কাতর হয়ে ডাকতে হবে। হাটের মাঝে ডাকতে গেলে যেমন বার বার ডাকতে হয় তা না হলে হাটের গোলমালে শোনা যায় না, তেমনি এই মহামায়ার হাটেও ডাকলে সে ডাক তাঁর কাছে সহজে পেঁছয় না। তাই বার বার ডাকতে হবে। তা না হলে তাঁর কাছে ডাক পেঁছুবে না। ঘন করে ডাকতে হবে। শ্রীযোগীন্দ্র বলেছেন—

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজংস্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

—ভাঃ ১১।২।৪৩

বার বার ডাকতে হবে। চন্দন যেমন বার বার ঘষলে তবে পরিমল পাওয়া যায় তখন সেই পরিমল নাসিকা মাতিয়ে প্রাণ মাতায়। চন্দনপিঁড়িতে চন্দনকাঠ ঠেকানমাত্র পরিমল ওঠে না। চন্দনপিঁড়ি হল আমাদের কান এবং জিহ্বা, তাতে ভগবানের নামরূপ চন্দনকাঠ বার বার ঘষতে হবে। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নাম রূপ গুণ লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করতে হবে। তবে তার আস্বাদন মন প্রাণ মাতাবে। আমাদের কৃষ্ণ খোঁজা হয় না। কৃষ্ণ পাওয়ার উপায় কি? গোপীরা নামকীর্ত্তন করে যেটি দেখিয়েছেন তাহলে গোপীদের আচরণ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল নামকীর্ত্তন কৃষ্ণ পাওয়ার

উপায়। উপায় যেটি গ্রহণ করা হবে সেটি নিঃসন্দেহ হওয়া চাই। গোপীরা একত্র মিলিত হয়ে মন্ত্রণা করেছেন—কৃষ্ণ হারিয়ে গিয়েছে সেই হারানো কৃষ্ণ কেমন করে পাওয়া যাবে এই মন্ত্রণা বড় প্রশংসনীয়। যদি পরামর্শ করতে হয় তাহলে কৃষ্ণ কেমন করে পাওয়া যাবে এই পরামর্শই করা উচিত। কৃষ্ণাত্মিকা গোপবালার দল 'সমবেতাঃ জগুঃ কৃষ্ণম্।' তাঁরা মিলিত হয়ে কৃষ্ণগুণগানই করেছেন। কৃষ্ণ পাওয়ার জন্য তাঁরা ধ্যান বা জপ করতে বসেন নি। তাহলে প্রমাণিত হল ধ্যান বা জপে কৃষ্ণ মেলে না। নামসংকীর্ত্তনেই হারানো কৃষ্ণ পাওয়া যায়। শ্রীশুকদেব তাই গোপরামাদের এই নামসংকীর্ত্তনকে কৃষ্ণ পাওয়ার প্রমাণ হিসাবে নিয়ে নামসংকীর্ত্তনেরই উপদেশ করেছেন। অবধূত যে বললেন- নিঃসঙ্গ থাকতে হবে, এ বাক্য জ্ঞানমার্গ ঘেঁষা। তবু এ বাক্যকে নিজেদের মার্গের অর্থাৎ ভক্তিমার্গের অনুকূল করে নিতে হবে।

অবধূতজী যে নিঃসঙ্গ হওয়ার কথা বললেন তা জ্ঞানমার্গের দিকে লক্ষ্য রেখে। ভক্তিযোগে নিঃসঙ্গ মানে সাধুসঙ্গ। রাজর্ষি ভরত জনসঙ্গ ভয়ে একাকী থাকতেন। সাধু মৌনব্রত অবলম্বন করলেও গোবিন্দ অনুরাগে কথা বলেন। গোবিন্দভজনের অনুরাগে যদি নিত্যকর্ম ভুল হয়ে যায়—তাহলেও দোষ হয় না। ভগবান নিজে বলেছেন—

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। —গীতা ৮।৬৬

এ বাক্যটি ভগবান তাঁর প্রতি অনুরাগের ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সকল বেদ সব শাস্ত্র তাঁরই গুণগান করে।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥ —ভাঃ ১।২।২৯

সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যাতে ভগবানে রতি হয়। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি কাজ করেন ভগবানের আদেশে তখন প্রার্থনা করেছিলেন যাতে মায়া তাঁকে মুগ্ধ না করে। ভগবান বললেন তাঁকে শরণ নিয়ে সৃষ্টি কাজ আরম্ভ

করলে মায়া আর ব্রহ্মাকে আক্রমণ করবে না। এক মন দুধের মধ্যে নবনীত থাকলেও হাতে পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনি বেদাদি শাস্ত্র যে গোবিন্দরতিই বুঝাচ্ছে এটি বুঝা যাচ্ছে না। ব্রহ্মা তাঁর মনীষাদণ্ডের দ্বারা সমগ্র বেদাদিশাস্ত্ররূপ দুগ্ধসাগর মন্থন করে নবনীত তুলেছেন। ভগবৎ-বিস্মৃতিই অমঙ্গল। ভগবানে উন্মুখতাই পরমমঙ্গল। অবিদ্যাজাত মূল বস্তু হল জীবের সূক্ষ্মদেহ। তার ফলে স্থূলদেহের জন্ম। স্থূলদেহ ধারণের ফলে দৈহিক যা কিছু—স্ত্রী পুত্র গেহ ধন সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। মায়ের প্রসব যেমন সন্তান তেমনি অবিদ্যার প্রসব হল দৈহিক যা কিছু সব। অনাদি ভগবদ্বিমুখ জীবেরই ভয় হয়। মায়া আক্রমণের ফলে এই ভয়টি ঘটেছে। কেমন করে ভয় হল? জীবকে অনাদি কৃষ্ণবিমুখ দেখে মায়া আক্রমণ করে প্রথমেই তার আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ করাল—এরই নাম অস্মৃতি এবং এই অস্মৃতির ফলে হল বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহে আমি বুদ্ধি এবং দৈহিক বস্তুতে আমার বুদ্ধি। অর্থাৎ যেটি আমি নই তাকে আমি বলে মনে করি আর যেটি আমার নয় তাকে আমার বলে মনে করি। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যোগীন্দ্র শ্রীকবি বিধান দিলেন সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করতে হবে। মায়াধীশকে ভজনা করতে হবে, মায়াকে ভজলে হবে না। আভজেৎ অর্থাৎ আসক্তি পূর্ব্বক ভজনা কববে—অনুরাগে ভজবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে ভজবে? অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ভজবে। এই ভক্তি কোথায় পাবে? শ্রীগুরু-পাদপদ্মে দেবতা অর্থাৎ ভগবৎবুদ্ধি করলে ও আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ প্রিয়তম বুদ্ধি করতে পারলে এই অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ হবে। তাহলে দেখা গেল সব শাস্ত্রই সাধুসঙ্গকে ভগবদ্বিমুখতারূপ ব্যাধির চিকিৎসারূপে বর্ণনা করেছেন। এখন কথা হচ্ছে ব্যাধির নির্ণয় হলে চিকিৎসার নির্ণয় হবে। কোন রোগী যাতে বাদ না যায়—এইজন্য নানা চিকিৎসক থাকেন। সকলের কর্ত্তব্য হল গোবিন্দ উন্মুখতার পন্থা দেখিয়ে দেওয়া। অন্য দেবতার পূজা করলে তাদের ওপরেও এই দায়িত্ব পড়ে। ছোট থেকেই এটি আরম্ভ হয়। গোবিন্দে রতি হওয়ার জন্যই সকল শাস্ত্রের সাধু

গুরুর উপদেশ কিন্তু ছোটতে অনেক সময় ধরা যায় না। ছোট শিশুকে যে পিতা সত্য কথা বলতে শেখান সেটি আর কিছুর জন্যই নয়। সত্য-সঙ্কল্প ভগবানে উন্মুখ হওয়ার জন্য। শ্রুতি তাই বললেন—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি···

কঠোপনিষদের এই বাক্যের সঙ্গে গীতাবাক্যের ঐক্য আছে। গীতায় ভগবান বললেন—

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ —গীতা ১৫।১৫

শ্রুতি উক্ত 'পদ'টি কাকে বুঝাচ্ছে ভগবান তাও বললেন—ভগবজ্‌জ্ঞানই 'পদ'শব্দের দ্বারা বুঝাচ্ছে। ভগবানের জ্ঞান মানে ভগবানের কথা। নিয়ম হল যার প্রতি উন্মুখ হতে হবে তার সমধর্মী হওয়া চাই। তার ভূমি আরম্ভ হয় এই জগতের শিক্ষা পিতামাতা শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। সঙ্গবিচারে বলা হল সসঙ্গতায় দোষ আর অসঙ্গতায় গুণ। যা ভগবৎ উন্মুখতার বিরোধী তাই দোষ আর যা উন্মুখতার অনুকূল তাই হল গুণ। তাহলে যে সঙ্গ ভগবৎ উন্মুখতার অনুকূল তা গুণ। এ সঙ্গ নিঃসঙ্গের চেয়েও উত্তম। এই স্বল্পায়ু জীবনে ভগবানের পাদপদ্ম তো পেয়ে যেতে হবে। যেমন মাত্র তিনঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে তখন যেমন হাজার বন্ধু হলেও তার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটান হয় না, এই জীবনেও তেমনি বৃথা সময় কাটাবার মত অবসর নেই। সময় নষ্ট করে হরিপাদপদ্ম পেয়ে না গেলে আবার চুরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করতে হবে। প্রহ্লাদ বলেছেন—হরিভজন আগে সেরে নাও। স্ত্রী পুত্র পরিবারে অনুরাগ হয়ে গেলে সাধু গুরুর মন্ত্রণা গ্রহণ করা আর সম্ভব হবে না। সসঙ্গ তখনই দুষ্ট যদি তা ভগবৎ উন্মুখতার বিরোধী হয়। যাতে ভগবৎ উন্মুখতার আনুকূল্য হয় সেটি সসঙ্গ হলেও অসঙ্গ বলেই বিবেচিত হবে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে গিয়েও সংসারের কথা ভাবে। ভগবৎ উন্মুখতার সঙ্গও নিঃসঙ্গ হবে। যেমন ভক্তিকে কর্ম বলা হয় না। কর্মের লক্ষণ শাস্ত্র বলেছেন—বেদ-বিহিতকর্মই কর্ম। বর্ণধর্ম আশ্রমধর্ম এগুলি কর্মের মধ্যে পড়ে। গীতাবাক্যে

ভগবান নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

—গীতা ১৫।১

বেদকে বৃক্ষের পাতা বলা হয়েছে। পাতা যেমন ছায়া রচনা করে পথিককে আকর্ষণ করে বেদের কর্মকাণ্ডও তেমনি ফলশ্রুতির ছায়া রচনা করে জীবকে ভুলিয়ে রাখে। ত্রিতাপদগ্ধ জীব বেদের কর্মকাণ্ডের ছায়ায় বিশ্রাম করে, ফলে মুগ্ধ হয়ে গন্তব্যস্থল কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুলে যায়। উর্দ্ধমূলম্—ভগবানই হলেন মূল—তিনি উপরে থাকেন। ভগবান বলেছেন—মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। শ্রুতিও বললেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।

ভগবান মূল—তাঁর নীচে হিরণ্যগর্ভাদি শাখা। এ সংসার অশ্বত্থ এবং অব্যয় দুইই। যে ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন ভক্তের চরণস্পর্শ পায় নি তার কাছে এ সংসার অব্যয় অর্থাৎ কোনদিন তার পক্ষে সংসার নাশ হবে না আর যে নিষ্কিঞ্চন ভক্ত সঙ্গ পেয়েছে তার পক্ষে সংসারের অচিরে বিনাশ হবে। তার সংসার আগামী কাল পর্য্যন্ত থাকবে না—তাই অশ্বত্থ। শ্বঃ অর্থাৎ আগামীকাল পর্য্যন্ত যার স্থিতি তাকে বলা হয় শ্বত্থঃ আর আগামীকাল পর্য্যন্ত যা থাকবে না তার নাম অশ্বত্থ। মুচুকুন্দরাজাও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ।

—ভাঃ ১০।৫১।৫৪

এ সংসারে ভ্রমণ করতে করতে যখনই সাধুসঙ্গ হবে তখনই পরমেশ্বরে মতি লাভ হবে।

তাই মহাজন বললেন—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

বাজারের থলি হাতে পচা মাছ কিনতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যদি পথে বৈষ্ণবদর্শন হয়ে যায় তাহলে মহালাভ। সাধুসঙ্গ হওয়া মাত্রই ভগবানে রতি হয়। তবে বুঝা যায় না কেন? ভজন বয়স হলে তবে সে ভগবৎ রতি বিকাশ পায়। যেমন শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন—'সত্যপি পুংস্ত্বে বালকে ন প্রকাশঃ।' গোপালতাপনীশ্রুতি ভজনের লক্ষণ করেছেন—ভক্তিরস্য (গোপালস্য) ভজনম্। তদিহামূত্রো-পাধিনৈরাস্যেণ অমুষ্মিন্নেব মনঃকল্পনম্। এতদেব নৈষ্কর্ম্যম্। মন যখন সব ছেড়ে শুধু গোপাল ভাববে তখনই তার নাম ভজন। আমাদের যা করা হয় তার নাম ভজন নয়। দুঘণ্টা ভজন আর দুঘণ্টা বিষয়চিন্তা একে ভক্তি বলা হবে না। মনের কাজ যদি শুধু গোপালকে নিয়ে হয় তার নাম হবে ভক্তি এবং এই ভক্তিরই নাম নৈষ্কর্ম। এই কথাই শ্রুতি বললেন। কর্ম বন্ধন ঘটায় আর নৈষ্কর্ম বন্ধনমোচন করে। ভগবান বললেন—

ক্ষিপামাজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু। —গীতা ১৬।১৯

আমি তাদের অধর্ম দোষের জন্য নরকরূপ সংসারপথে সিংহব্যাঘ্রাদি আসুর যোনিতে বারে বারে নিক্ষেপ করি। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি—এই বাক্যের টীকায় স্বামিপাদ বললেন—সব বেদ পাতা নয়। কর্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড পাতা নয়। বেদ কর্মকাণ্ড—কর্ম পুত্র, বিত্ত, আয়ু, আরোগ্য ইত্যাদি ছায়া তৈরী করে শ্রান্ত পথিককে মুগ্ধ করে। ত্রিতাপসন্তপ্ত পথিককে লুব্ধ করে। স্বামিপাদ এর দ্বারা ইঙ্গিত করলেন—শ্রান্ত জীব ছায়াতে বসবে না। রাস্তায় বসা চলবে না। তাহলে গন্তব্যস্থানে যেতে ভুল হয়ে যাবে। সূর্য্যাস্তের মধ্যে টাকা জমা না দিলে সম্পত্তি চলে যাবে। সূর্য্যাস্ত নিলামের টাকা হল জীবের পরমায়ু। এ পরমায়ু গৌরগোবিন্দ পাদপদ্মে পৌঁছে দিতে না পারলে মাঝপথে ছায়া জড়িয়ে ধরলেই বিপদ। তখন তন্দ্রা এসে যাবে। সূর্য্য ডুবে গেলে অর্থাৎ আয়ুরবি অস্তাচলে গেলে আর ফিরবার উপায় থাকবে না। তাই মহাজন বার বার ইঙ্গিত করছেন—'ভাই ছায়ায় মজ না গৌরে মজ।' চৌদ্দ

হাত দড়ির মধ্যে বাঁধা থেকেও গরু যেমন নিজেকে ছাড়া আছি ভাবে তেমনি চৌদ্দ ভুবনের মধ্যে বাঁধা পড়েও জন্মমৃত্যুর কবলিত হয়েও জীব নিজেকে মুক্ত ভাবে। বেদবিহিত যাগযজ্ঞ যতই করা যাক্ সবই কর্ম্ম অর্থাৎ বন্ধন এবং তার ফল হল এই চৌদ্দ ভুবনের মধ্যে যাওয়া আসা। এই চৌদ্দ ভুবনের বাইরে হল নৈষ্কর্ম্ম। দেবর্ষিপাদ নারদের উক্তি—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্
ভাঃ ১।৫।১২

ভক্তিই একমাত্র অনাদিকর্মবন্ধন মোচন করে তাই এর নাম নৈষ্কর্ম্ম। ভগবান নিজেই বললেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ —গীতা ৪ ৯

প্রাকৃত কর্ম অন্ধকারের মত আর ভগবানের জন্ম কর্ম নির্মল ভাস্কর। প্রাকৃত কর্মের নাম ক্রিয়া আর ভগবানের চিন্ময় কর্মের নামই লীলা। ভক্তি কর্ম (শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি) কর্মের মত দেখতে হলেও বন্ধনমোচনকারী। তেমনি সঙ্গ সম্বন্ধেও একই বিচার। যে সঙ্গ ভগবৎ উন্মুখতার অনুকূল তা সর্ব্বদা প্রার্থনীয়। আর যে সঙ্গ ভগবৎ উন্মুখতার প্রতিকূল তা সর্ব্বদা বর্জনীয়। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা ভগবৎ উন্মুখতার অনুকূল। তাই সাধুসঙ্গ বলতে নিঃসঙ্গ বা অসঙ্গই বুঝায়। সাধুসঙ্গ নিঃসঙ্গ (সঙ্গরহিত) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ নিঃসঙ্গ ভগবৎ উন্মুখতার সাহায্য করে না। কিন্তু সাধুসঙ্গ ভগবৎ উন্মুখতার সাহায্য করে। জীব নিজে নিজে ভগবানে উন্মুখ হতে পারে না। ব্যাঙ্ ফুলে কখনও হাতী হতে পারে না। সাধুসঙ্গ নিঃসঙ্গের চরম উৎকর্ষ। কারণ বলা আছে—

স্বতঃসিদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।

বাক্‌পতি ব্রহ্মা বলেছেন—কৃষ্ণভক্ত সাধুমুখে উচ্চারিত কৃষ্ণকথা শ্রবণকে জীবনধারণের উপায় করে রেখেছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বললেন মৌনী সাধুও ভগবানের কথা বলবার লোভে মুখর হন। কথা হল আসক্তির দ্বার। মুনিব্রতধারী সাধু প্রতিজ্ঞা করেছেন কথা বলবেন না

কিন্তু হরিকথা বলাতে এতই লোভ যে হরিকথা না বলে থাকতে পারেন না। হরিকথা ছাড়া আর কিছু না বললে মৌনব্রতের চরম উৎকর্ষ। সাধুসঙ্গ নিঃসঙ্গের চরম উৎকর্ষ। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বললেন—অপ্রাপ্তপতিকা বালিকা নিজের দারিদ্র্য ঘোষণার ভয়ে কঙ্কণ ভাঙে কিন্তু প্রাপ্তপতিকা রাজবধূ কঙ্কণের ঝনৎকার তুলে পতিসমীপে যায়। তেমনি জ্ঞানমার্গের সাধক ব্রহ্মানন্দ পতি পাছে না পায় এই আশঙ্কায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে কিন্তু ভক্তিরসিক গৌরগোবিন্দ পতিসমীপে যখন যায় তখন উচ্চৈঃস্বরে সুমধুর হরিনামের ঝঙ্কার তুলেই যায়। পরস্পর সঙ্গবদ্ধ নামকীর্ত্তন ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করে।

জ্ঞানমার্গের দিকে লক্ষ্য রেখে অবধূত একাকী বাস করার কথা বলেছেন। কিন্তু ভক্তিমার্গে নিঃসঙ্গ জীবনের প্রশংসা করা হয় নি। এখানে সাধুসঙ্গই প্রধান কর্ত্তব্য বলা হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যৌথভজনের উপদেশ করেছেন। রাসস্থলীতে কৃষ্ণহারা হয়ে গোপবালারা কি করেছিলেন তার পরিচয় শ্রীশুকদেব দিয়েছেন—

সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥ —ভাঃ ১০।৩০।৪৫

কৃষ্ণের আগমন আকাঙ্ক্ষা করে গোপরামাগণ সমবেত হয়ে কৃষ্ণগুণগান করেছেন। গোপবালাদের এই সিদ্ধসাধনতাই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচার করেছেন। গোপবালারা তো কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। কৃষ্ণকে তো তাঁরা নিত্য পেয়েই আছেন তবে আবার তাঁরা কৃষ্ণ হারান কেমন করে? কৃষ্ণবিচ্ছেদ তো তাঁদের সম্ভব নয়। নিত্য পেয়ে থাকলে বস্তুর আস্বাদ ভাল হয় না তাই কৃষ্ণকে নব নব রূপে আস্বাদন করবার জন্য গোপবালারা ইচ্ছা করেই কৃষ্ণবিরহ সৃষ্টি করলেন। যেমন কারুর জন্য খাদ্য রাখা হয়েছে কিন্তু সে যদি বলে ক্ষুধা নেই পরে খাব তখন খাদ্য পরিবেশক ব্যক্তি খাদ্যকে চাবি দিয়ে রেখে অন্য কোথাও গেল। তারপর সেই ব্যক্তির ক্ষুধা বোধ হওয়ায় খাদ্য চাইছে কিন্তু তখন খাদ্য তো তার নাগালের বাইরে, তখন খাদ্য পাওয়ার কোন উপায় নেই। খাদ্যকে সে তো ইচ্ছা করেই দুষ্প্রাপ্য করিয়েছে। তারপর যখন সে খাদ্য আবার পেয়ে

আস্বাদন করে তখন নবরূপে আস্বাদন করে। গোপবালাদের কৃষ্ণ আস্বাদনও এইরকমের। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি গোপবালারা। তাই কৃষ্ণের কাছে তারা দুষ্প্রাপ্য হতে পারে না। চন্দ্রের কাছে চন্দ্রিমা, দীপের কাছে তার প্রভা, দুগ্ধের কাছে তার ধবলতা, অগ্নির কাছে তার দাহিকাশক্তি যেমন দুষ্প্রাপ্য হতে পারে না, তেমনি কৃষ্ণ আনন্দময়, গোপরামাগণ তাঁর আনন্দিনী শক্তি। তাই আনন্দময়ের কাছে তাঁর আনন্দিনী শক্তি দুষ্প্রাপ্য হতে পারে না। এই শক্তিমান থেকে তাঁর শক্তিকে পৃথক করা অসম্ভব ও অচিন্ত্য। কিন্তু লীলাময়কে আনন্দ দেবার জন্য লীলাশক্তি অনাদি কাল হতেই আনন্দময় ও তার আনন্দিনী শক্তিকে পৃথক করে রেখেছেন। এইজন্যই শিব ও কালী লীলার দৃষ্টিতে মা বাবা হয়েছেন। তা না হলে শিব শক্তিমান ও কালী শক্তি—একই তত্ত্ব। শক্তিমানকে বাদ দিয়ে শুধু শক্তি কখনও তত্ত্ব হতে পারে না। কারণ শক্তি শক্তিমানকে বাদ দিয়ে শুধু নিরলম্বনে থাকে না। শক্তি আশ্রিততত্ত্ব আর শক্তিমান্ হলেন আশ্রয়তত্ত্ব। মহাজন বললেন—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥

রস হলেন শ্রীগোবিন্দ আর ভাব হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। ভাবই রস আস্বাদন করে। যেমন শুধু পুত্রে আনন্দ নেই কিন্তু সেই পুত্র যদি নিজের হয় তবে আনন্দ। পুত্র থাকলে সেই পুত্ররস আস্বাদন করবার জন্য মায়ের ভাব চোখ চাই। ভাব না থাকলে রসের ভোগ হয় না। কৃষ্ণকে যিনি যতভাবেই আস্বাদন করে থাকুন তার চরম পরম উৎকর্ষ হলেন শ্রীমতী রাধারাণী, যিনি মহাভাবস্বরূপিণী। রাধারাণী শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ-শক্তি। কাজেই গোবিন্দের কাছে তাঁর স্বরূপশক্তি দুষ্প্রাপ্য হতে পারেন না। গোপবালারা কৃষ্ণের কাছে দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য নয়। কিন্তু সর্ব্বদা পেয়ে থাকলে কৃষ্ণ রসসাগর হলেও অত্যন্ত সুরস হন না। তাই লীলাশক্তিকে বলে কৃষ্ণকে তারা দুষ্প্রাপ্য করিয়েছেন। উদ্দেশ্য কি? তাতে কৃষ্ণরসসাগর আরও সুরস হবে। মধু আরও মধু হবে।

লীলাশক্তি দু'জনের অনুমতি নিয়ে রাধাগোবিন্দকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। শুধু বিচ্ছিন্ন করেই ক্ষান্ত হন নি রসভোগকে অত্যন্ত সুরস করবার জন্য কৃষ্ণকান্তা গোপবালাদের পরকীয়া করে রেখেছেন লীলাশক্তি। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে এই পরকীয়ার লক্ষণ দেওয়া আছে—

বহু বার্য্যতে যতঃ খলু
যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বং……মিথো দুর্লভতা
সা মন্মথস্য পরমারতিঃ।

বহুবারণ অর্থাৎ সমাজ, শাস্ত্র বহুবিধ নিষেধ এতে আছে। তাহলে কি এটি গড়িয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রাকৃতবিষয়ে আসবে? না, তা আসবে না কারণ শাস্ত্র প্রাকৃত সম্বন্ধে এই পরকীয়া রস নিষেধ করেছেন। প্রাকৃতে যদি পরকীয়া রস গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটি নরকগামী হবে। মুনিবিধানে কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই পরকীয়ায় নরকগমন হবে না। রসরাজ গোবিন্দের জন্য যে বস্তু সেটি প্রাকৃত ক্ষেত্রে নামবে না। শ্রীশুকদেব পরিচয় দিয়েছেন—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। —ভাঃ ১০।৩৩।৩২

ঈশ্বরের বাক্যকে (উপদেশকে) গ্রহণ করতে হবে কিন্তু তাঁর আচরণ গ্রহণীয় নয়। পরকীয়া রস যদি প্রাকৃত বিষয়ে হয় তাহলে সেটি নরকগামী হবে এবং তার নিন্দা করা হয়েছে। রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য অবতারী শ্রীগোবিন্দে এ পরকীয়া রস উপভোগ দোষের নয়। কৃষ্ণ গোপীদের দেখতে পান না কিংবা গোপীরা কৃষ্ণকে দেখতে পান না এ অসম্ভব। কারণ কেউ তো কাউকে ছেড়ে থাকেন না। কিন্তু এই যে ছাড়াছাড়ি এটি রসকে সুরস করবার জন্য লীলাশক্তি স্বয়ং এই ব্যবস্থা করেছেন। গোপবালারা তো সিদ্ধের গণ। তবু তাঁরা কৃষ্ণহারা হয়ে কৃষ্ণ পাওয়ার জন্য সাধন করেছিলেন। তাঁদের সাধনের প্রয়োজন নেই। গোপবালাদের সাধন হল সিদ্ধের সাধন। সিদ্ধ দশা পাওয়ার পরও কেউ কেউ সাধন করেন লোকের উপকারের জন্য। যদি কেউ তার আচরণ দেখে আচরণ করে। জীবন্মুক্তের দেহ ধারণ সম্বন্ধে ঠাকুর পরমহংসদেবের

শ্রীমুখের উক্তি—কুয়ো কাটার পর কেউ বা ঝুড়ি কোদাল ফেলে দেয় আবার কেউ তুলে রাখে অন্যের কাজে লাগবে বলে। কেমন করে কৃষ্ণ পাব এই বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত ভোগ হয় না। তত্ত্বত গোপীর কাছে কৃষ্ণ দুষ্প্রাপ্য নন কিন্তু লীলায় গোপীর কাছে কৃষ্ণ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। অভাববোধটি সত্য হওয়া চাই। এই বোধ সত্য হলে তবে তো পাওয়ার জন্য সাধন করবে। গোপীর অভাববোধ সত্য তাই সিদ্ধের গণ হয়েও কৃষ্ণ পাওয়ার জন্য সাধন করেছেন। নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপী আজ লীলাশক্তির আবরণে পড়ে কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য সাধন করেছেন। যে কোন বস্তু সম্বন্ধেই বলা যায় অভাববোধই বস্তুর আস্বাদ করিয়ে দেয়। এখন কথা হতে পারে গোবিন্দ তো প্রাকৃত বস্তু নন তবে অভাব জাগলে তার আস্বাদ হবে অন্যথায় হবে না তা বলা হল কেন? গোবিন্দরস তো নিত্য নব নব। মহাজন বলেছেন—

নিতুই নিতুই নব নব
নব নব বিভ্রমশালী

তবু অভাব হলে বেশী আস্বাদন হয়। যেমন খাদ্য যতই ভাল হোক ক্ষুধায় খেলে তার আস্বাদন বেশী হয়। কৃষ্ণকে গোপীরা প্রচণ্ড ক্ষুধায় আস্বাদন করেছেন। তাই গোপীর কাছে কৃষ্ণ এত মধুর। গোপীরা যে কৃষ্ণ পেয়েই আছেন, সাধন করে যে তাঁদের কৃষ্ণ পেতে হবে না এই বোধটি লীলার আনুকূল্যে লীলাশক্তি নষ্ট করে দিয়েছেন। কৃষ্ণ সঙ্গে মিলবার জন্য গোপীর কি উদ্দাম চেষ্টা। বৃক্ষলতাও গোপীসনে গোবিন্দ মিলাতে চেষ্টা করেছেন। গোপীদের যে সাধন তা সাধকের সাধন নয়—এটি হল সিদ্ধের সাধন। উদ্দেশ্য হল কৃষ্ণরস নিত্য নূতন ভাবে আস্বাদন করা। গোপীদের এই আচরণে পরবর্ত্তী সাধক জগৎ একটি দিক্ পেয়ে গেল। শ্রীশুকবাক্যে সকলেই প্রমাণ পেলেন যে মিলিতভাবে সংকীর্ত্তন করলে হারানো কৃষ্ণ ফিরে পাওয়া যায়। উদাহরণ গোপীরা রাসস্থলীতে শ্রীযমুনাপুলিনে একত্র মিলিত হয়ে সংকীর্ত্তন করে হারানো কৃষ্ণ ফিরে পেয়েছেন। গোপীদের এ সাধন লীলারস আস্বাদনের পরিপাটির জন্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত চতুর। তাই রাধাপ্রেম যা সিদ্ধের সম্পদ্ তাই কলিজীবকে দান করেছেন। কলিজীবকে রাধাপ্রেম দান মানে রাধারাণী যেমন করে কৃষ্ণ ভালবাসেন প্রাকৃত জীবও তেমনি করে কৃষ্ণ ভালবাসবে। এই উপাদান কলিজীবকে মহাপ্রভু দিলেন। শ্রীশুকবাক্যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে কৃষ্ণহারা হলে কৃষ্ণগুণগান করলে কৃষ্ণ পাওয়া যায়। এটি নিশ্চিত সংবাদ। কারণ আজন্ম মায়ামুক্ত হলেন শ্রীশুকদেব। কাজেই তিনি মিথ্যাকথা বলবেন না। মিথ্যার জন্ম মায়ার রজোগুণ থেকে—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। —গীতা ৩।৩৭

শ্রীশুকদেব নামসংকীর্ত্তনকেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে নিলেন। অন্য কোন সাধন নিলেন না। সেই নামসংকীর্ত্তনকেই কলিযুগোচিত সাধন বলে গৌর সরকার ছাপ মেরে প্রচার করেছেন।

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

—শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্—প্রথম

এখন প্রশ্ন হতে পারে নামসংকীর্ত্তন তো সিদ্ধ গোপী সাধন হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সিদ্ধের এই সাধন কলিজীবের অর্থাৎ সাধারণ সাধকের সাধন হবে কেমন করে? গোলোকে গোপীদের কাছে কৃষ্ণ অতি সহজভাবে প্রাপ্ত হয়েই আছেন। এ কৃষ্ণপ্রাপ্তি নিত্য তাই তার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য নেই, আস্বাদনের মাদকতাও নেই। রসাস্বাদনের জন্য পাওয়া কৃষ্ণকে হারিয়ে একটু ভজকট করে গোপীরা পেতে চায়। সেইজন্যই গোলোকের লীলা ভূলোকে আবির্ভূত করালেন। যেমন চাল সিদ্ধ করে রোজই ভাত খাওয়া হয়। কিন্তু একদিন একটু ভজকট করে সেই চাল খাওয়া হবে অর্থাৎ পিঠে করে খাওয়া হবে। তাতে আস্বাদন বেশী হবে। সেই পিঠেতে আবার পুর থাকবে। এখানেও গোবিন্দ ভজনের আস্বাদনের উৎকর্ষের জন্য লীলাশক্তিকে বলে গোপীরা কৃষ্ণ হারিয়েছেন। তাঁকে

খুঁজবার জন্য ক্লেশস্বীকার করেছেন। তারপর না পেয়ে নামসংকীর্ত্তনকে সাধন হিসাবে নিয়েছেন। এর ফলে গোবিন্দদর্শন মিলেছে—এতে অনুরাগের পুর দেওয়া হয়েছে তবে আস্বাদন মধুর হতে মধুরতর হয়েছে। লীলাশক্তির এমনই পরিপাটি যে আস্বাদনের উৎকর্ষের জন্য কৃষ্ণকে পরপুরুষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। গোবিন্দের নিত্যকান্তা একান্ত প্রেয়সী ব্রজরমণী আজ পরের ঘরণী। গোপীদের সঙ্গে যে কৃষ্ণের কোনরকম সম্পর্ক আছে—এ আজ গোপী বা কৃষ্ণ কারুরই মনে নেই। এটি লীলাশক্তির দান। আজ আর গোবিন্দ গোপীকে বিধিমতে পেতে পারেন না। পরকীয়াভাবে যখন গোপী এবং কৃষ্ণের মিলন হচ্ছে তখন গোপীরা যেন কৃষ্ণকে নূতন করে পাচ্ছেন। নূতন রঙে রসে আস্বাদন করেছেন। সিদ্ধ ব্রজবালারা যে এই সাধন পন্থা অবলম্বন করলেন এতে পতিতের জগৎও উপকৃত হয়ে গেল। ভূলোকে যখন লীলা অবতীর্ণ হয়েছেন তখন ভূলোকের কাজও কিছু থাকবে। কৃষ্ণ পরপুরুষ আর ব্রজগোপী পররমণী। রাধারাণী আক্ষেপ করে বলেছেন, হায়! হায়! আমার একটি মন আজ তিন পুরুষে মজেছে—একজনের নামাক্ষর আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে আমার মনকে মাতিয়েছে, আর একজনের বংশীনিনাদ কানের পথে প্রবেশ করে আমার মন কেড়ে নিয়েছে। আর একজনের চিত্রপট যে এঁকেছিস সখি, তাতে তো আমার চিত্ত লগ্ন হয়ে আছে। তাই বলি, আমার জীবনকে ধিক, শত ধিক। কারণ যে নারীর তিন-পুরুষে মতি যায় তার পক্ষে মরণই শ্রেয়ঃ।

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং।
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ॥
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ।
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

—বিদগ্ধমাধব ২য় অঙ্ক

বিশাখা এমন করে চিত্র এঁকেছেন যেন সে চিত্র কথা কয়। লীলাশক্তি একাই সাপ হয়ে কামড়ায় আবার ওঝা হয়ে ঝাড়ে। তিন পুরুষে মতি

গিয়েছে মনে করে যখন রাধারাণী আক্ষেপ করছেন তখন বিশাখা বলছেন, —ও তো তিন পুরুষ নয়, ওগো ধনি! ও তিন জন একই। যাঁর নাম শুনেছ তাঁরই বংশীধ্বনি আবার তাঁরই চিত্রপট দর্শন করেছ। তখন রাধারাণী আশ্বস্তা হলেন।

পরপুরুষ বোধে যখন গোপীরা কৃষ্ণ আস্বাদন করছেন তখন তাঁদের ভারী ভাল লাগছে। যেন নূতন করে তাঁরা আস্বাদন করছেন। বস্তুত গোপীরা পরকীয়া নন। কিন্তু লীলাশক্তি তাঁদের পরকীয়ার আবরণ দিয়েছেন। সেই আবরণে পড়ে তাঁদের যে ছটফটানি লীলাশক্তির এ কৌশল অপূর্ব্ব। এর চেয়ে উত্তম কৌশল আর হয় না। সমাজ, শাস্ত্র, ধর্ম বা বেদ কোন বিধানেই গোপীদের কৃষ্ণ পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। তাদের নিত্য উৎকণ্ঠা কেমন করে কৃষ্ণ পাব। তারই ফলে ভজন। উৎকণ্ঠারই এ জগতে দাম। তাই ও জগতের এই উৎকণ্ঠা-মণ্ডিত লীলা যখন ভূলোকে এলেন তখন ভূলোকেরও কিছু উপকার হয়ে গেল। প্রাকৃত জীবও উৎকণ্ঠা চেনে কিন্তু সে উৎকণ্ঠা প্রাকৃত বস্তুর জন্য। কিন্তু এই প্রাকৃত বস্তুর জন্য উৎকণ্ঠার ওপরে যে গোবিন্দের জন্য উৎকণ্ঠা বলে একটি অপূর্ব্ব বস্তু আছে প্রাকৃত জীব সে খবর জানে না। প্রাকৃত জীবকে এই গোবিন্দ উৎকণ্ঠা চেনাবার জন্যই গোলোকের ধন ভূলোকে এল। গোবিন্দ উৎকণ্ঠার প্রাবল্যে প্রাকৃত ভোগ সব ত্যাগ হয়ে যাবে। ভূলোক এই অপূর্ব্ব সম্পদ্ লাভ করল। গোবিন্দ পিপাসার চেহারা দেখতে পেল। প্রাকৃত বস্তুর জন্য তৃষ্ণার ওপরেও যে গোবিন্দ তৃষ্ণা আছে জগৎ তা জানতে পারল। গোলোকের লীলা যদি ভূলোকে অবতীর্ণ না হত তাহলে প্রাকৃত জীব কোনও দিনই সে সন্ধান পেত না। গোবিন্দ অনুরাগে পাগল হয়ে গোবিন্দ সনে মিলবে বলে গোপীর দল ছুটছে—কেমন করে গোবিন্দ প্রাপ্তি হবে এই দুর্ব্বার পিপাসা নিয়ে তারা ছুটছে।

অরুচি রোগীর রোগ সারাবার চিকিৎসা হল সেই রোগীর সামনে একজন লোক যে খুব ক্ষুধা নিয়ে রুচি করে খায় তাকে খেতে দিতে

হবে। সে খাবে আর অরুচির রোগী তার খাওয়া দেখবে। এতেই তার রোগ ভাল হবে। প্রাকৃত জীবও তেমনি গোবিন্দে অরুচিসম্পন্ন রোগী আর এই অরুচি রোগ সারাবার জন্য গোবিন্দে রুচিসম্পন্ন কাউকে সামনে রাখতে হবে—যার রুচি দেখে পিপাসা দেখে অরুচি রোগীর রুচি হবে। গোপীদের মাধ্যমে শাস্ত্র গোবিন্দ পিপাসার দলের চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। গোপী দেখে ভাগ্যবান জীবের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগবে আমাদের কবে এমন গোবিন্দ তৃষ্ণা হবে? ভূলোকের জীব যে এই তৃষ্ণার সংবাদ পেল এইটিই ভূলোকের উপকার। গোপীর ছলচাতুরী যা কিছু তা প্রাকৃতজীবের উপকারের জন্য। কৃষ্ণ তাঁর বঁধূদের নিয়ে চলে গেছেন কিন্তু ভূলোকের জীবের জন্য গোবিন্দ পাওয়ার সাধন সংকীর্ত্তনকে শাস্ত্রের মাধ্যমে রেখে গেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবের জন্য সেই নামসংকীর্ত্তন সাধনই অনুমোদন করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন নামসংকীর্ত্তন চিত্ত-দর্পণের সম্মার্জনী। গোপীর চিত্ত কিন্তু অশুদ্ধ ছিল না। তাই তার শুদ্ধির জন্য মার্জন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এর তাৎপর্য্য হল যার চিত্ত অশুদ্ধ নাম করলেই তার অশুদ্ধ চিত্তও শুদ্ধ হবে। নামের মহিমা শাস্ত্র বলেছেন—'নামৈব তান্ত্রিকী সন্ধ্যা নাম এব বৈদিকী তথা।' নাম বাদ দিলে আর কিছু থাকে না। অন্য যার ব্রত হোম অনুষ্ঠান হল তুষের পাহাড়। আর শ্রীভগবানের একটি নামোচ্চারণ হল চালের কণা। তুষের পাহাড় প্রার্থনীয় নয় কিন্তু চালের কণা অল্প হলেও তাই প্রার্থনীয়। তুষের গৌরব ততক্ষণ যতক্ষণ সে চালের গায়ে লেগে থাকে। চাল বাদ দিলে তুষের যেমন কোন দাম নেই তেমনি গোবিন্দ বাদ দিলে সব উপকরণই ব্যর্থ। তাই ১০৮ শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীনামমাহিমা প্রসঙ্গে বলেছেন—

এই নাম বই আর সাধন নাই রে।
অদ্বয়ব্রহ্মানন্দনন্দন পেতে এই নাম বই আর সাধন নাই রে
অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ পেতে এই নাম বই আর সাধন নাই রে
সচ্চিদানন্দঘন মূরতি দেখতে এই নাম বই আর সাধন নাই রে—

শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন এই নামসংকীর্ত্তন পরং বিজয়তে। নামসংকীর্ত্তনের

ফল চিত্তদর্পণ মার্জন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। আসল ফল শেষে বলেছেন—পরং বিজয়তে অর্থাৎ অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দকে বশীভূত করে এনে দেবে এইটিই পরম এবং চরম ফল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন জ্ঞানমার্গে নিঃসঙ্গ থাকার কথা বলা হয়েছে কিন্তু ভক্তিপথে নিঃসঙ্গের চেয়ে সাধুসঙ্গ পরম শ্রেয়ঃ।

অবধূত যে নিঃসঙ্গ হওয়ার কথা বললেন এখানে নিঃসঙ্গ ও অসঙ্গ বিচার করতে হবে। কারণ সঙ্গ মানে আসক্তি। যেমন রাজর্ষি ভরতের কাছে হরিণশিশু বিজাতীয় প্রাণী। তাই ঘন আসক্তির কারণ হতে পারে না। তবু মৃগ আসক্তির ফলে ভরতের বন্ধন হয়েছে। একটি জন্ম তার মৃগ হয়ে থাকতে হল। এ জন্মটি তো বৃথা কেটে গেল। তাই ভরতের ভয়—বলছেন, মানুষের সঙ্গ আর করব না। জড়ভরত জীবনে কারও সঙ্গে ব্যাক্যালাপ করেন নি। রাজা রহূগণের সঙ্গে প্রথম বাক্যালাপ করলেন। সঙ্গ বা আসক্তিই পতনের কারণ। যে কোন সঙ্গই আসক্তির কারণ। তাই উপদেশ হল—আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। আসক্তি হল সূক্ষ্ম মনের কাজ। বস্তুর উদ্দীপনা সরাতে হবে। প্রাকৃত বস্তু কাছে থাকাই অপকার। এ সবই আসক্তির কারণ। কাজেই প্রাকৃত বস্তু যত সামনে থেকে সরিয়ে রাখতে পারা যায় ততই মঙ্গল। আসক্তি দূর করবার জন্যই অবধূত নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের কথা বললেন। তাহলে যাতে অর্থাৎ যে সঙ্গে আসক্তি দূর হবে সে সঙ্গকে সঙ্গ বলা চলে না। তাই সাধুসঙ্গকে সঙ্গ বলা হয় না। কারণ সাধুসঙ্গ আসক্তিকে ছেদন করে। অনাসঙ্গ মানে নিষ্কাম। ভগবান বললেন—আমার জন্ম কর্ম যারা শোনে এবং তত্ত্বত জানে তাদের নিজেদের জন্ম কর্ম ছেদন হয়। গীতবাক্যে বলা আছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।

—গীতা ৪।৯

ভগবানের জন্ম কর্ম সূর্য্য আর প্রাকৃত জীবের জন্ম কর্ম অন্ধকারতুল্য। ভগবানের জন্ম কর্ম বিনাশক আর জীবের জন্ম কর্ম বিনাশ্য। প্রাকৃত সঙ্গ ত্যাগ করে সাধুসঙ্গ করবার জন্য উপদেশ দানই অবধূতের বাক্যের তাৎপর্য্য। বস্তুই যদি পেতে হয় কম লাভ করবে কেন? সাধুর কাছে গেলেই সাধুসঙ্গ হয় না। সেখানে গিয়ে যদি আমরা নিজেদের বিষয়-বার্ত্তা বলি তাহলে সাধুর কথা শুনবার আর অবকাশ হবে না। তাই সাধুর কাছে গিয়ে কোন বিষয় বার্ত্তা করা উচিত নয়। মিছরির কুঁদোর কাছে গিয়ে যেমন ভেঙ্গে খেলেই লাভ তেমনি সাধুর মধুচক্রে একটু প্রশ্ন রূপ খোঁচা দিলেই হরিকথারূপ মধু ঝরবে। প্রাকৃত দুঃখ নিবারণের জন্য যত প্রতিক্রিয়াই করা যাক্ না কেন কোন প্রতিক্রিয়াই প্রতিক্রিয়া নয়। দেবর্ষিপাদ বলেছেন—

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ।

—ভাঃ ৪।২৯।৩৩

মাথার ভার কাঁধে নামালে জায়গার পরিবর্ত্তন হয় বটে কিন্তু দুঃখের প্রতিকার হয় না। এও সেইরকম। চাইতেই যদি হয় তাহলে কম চাইব কেন? কোনমতে দুঃখ যাতে আসবে না এইরকম চাইতে হবে। আঁচল ভরে দাও যাতে আর কোন দরজায় আঁচল পাততে না হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে প্রসঙ্গ আছে—বিরাগ আশ্রয় খুঁজছে খুঁজতে খুঁজতে দেখছে এমন কোথাও নেই কলিযুগে যেখানে সে নিশ্চিন্তে আশ্রয় পেতে পারে। সিংহের গুহায় যেমন গজমুক্তা আর কুকুরের গর্ত্তে পচা মাংসখণ্ড মেলে তেমনি সাধুর আলয়ে হরিলীলা কথারূপ গজমুক্তা পাওয়া যায় আর বিষয়ী লোকের কাছে বিষয়বার্ত্তারূপ পচামাংসখণ্ড পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গের এমনই প্রভাব যে তার কাছে কাম ক্রোধ পরাভূত হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বলেছেন—

কি বা সে করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

ভগবান বললেন—নরকে যাবার তিনটি পথ, কাম, ক্রোধ এবং লোভ। তাই এই তিনটিকে ত্যাগ করতে হবে। মহাজন কত সহজ করে দিলেন—

কি বা করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

সেইজন্যই ভজনের ক্রমে বলা হয়েছে আগে সাধুসঙ্গ তারপর ভজনক্রিয়া। গাছ পুঁতবার পর আগে বেড়া দিতে হয় যাতে ছাগল, গরু, ভেড়া গাছ মুড়িয়ে খেতে না পারে। ভক্তিবীজ রোপিত হবার পরই সাধুসঙ্গের ঘেরা দিতে হবে যাতে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ছাগ ভক্তিলতার নাশ করতে না পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাধুসঙ্গ নিঃসঙ্গেরই চরমতম প্রকাশ। একা থাকলে আসক্তি ত্যাগ হল বটে কিন্তু ভগবৎ উন্মুখতার কোন উপকার হল না কিন্তু সাধুসঙ্গ নিঃসঙ্গ অপেক্ষা কোটিগুণে উপকার। আসক্তি ত্যাগ তো হবেই উপরন্তু ভগবৎ উন্মুখতা হবে। সংকীর্ত্তনের লক্ষণ করেছেন শ্রীজীবপাদ—বহুভির্মিলিত্বা গানসুখম্। এখন কথা হচ্ছে পাঁচজন বা দশজন মিলে সংকীর্ত্তন করা হচ্ছে তাদের মধ্যে কেউই সাধু নয় তবে সংকীর্ত্তনে সাধুসঙ্গ হল কেমন করে? তাঁরা সাধু না হতে পারেন কিন্তু যতক্ষণ কীর্ত্তন করছেন অর্থাৎ নামের সঙ্গ করছেন তখন তাঁরা সাধুই। নামকীর্ত্তন ছেড়ে যখন আবার সংসার করবে তখন আর সাধু থাকবে না। তাই নিঃসঙ্গের রাজসংস্করণ হল সাধুসঙ্গ। নামসংকীর্ত্তন কালে সাধুসঙ্গ হল অন্যসময়ে নিঃসঙ্গ থাকতে হবে। জ্ঞানমার্গে ন্যাস প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে কিন্তু মানুষ তো গৃহস্থ। সে পাঁচজনে মিলে মিশে গৃহস্থালী করতে চায়। মহাপ্রভু উপদেশ করলেন—বাপে মায়ে ঝিয়ে মিলে কর সংকীর্ত্তন। নামসংকীর্ত্তন সাধন কলিজীবের জন্য বিহিত হলেও এটি দুঃস্থ সাধন নয়। যমুনাপুলিনে গোপরামারা সংকীর্ত্তন করে হারানো কৃষ্ণ ফিরে পেয়েছিলেন। কীর্ত্তন একা একা করা হয় আর সংকীর্ত্তন মিলে মিশে করা হয়। গোপবালারা যেমন কৃষ্ণ পাওয়ার জন্য সংকীর্ত্তন করেছেন কৃষ্ণও তেমনি গোপীদের পাওয়ার জন্য কীর্ত্তন

করেছেন। শ্রীশুকদেব বললেন—

জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্। —ভাঃ১০।২৯।৩

কলম্ অর্থাৎ ক্লীং। বীজমন্ত্র কামবীজ এতে বলা হল। বামদৃশাং অর্থাৎ কুটিলনয়নানাম্ (সুন্দরীনাম্)। গোপীদের সোজা দৃষ্টি দেখলে গোবিন্দের ভাল লাগে না। গোবিন্দকে গোপীরা সহজ চোখে দেখতে পারে না। সব সময় দৃষ্টি বঙ্কিম করেই তারা গোবিন্দের দিকে চায়। নয়ন তাদের গোবিন্দের প্রতি দেওয়াই আছে। কারণ গোপীর নয়ন গোবিন্দ ছাড়া আর কিছু দেখে না। গোবিন্দ গোপীর বঙ্কিম দৃষ্টিতেই সুখী হন। গোপীর বঙ্কিমদৃষ্টিই গোবিন্দের মনোহারিণী। রাসে যখন কৃষ্ণ বংশীনিনাদে গোপী আকর্ষণ করেছিলেন তখন শ্রীশুকদেব শ্রীগোবিন্দের কাছে রয়েছেন। তাই আজগ্মুঃ গোপবালারা এলেন—এইরকম করে কথা বলেছেন। কৃষ্ণের বংশী-গানের আর কোন উদ্দেশ্য নেই—একমাত্র উদ্দেশ্য গোপীর মন হরণ করে তাদের আকর্ষণ করা। এর আগে গোপীদের সম্পূর্ণ মন হরণ হয় নি। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের এ বংশীশিক্ষার হিসাব দিয়েছেন। বর্ষাকালে কৃষ্ণ চারমাস বংশীশিক্ষা করেছেন। যে কোন বিদ্যাই হোক্ শিক্ষা করতে গেলে একদিনেই তো উত্তম হয় না। ক্রমে ক্রমে হয়। প্রথমে বংশীনিনাদে স্থাবরজঙ্গমের আকর্ষণ, দ্বিতীয় মাসে গোপীদের আকর্ষণ করেন। তৃতীয় মাসে রাধারাণী আকৃষ্টা হন। রাধারাণী সে আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বাইরে আসেন, পরে আবার নিজেকে সংযত করে ঘরে ফিরে যান। তখন কৃষ্ণ বুঝলেন বংশী শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। আরও সাধতে হবে। রাস-রজনীতে কৃষ্ণের যে বংশীনিনাদ এমন আর কোনদিন হয় নি। আজ রাধারাণী যে ভাবে আকৃষ্টা হয়ে ঘর ছেড়ে বনে এসেছেন এমনটি আর কোনদিন হয় নি। আজ তিনি বনে এসে আর ঘরে ফিরে যান নি। আজকের মত রাধারাণীর মন এমন করে আর কোনদিন মজে নি। কৃষ্ণ গোপীদের পাওয়ার জন্য অথাব গোপীরা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য গানই গেয়েছেন—কীর্ত্তনই করেছেন; ধ্যান করেন নি বা জপ করেন নি।

কৃষ্ণও মনে প্রাণে বুঝেছেন যে ধ্যান করে বা জপ করে গোপী মজান যায় না। ভগবান বংশীতে যে গান করেন সেই নামই প্রথম সৃষ্টির বীজ। ক্লীং বীজ এইটিই সৃষ্টির বীজ।

প্রথম হল নাদ, পরে নিনাদ। এই নিনাদে বুঝা গেল রাধারাণী বুঝলেন আমাকে ডাকছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির আগেও সংকীর্ত্তন ছিল। সামবেদ গানই। ভগবান বলেছেন—বেদানাং সামবেদোঽস্মি। কাজেই শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবের জন্য যে নামসংকীর্ত্তন সাধনের ব্যবস্থা করলেন এ দুঃস্থ সাধন বা দুর্ব্বল সাধন বলে নয়। এ পচা খুদের খিচুড়ি বা ছেঁড়া কাপড় ভিখারীকে দান করার মত নয়। নামসংকীর্ত্তন পচা সাধন নয়। কীর্ত্তনই ভগবানের স্বরূপ—বেদানাং সামবেদোঽস্মি। কাজেই নামসংকীর্ত্তনের মূল্য সর্ব্বোত্তম। এই সর্ব্বোত্তম সাধনকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কলিপাবনাতার যুগধর্ম বলে কলিজীবের প্রতি বিধান করেছেন। কাজেই এর ওপরে আর ধর্ম নেই। হরিনাম করা মানেই সাধুসঙ্গ করা। কোন ব্যক্তির মধ্যেই সৎ বা অসৎ বলে কিছু নেই ভাবেই সৎ অসৎ হয়। ভাষার ওপর সৎ অসৎ। কাল বা ফর্সা, ঘরের বা বনের দরকার নেই। দরকার হল গৌর বলার। আসক্তি ত্যাগ করতে হবে এই হল কথা। বিষয়াসক্তি এবং গৌরগোবিন্দ একসঙ্গে মেলে না। শ্রীতুলসীদাসজী বলেছেন—

যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।
রবি রজনী নাহি মিলে এক ঠাম॥

রজনী থেকে রবির দিকে এগুতে হবে তো—অর্থাৎ মায়ার অন্ধকার হতে সূর্য্যসদৃশ ভগবানের দিকে যেতে হবে। কিন্তু কথা হল জীব নিজে ইচ্ছা করে এই আসক্তি ত্যাগ করতে পারে না। শ্রীচণ্ডীতে প্রসঙ্গ আছে—সমাধি বৈশ্য ও সুরথ রাজা দুজনেই বনে গিয়েছিলেন কিন্তু বনে গিয়েও তাঁদের আসক্তি ত্যাগ হয় নি—আসক্তি ছিলই। কিন্তু তবু বনে যাওয়ার ফল আছে। বনে যাওয়ার ফলেই মেধস মুনির দর্শন ও তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন। মহামায়ার আরাধনার উপদেশ পেয়েছিলেন। তাই

সাধুর কাছে যাওয়ার দরকার। এর ওপরে নিজেরও চেষ্টার দরকার—স্বরূপ বিচার করতে হবে। বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব কি? বাক্যে বুঝান যায় কিন্তু ভাবে বুঝান যায় না। আমরা বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে ভগবানকে ভজতে নারাজ। মন বড় বলবান কিন্তু গৌর গোবিন্দ মনের চেয়েও বলবান। তাই গৌরগোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করলে জগৎ তার কাছে আপনিই বশীভূত হবে। প্রাকৃত ভোগের দ্বারা প্রাকৃত ক্ষুধা কিছুতেই মেটান যায় না কেন? শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যত্যেপি ন জীর্য্যতি। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৌভরি মুনি ও মহারাজ যযাতি। যোগীন্দ্র বলেছেন এ ক্ষুধা মেটানর উপায় একমাত্র নাম অন্ন বেশী করে গ্রহণ করা।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

—ভাঃ ১১।২।৪২

এক গ্রাস দু গ্রাস অন্ন যেমন প্রচণ্ড ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে পারে না কিছু অংশের হয়ত নিবৃত্তি হয় কিন্তু তার অনুভব হয় না। অন্ততঃ অর্দ্ধেক ভোজনের পর কিছুটা অনুভব হয় তেমনি বেশী করে নাম অন্ন-গ্রহণ করলে ভক্তি, ঈশ্বর অনুভূতি ও বিষয়বিরক্তি বুঝা যাবে। ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে একটি অন্নগ্রহণও যেমন বিফল নয় তেমনি ভক্তিলাভ, ঈশ্বরানুভূতি ও প্রাকৃত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভের পক্ষে একটি নাম গ্রহণও বিফল নয়। প্রেম, ঈশ্বরানুভব ও বৈরাগ্য তিনটিই চাই। গৌরগোবিন্দ নামরূপ-গুণলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করলেই ভক্তি অর্থাৎ প্রেম ঈশ্বরানুভব ও বিষয়-বৈরাগ্য এক সঙ্গে লাভ হবে। অর্দ্ধেক ভোজন হলে অন্ততঃ ক্ষুধানিবৃত্তি কিছুটা যেমন বুঝা যায়, তেমনি ভজনে কিছুদূর অগ্রসর হলে ভক্তির প্রভাব কিছুটা বুঝা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামসংকীর্ত্তনধর্ম কলিজীবের পরম করুণা করে বিধান করলেন। জ্ঞানযোগের সাধক অর্থাৎ জ্ঞানী বা যোগী বড় দরিদ্র তাই তাদের সাধুসঙ্গরূপ সম্পদ নেই কিন্তু ভক্ত ধনী। তারা গোবিন্দকে কেনা বেচা করে। তাই তাদের সাধুসঙ্গ সম্পদ্ আছে।

জ্ঞানযোগের সাধকের সদাই আশঙ্কা ব্রহ্মানুভব, পরমাত্মানুভব পতি পাছে না পাই এই ভয়ে দারিদ্র্য লজ্জা ঢাকবার জন্য নিঃসঙ্গ থাকে—কুমারীর কঙ্কণ ভেঙ্গে একাকী থাকার মত। কিন্তু ভক্ত বড় মহাজন। ভক্ত হল গৌরগোবিন্দপতিমতী। তাই উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনের ঝঙ্কার তুলে তারা গৌরগোবিন্দ পতির কাছে যায়। এইটিই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার আশয়।

শ্রীঅবধূতজীর বাক্যে যে নিঃসঙ্গ তা জ্ঞানী এবং যোগীর পক্ষে। কারণ একাকী থাকলে তাদের প্রাণায়ামাদি করবার সুবিধা হয়। কৃষ্ণভক্তিসাধনে কিন্তু বলা হয়েছে—“ভক্তগোষ্ঠী লইয়া করে রস আস্বাদন।” ভক্তিতে রসের পরিমাণ প্রচুর তাই অনেকের মধ্যে ভাগ করে ভোগ করতে অসুবিধা হয় না। অসংখ্য মুনির মাঝে শ্রীশুকদেব ভক্তিরস পরিবেশন করেছেন তাতেও ভক্তি-রস এতটুকু কমে নি। জ্ঞান বা যোগসাধনের রস অল্প তাই বেশীর মধ্যে ভাগ করা চলে না। ভাগে কম পড়ে যায়। ধ্যানাদির সময় একাকী নিঃসঙ্গ থাকতে হবে। কারণ তখন স্মরণ—এটি হল মনের কাজ। কিন্তু কীর্ত্তনের সময় মিলিতভাবে ভজনের কথাই ধরতে হবে। ১-১০

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১
যস্মিন্ মনো লব্ধপদং যদেতচ্ছনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্মরেণূন্ ।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্ ॥ ১২
তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা ।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন বিবেদ পার্শ্বে ॥ ১৩
একচার্য্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ ।
অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ ॥ ১৪
গৃহারম্ভো হি দুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ

শর যারা তৈরী করে অর্থাৎ শরকারের (ইষুকারের) কাছে অবধূতজীর শিক্ষা—শ্বাসকে জয় করে এবং জিতাসন হয়ে অবিচল চিত্তে বৈরাগ্য অভ্যাস যোগ দ্বারা মনকে সংযত করে এক বস্তুতেই ধারণা করে রাখতে হবে। ১১

পরমানন্দস্বরূপ ভগবানে চিত্ত স্থির হলে লয় এবং বিক্ষেপাত্মক মন অপনা-আপনিই কর্মবাসনা সকল পরিত্যাগ করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ বিনষ্ট হয় তখন মন গুণকার্য্যশূন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই এক বস্তুতেই মনকে সংযুক্ত করতে হবে। ১২

আত্মাতে যদি চিত্ত অবরুদ্ধ হয় তাহলে বাইরের বা ভিতরের আর কিছুই জানতে পারা যাবে না। যেমন শরকার যখন শর তৈরী করে তখন সেই শর সোজাভাবে তৈরী করবার কাজে মনটিকে এমন করে নিবিষ্ট করে যে তখন রাজাও যদি ভেরী বাদ্য বাজিয়ে পাশ দিয়ে চলে যায় তাহলেও সে কিছুই জানতে পারে না। ১৩

সর্পের নিকট শিক্ষা—সর্প যেমন একা বিচরণ করে এবং তার ঘরবাড়ী থাকে না, অত্যন্ত সাবধানী ও নির্জনে বাস করে, আচার তার এমনই যে

তাকে লক্ষ্য করা যায় না, অসহায় (একক) এবং মিতভাষী—মুনিকেও সেইরকম হতে হবে। ১৪

নশ্বর দেহধারী লোকদের গৃহ নির্মাণ করাই দুঃখের কারণ হয় ও ফল-শূন্য হয়। কারণ সর্প পরের ঘরে বাস করেও সুখেই থাকে। ১৫

অবধূতজীর এর পরবর্ত্তী গুরু হলেন শরকৃৎ অর্থাৎ ইষুকার। শরকৃৎ মানে যে ব্যক্তি বাণ তৈরী করে বা করছে। চঞ্চল মন চারিদিকে নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সেই মনকে এক জায়গায় নিযুক্ত করতে হবে। শ্রীস্বামিপাদ তখন প্রশ্ন তুলেছেন—মন তো দুর্ব্বার। তাকে তো কিছুতেই স্থির করা যায় না। গৌরগোবিন্দ গুরুপাদপদ্ম সকলেরই কৃপা হয় কিন্তু মনের কৃপা হয় না বলে কিছু করা যায় না। মনকে অচঞ্চল করতে হলে আসন জয় করতে হবে। শ্বাস জয় করতে হবে। এরই নাম প্রাণায়াম। তখনই মন নিশ্চল হবে। অতন্দ্রিত হয়ে থাকতে হবে। ভগবান ছাড়া জগতের যাবতীয় বস্তু যে কুৎসিত এটি মনকে জানিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। বৈরাগ্য অভ্যাস করতে হবে। প্রাকৃত-বস্তুতে জীবের সহজে অরুচি হয় না। গীতাভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই অরুচি উৎপাদনের উপায় বলছেন। ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি করতে হবে। আমাদের দোষ হয়েছে ইষ্টে অনিষ্ট বুদ্ধি করেছি আর অনিষ্টে ইষ্ট বুদ্ধি করেছি। ভগবৎ সম্পর্কই ইষ্ট। এ ছাড়া অন্য যা কিছু সবই অনিষ্ট।

ছয় গোস্বামীর সংসারবরণ জগতের শিক্ষার জন্য। তা না হলে তাঁদের স্বরূপ তো মঞ্জরীর। শ্রীশুকদেবের মত আজন্মমুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করতেও তাঁদের আপত্তি ছিল না কিন্তু সংসারবরণ করেছেন সংসারে (যার ওপর আমাদের ইষ্টবুদ্ধি গাঢ় হয়ে আছে) কেমন করে অনিষ্টবুদ্ধি করতে হয়—এইটি দেখাবার জন্যই ছয় গোস্বামীর সংসার বরণ। সংসার যে অনিষ্টকর তা শাস্ত্র শুনে আত্মা বুঝলেও মন বুঝে নি। প্রধানমন্ত্রী হল মন তার বোধটি কিন্তু ঠিক হয় নি। কোন্‌টি প্রকৃতপক্ষে উপকারী মন বুঝতে

ভুল করেছে। এতদিন যা বুঝেছি সেটি উল্‌টাতে হবে। মাছ ডাঙ্গায় হাঁটলেও সে জল চায়, ডাঙ্গা কিন্তু চায় না। এইটিই যেমন সত্য, মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, সে যত ডাঙ্গার দিকে যাবে ততই তার মৃত্যু, জীবও তেমনি যত সংসার-মরুর দিকে এগিয়ে যাবে তত তার ক্ষত হবে মরে যাবে। শাস্ত্র বললেন—

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ব্রহ্মানন্দভারতীর সঙ্গে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথোপকথন হতে জানা যায়—তত্ত্ব সাকার না নিরাকার এ নিয়ে কোন তর্ক হতে পারে না। তত্ত্ব যে নিরাকার হবে এমন কোন কথা নেই। তা যদি হত তাহলে অহংকার, মাৎসর্য্য এগুলি তো নিরাকার তাহলে এরাও তত্ত্ব হত। তত্ত্বের লক্ষণ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলেছেন—

বিভুচৈতন্যানন্দত্বং তত্ত্বত্বম্।

"প্রচুরতরঃ ধনী যথা অপরমপি ধনিনং করোতি।" যে দরিদ্র সে নিজের পেটেই দুমুঠো দিতে পারে না। কিন্তু যে প্রচুর ধনবান সে তার সম্পদ দিয়ে অপরকেও ধনী করতে পারে। অণুচৈতন্য জীব মায়ার জগতে মরুভূমিতে এসে পড়েছে। এখানে জল নেই শুধু তপ্ত বালুকা। কিন্তু জীব সুখ জল চায়। শ্রুতি তত্ত্ব সম্বন্ধে বললেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি।" জীব আনন্দস্বরূপ হয়ে যায় না কিন্তু আনন্দ আস্বাদন করে। যেমন ধনী তাকেই বলা হয় যে ধন ভোগ করে। সিদ্ধান্ত করতে হবে। তাই শাস্ত্র বললেন—

সিদ্ধান্ত করিতে কভু না কর আলস রে।
সিদ্ধান্ত লাগয়ে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস রে॥

ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করতে হবে। পরমেশ্বরের কথা পুনঃ পুনঃ শুনতে হবে। বিদেশী অপরিচিত লোকের কথা শুনতে শুনতে তার ওপর শ্রদ্ধা হয়। তখন তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে সহ্য হয় না। আর শাস্ত্রের মারফৎ সাধু গুরু বৈষ্ণবের মারফৎ ভগবানের কথা শুনতে শুনতে তাঁর উপর শ্রদ্ধা হবে না কেন? শুনতে শুনতেই শ্রদ্ধা হবে। মনের পেট

ভরে গেলে মন আর কিছু চাইবে না। আলগাভাবে বৈরাগ্য হয় না। সাপে আমাদের অনিষ্টবোধটি পাকা হয়ে আছে। তাই সাপে আমাদের স্বাভাবিক বৈরাগ্য। বেদান্ত বলেন জগতের বস্তু অনিষ্টবোধক এটি নিত্য অনুশীলন করতে হবে। তাহলে বৈরাগ্য হবে। ভক্তিশাস্ত্র বলেন ওতে বৈরাগ্য লাভ হবে না। ভগবানে ভক্তি সঞ্জাত হলে প্রাকৃত রুচি আপনিই চলে যাবে। ভজনাস্বাদ পূর্ণ হলে তবে প্রাকৃত ত্যাগ হবে। বৈরাগ্য এবং অভ্যাসযোগে ভগবানে মনোনিবেশ করতে হবে। পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণে প্রস্তরখণ্ড হ্রাস পায়। নিত্য আহ্নিক করতে বসা মানে ভগবানকে মনে করতে বসা। যতক্ষণ সাধু গুরু শাস্ত্রে বিশ্বাস না আসে ততক্ষণই সাধকের ক্লেশ। একটি ভ্রমর অন্য ভ্রমরের কাছে পদ্মের মধুর খবর পেয়ে পদ্মে মধুপান করতে গিয়েছে কিন্তু পদ্মকে মুকুলিত দেখে মধু না পেয়ে তার পূর্ব্ব ভ্রমরের কথায় অবিশ্বাস হচ্ছে। সে যদি এই অবস্থায় মধুপান না করে মুকুলিত পদ্মের কাছ থেকে ফিরে আসে সূর্য্য-কিরণে পদ্মের প্রস্ফূটিত না হওয়া পর্য্যন্ত যদি অপেক্ষা না করে তাহলে তার পদ্মের কাছে এত কষ্ট করে আসা সবটাই ব্যর্থ। তেমনি সাধকও ভগবৎপাদপদ্মের কাছে গিয়ে যদি মধুপান না করে ফিরে আসে তাহলে তারও সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সাধু গুরু বৈষ্ণব বলেছেন ভগবৎপাদপদ্মে মধু আছে কিন্তু সাধকের হৃদয়সরোবরে ভগবৎপাদপদ্মের আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও তাতে প্রেমসূর্য্যাংশু না পড়ায় প্রস্ফূটিত হয় নি তাই মধুও আহরণ করা হয় নি। ভাবকিরণে পদ্ম বিকশিত হলে তবে মধু পাওয়া যাবে। মধু না পেলেও পদ্মের সৌরভে সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ভক্তির ক্রম বলা হয়েছে—

> আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
> ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
> অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
> সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

—ভক্তি রঃ সিঃ-পূর্ব্ববিভাগ ৪র্থ লহরী

প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তারপর নিষ্ঠা, তারপর রুচি, এরপরে আসক্তি, তারপর ভাব এবং তারপর প্রেম। সাধকদের প্রেমোদয়ের এইটাই ক্রম। আসক্তি মার্জনে চিত্ত-দর্পণ মাজিত হয়। রুচি হল ভজনবিষয়া আর আসক্তি হল ভজনীয়-বিষয়া। দর্পণ উত্তমরূপে মাজ্জিত হলে তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। চিত্ত-দর্পণও তেমনি উত্তম মাজিত হলে তবে তাতে মধুসূদনের প্রতিবিম্ব পড়বে। নিঃশ্বাসের (কামাদি-বাসনার) মালিন্যে যেন সে প্রতিবিম্ব ব্যাহত না হয়। তবে গৌরগোবিন্দ প্রতিবিম্ব পড়বে। প্রেমসূর্য্যের কিরণ হল ভাব। পদ্ম হৃদয়সরোবরে ফুটেছে অনেকদিন কিন্তু ভাবস্পর্শ পেলে বিকশিত হবে। তখন সাধক মধু পাবে। এর আগে সাধক সৌগন্ধ পায়। সে সৌগন্ধ এত তীব্র যে তাতে আটকে রাখে। অবধূত বললেন মনকে অতন্দ্রিত রাখতে হবে অর্থাৎ তন্দ্রারহিত করে রাখতে হবে। মন আমাদের না বলেই অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু এ বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। মন যেন না বলে না যায়। তারপর অবধূত বললেন—এটি কেমন করে সম্ভব ? 'যস্মিন্ মনো লব্ধপদম্'—শ্রীধরস্বামিপাদ এই যস্মিন্ পদের অর্থ করলেন পরমানন্দরূপে ভগবতি। ভগবান যদি পরমানন্দস্বরূপ না হন তাহলে মন তাতে যাবে কেন ? মন তো সুখান্বেষী। যেখানে সুখ পায় সেখানে ছুটে যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপায় জীবাত্মা ফিরলে মনও ফিরবে। মন প্রবল হয়ে আত্মার ওপর আধিপত্য করে। মন যখন পরমানন্দ ভগবানে ডুবে যায়—তখন ধীরে ধীরে কর্মরেণু ত্যাগ করে। কামক্রোধাদি সাগরের একটা তরঙ্গ পার হওয়া যায় না, সাগর পার হওয়া তো পরের কথা। মন ভগবানে না বসলে কর্মবাসনা ত্যাগ হয় না। অমৃত গ্রহণ করতে পারলে তবে বিষ ত্যাগ হয়। ধীরে ধীরে ত্যাগ হয়। ধীরে ধীরে বললেন কেন অবধূত ? কারণ সাধকের মনের সংশয়ান্বিত অবস্থা থেকে যায়। শিশু যেমন মায়ের কোলে থেকেই মামার হাতের খাবারের ঠোঙা পেতে চায়, আমরাও তেমনি মহামায়ার কোলে থেকেই ভগবৎপাদপদ্ম পেতে চাই। ভগবৎপাদপদ্ম পাওয়া যাবে কিনা এই সংশয় ঘোচাতে

ঘোচাতেই দেরী হয়ে যায় তাই শনৈঃ শনৈঃ বললেন—তখন বর্দ্ধিত সত্ত্বগুণের দ্বারা রজঃ ও তমঃ গুণ নিবৃত্ত করে। বর্দ্ধিত সত্ত্বগুণের চেহারা স্বামিপাদ বললেন—"উপশমাত্মকেন······"। তখন প্রাকৃত বস্তুতে রুচি কমবে। তখন আর লয় বা বিক্ষেপ (মনের চাঞ্চল্য) থাকে না। এই লয় এবং বিক্ষেপই সাধনকে নষ্ট করে। বাসনাই বিক্ষেপ ও লয় ঘটায়। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির দ্বারা রজঃ ও তমোগুণের বিনাশ হয়। রজঃ ও তমঃ চলে গেলে সত্ত্বও চলে যাবে—নিরিন্ধনাগ্নির মত। কাঠ না থাকলে যেমন অগ্নি থাকে না। গুণ এবং তার কার্য্য হল ইন্ধন। বর্দ্ধিত সত্ত্বগুণের দ্বারা যখন সত্ত্বগুণও চলে যাবে তখন নির্ব্বাণ লাভ অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ। এইটিকেই পতঞ্জলিমুনি বলেছেন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন আর চিত্তচাঞ্চল্য থাকে না। তখন ধ্যেয় বস্তুতে মন নিশ্চল হয়ে বসে। মনের যখন চাঞ্চল্য কিছু থাকে তখন হয় সংপ্রজ্ঞাত সমাধি। বাতাসের চাঞ্চল্যে যেমন পদ্ম চঞ্চল হয়। আর বাতাসরহিত প্রদীপশিখা যেমন নিশ্চল হয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়। গীতাবাক্যে ভগবান বললেন—

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।

—গীতা ৬।১৯

বাসনাবাতাস তাড়িত না হলে ধ্যানশিখা তখন ধ্যেয়বস্তু গৌরগোবিন্দ পাদপদ্মে যায়—তখনই ইষুকারের অর্থাৎ শরকৃৎ ব্যক্তির অবস্থা হয়।

অবধূত শরকৃৎ গুরুর কথা বলছেন। সাধক যখন ভগবানের আস্বাদ পায় তখন তার প্রাকৃত রুচি ত্যাগ হয়ে যায়। মধু পেলে যেমন চিটে গুড় আর ভাল লাগে না। অন্য সাধন জ্ঞানযোগাদির দ্বারা প্রাকৃত রুচি ত্যাগ করতে হবে। ভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন—নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। নিস্ত্রৈগুণ্য মানে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের অতীত অবস্থা। রজঃ ও তমঃকে দমিন করা পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের প্রয়োজন। বৃক্ষছেদনের পর যেমন অস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না তেমনি রজঃ ও তমোগুণ দমনের পর আর সত্ত্বগুণের প্রয়োজন থাকে না। শ্রীএকাদশে বলা হয়েছে—

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥

—ভাঃ ১১।১২।২৪

এমন অনেক পাখী আছে যারা গাছের রঙে গায়ের রং মিলিয়ে থাকে। সেই পাখীকে খুঁজে পেতে হলে গাছ কেটে পাখীকে খুঁজে নিতে হয়। এখানেও গুরুপাসনার দ্বারা শাণিত বিদ্যা-কুঠারের দ্বারা রজঃতমোগুণরূপ বৃক্ষকে কেটে জীবাত্মা-পাখীকে খুঁজে নিতে হবে। বিদ্যা হল সত্ত্বগুণের বৃত্তি। যদিও সংসারবৃক্ষের মূল বলা হয়েছে তিনটি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ কিন্তু তার মধ্যে রজঃ তমঃ প্রধান বলে তাদের ছেদনের কথা বলা হয়েছে। সংসার মানে বিষয়বাসনা। রজোগুণের ফলে বিষয়বাসনা হয়। আর তমঃ বিষয়বাসনাকে মোহযুক্ত করে রাখে। তাই আমাদের সৎ বাসনার উদয় হয় না অর্থাৎ বিষয়বাসনা যে অনুচিত এই বোধ আসতে দেয় না। তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ তাই তার কাজ হয় পুণ্যাদিতে প্রবৃত্তি। এর ফলে স্বর্গাদি লাভ। সাদা লাল কাল চোর রাজপুত্রকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। কাল ও লাল চোর তার গয়না খুলে প্রাণে মারবার সঙ্কল্প করেছিল। কিন্তু সাদা চোর তাকে প্রাণে মারতে দেয়নি—তাকে নগরের পথ দেখিয়ে দিল কিন্তু সে চোর তো তাই নগরে যেতে পারে না কারণ চোরের নগরে যেতে মানা। নগর হল শ্রীগৌরগোবিন্দপাদপদ্ম। সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রকৃতির এই ত্রিবিধ গুণ সেখানে যায় না। তবে সত্ত্বগুণ ভগবানের সন্ধান দেয়। সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। একই পরমপুরুষের স্বরূপ হরি বিরিঞ্চি হর তবু যে কোন একজনকে ভজলে হবে না। এইটিই ভাগবতীয় সংবাদ। কিন্তু তিনজনের স্বরূপ তো একই তবে যে কোন একজনকে ভজলে হবে না কেন? এ জগতেও দেখা যায় পোষাকের মহিমা আছে। ধূলোয় গড়াগড়ি দেওয়া ছেলে যখন কোটপ্যাণ্ট পরে তখন সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পরমপুরুষেরও তাই। গুণগ্রহণের ভেদে মনোবৃত্তির ভেদ হয়েছে। তমোগুণের আশ্রয়কারী হরের উপাসক বৃকাসুর তম আবরণে আটকে গিয়ে—'সত্যং শিবং

সুন্দরম্' এই স্বরূপের সাক্ষাৎ না পেয়ে বিনাশশীল ফল কামনা করল। হিরণ্যকশিপু রজোগুণের আশ্রয়কারী ব্রহ্মার উপাসনা করে অমরত্ব অর্থাৎ বিষয়ভোগ বর চাইল। তমোগুণের আবরণ লৌহকপাট, রজোগুণের আবরণ হল কাঠের কপাট আর ধ্রুব উপাসনা করলেন স্বচ্ছ কাঁচের আবরণের মত সত্ত্বগুণের দেবতা বিষ্ণুভগবানের। এ আবরণ আবরণের কাজ না করে স্বরূপকে আরও উজ্জ্বল করে প্রকাশ করে। সর্ব্ববিপদের সম্পদ্ হলেন হরি। তাই তাঁর উপাসনা করে ধ্রুবের সব কামনা মিটে গেছে। তাই ধ্রুব বললেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং।
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যম্॥
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং।
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥ —হরিভক্তিসুধোদয়

সিংহাসন প্রাপ্তির আশায় তপস্যা করতে এসেছিলাম বটে কিন্তু তখন তো জানতাম না তোমার এমন ভুবনমোহন রূপ আছে—তাই ধ্যানী ঋষি যোগী মুনি যুগ যুগ ধরে বসে তপস্যা করেও যে তোমার পাদপদ্মের নাগাল পায় না সেই পাদপদ্ম আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাই আর তুচ্ছ রাজসিংহাসন পাওয়ার জন্য আমার লোভ নেই। যেমন একজন ব্যক্তি কাঁচ খুঁজতে বেরিয়ে যদি একটি পরশমণি হাতে পেয়ে যায় তাহলে তার যেমন আর কাঁচের প্রতি দৃষ্টি থাকে না—এও সেইরকম। বৃকাসুর মহাদেবের কাছে চেয়ে বসলেন আমি যার মাথায় হাত দেব সে যেন বিনাশ পেয়ে যায়। মহাদেব বললেন, 'তথাস্তু'। কারণ বৃকাসুর এত উগ্র তপস্যা করেছে যে এ বর না দিয়ে উপায় ছিল না। তখন বৃকাসুর বরটি ফলবে কি না মহাদেবের মাথায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে উদ্যত। এমন সময় মহাদেব প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছেন আর ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান শরণাগতবৎসল, তাই বৃকাসুর ও মহাদেবের মাঝখানে এসে উপস্থিত। ব্রহ্মচারীর বেশে ভগবান এসেছেন। তাঁর মিষ্টি চেহারায় মিষ্টি কথার ফাঁদে বৃকাসুরের বিভ্রম এসে গেল। ভগবানের

কথায় মুগ্ধ হয়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে নিজেই বিনাশ পেয়ে গেল। বৃকাসুরের উগ্র তপস্যার ফল পেল বিনাশ। কিন্তু নর্ষে ভক্তও দেবাদিদেব শঙ্করের কাছে বর পেয়েছেন। কিন্তু নর্ষের কাছে বাবার ওপর এই তমোগুণের আবরণ ছিল না। তাই নর্ষে বাবা ভোলানাথের চিদানন্দবিগ্রহ সদাশিব স্বরূপের দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন এবং পরমানন্দ অনুভব করলেন। এটি অপার আনন্দানুভূতির ক্রিয়া। এমনি তমোগুণ আবরণের কাজ করে কিন্তু নর্ষে ভক্তের মত ভক্তই তমোগুণ ভেদ করে শান্তং শিবং সুন্দরমের সাক্ষাৎ লাভ করে। এই দর্শন কার হয়েছে কি করে জানা যাবে? তখন আর তার চাওয়া চলবে না। বিষয়রোগের বাসনাই চাইয়ে দেয়। ধ্রুব তো বালক, বিবেচক নয়, তবু তার কামনা ছিল না। একই পরমেশ্বরের স্বরূপ জেনেও অন্য কোন স্বরূপ কল্যাণ দিতে পারে না। সত্ত্বতনুই একমাত্র কল্যাণ দান করে। সত্ত্বগুণের স্বচ্ছ আবরণ বাধা দেয় না বরং ভাল করে প্রকাশ করে কাঁচের আবরণের মত। তাতে আনন্দময়ের সাক্ষাৎ দর্শন করায়। তাই সত্ত্বগুণের মূল্য আছে। গাছে জল আর সার দিলে তবে সে গাছ বাড়ে। এই সত্ত্বগুণ বাড়ে কেমন করে ভগবান সে কথা গীতায় বলেছেন। এই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মন স্থির হয়ে বসবে। তখন মনকে টানবার আর কেউ থাকে না। কাঠ থাকলেই আগুন থাকে আর কাঠ না থাকলে আগুন থাকে না। তেমনি সত্ত্বগুণের দ্বারা রজঃ ও তমঃ বিধূত করে সত্ত্বগুণেরও নিবৃত্তি হয়ে যায়। সাধক তখন নির্গুণ হয়। তখন সে স্থির হয়ে যায়। চিত্ত যখন ভগবানে অবরুদ্ধ হয়ে যায়—তখন বাইরের বা অন্তরের কোন খবরই সে রাখে না। জীবের চিত্ত রূপাদি পঞ্চ বিষয়ে অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই বিষয়গুলিকে চায়। প্রাকৃত বিষয় এতটুকুতে চিত্ত আটকে যায়। ভগবানের একটি নাম আছে অধোক্ষজ। সমস্ত অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান যেখানে অধঃকৃত হয়ে যায়। ভগবানের একটি নাম আছে হৃষীকেশ। জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেখানে চিরতরে লুপ্ত হয়ে থাকতে পারে। মহাজন বলেছেন—

যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
নরনারী করে আকর্ষণ।

শ্রীমতী রাধারাণী বলেছেন—

লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখিলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

ঘরের মধ্যে থাকলে যেমন বাইরে কি আছে জানা যায় না তেমনি ভগবৎ পাদপদ্মে মন অর্পিত হলে বাইরে মায়ার জগতে কি আছে বুঝা যায় না। যেমন 'ইষৌ গতাত্মা কি বিবেদ পার্শ্বে।' ইষুকার অর্থাৎ শরকৃৎ যে একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করে শর তৈরী করছে তখন তারই পাশ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে রাজা যাচ্ছেন কিন্তু ইষুকার তার কিছুই জানতে পারল না—এও সেইরকম। মন যখন ভগবানের শ্রীচরণে একাগ্রভাবে নিবিষ্ট হবে তখন আর কিছুই তার মনে থাকে না। কোন কামনার দোলা তার চিত্তকে চঞ্চল করে না। সে অচঞ্চল ও অবিক্ষুব্ধ থাকে।

এর পরে অবধূতজীর আর একজন গুরু হল সর্প। তার কথা বলছেন। সর্প তো খল ক্রূর। কিন্তু যার গুণ দেখা স্বভাব সে সকলের মধ্যেই গুণ দেখে। অবধূতজীও তাই সর্পের মধ্যে এমন গুণ দেখেছেন যে তাকে গুরুপদে বরণ করেছেন। সর্প জনসঙ্গ ভয়ে একাকী বিচরণ করে, অনিকেত (গৃহহীন—ঘর বাঁধে না) অপ্রমত্ত অর্থাৎ সাবধানী এবং গুহাশয়—গুহার মধ্যে অর্থাৎ অতি গুপ্ত স্থানে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। অবধূত বললেন সর্পের এই দৃষ্টান্তে সাধককেও তাই হতে হবে। নিঃসঙ্গ গুণ তো কুমারীর কঙ্কণের মত। সেইজন্য অবধূত কুমারীকে গুরুপদে বরণ করেছেন। আবার কেন নিঃসঙ্গতায় সর্পকে গুরু বলে স্বীকার করলেন? এতে তো পুনরুক্তি দোষ বলে মনে হয়। কিন্তু ঋষিবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ (অনবধানতা অসাবধানতা ', বিপ্রলিপ্সা (পরপ্রতারণেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য জনিত ভ্রান্তি)—এই চারটি দোষের কোন দোষই স্পর্শ করে না। এখানে যোগিসঙ্গত্যাগে কুমারীকে গুরু আর সাধারণ জনসঙ্গত্যাগে সর্পকে গুরুপদে বরণ করেছেন। কাজেই

পুনরুক্তি দোষ হবে না। জনসঙ্গভয়ে রাজর্ষি ভরত একাকী বিচরণ করবেন—ভরত বলেছেন—

অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি।

—ভাঃ ৫।১২।১৫

সর্প অপ্রমত্ত অর্থাৎ সাবধানী। লুকিয়ে থাকে কারণ অন্যে যদি জানতে পারে তাহলে শত্রু বাড়বে। সাধন সম্পত্তিকে লুকিয়ে রাখতে হবে। আচারে ব্যবহারে এমন থাকতে হবে যাতে কেউ জানতে না পারে। সর্পের মত একাকী থাকতে হবে। আর অল্পভাষী হতে হবে। মিতভাষী হতে হবে। সর্প যেমন নিজে ঘর বাঁধে না, ইঁদুরের গর্তে থাকে। সেখানেই আহার বাসস্থান দুইই মিলে যায়। সাধকেরও তেমনি গৃহারম্ভ সুখের কারণ হয় না—পরন্তু দুঃখেরই কারণ হয়। কারণ এর কোন ফল নেই। গৃহারম্ভো হি দুঃখায়। আমরা যে গৃহে এত আসক্ত হয়ে থাকি সেই গৃহারম্ভ দুঃখের এইটিই অবধূত বলছেন। কাজেই পথ বড় কঠিন। তবে অবধূতের বাক্যটি মনে রাখতে পারলেও উপকার আছে।

শ্রীশুকদেব বলেছেন—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥

—ভাঃ ২।২।৫

পথের মাঝে কি লজ্জানিবারণের জন্য কাপড়ের টুকরো পড়ে থাকে না? পরোপকারী বৃক্ষ কি উদরপূর্তির জন্য ফল দান করে না? পিপাসা নিবৃত্তির জন্য নদীর জলই তো যথেষ্ট, বাসস্থানের জন্য তো পাহাড়ের গুহা রয়েছে। আর সকলের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান তো সকলকেই রক্ষা করবেন। তাই কবিগণ (ভক্তগণ) ধনমদে মত্ত যারা সেই ধনী ব্যক্তির আশ্রয় কেন গ্রহণ করবেন মহারাজ?

শ্রীশুকদেবের বাক্যে 'কবি' পদটি ভক্তকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। গৃহারম্ভ দুঃখের। এটি বিফল কার পক্ষে? অধ্রুবাত্মনঃ অর্থাৎ অনিশ্চিত যে আত্মা অর্থাৎ দেহ তার পক্ষে অর্থাৎ দেহ তো নশ্বর চিরদিন থাকবে না সেই দেহের পক্ষে গৃহারম্ভ বিফল। সাধুর ব্যবহার আমরা বুঝি না। সাধু ব্যবহার এইরকমই। নবদ্বীপের প্রভুপাদ বৃন্দাবনের ভজনীয়া গৌরশিরোমণি প্রভুকে শীতে একখানি কম্বল দেন। শিরোমণি প্রভু সে কম্বল ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—এ কম্বল শত্রুর কাজ করেছে। ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। নাম করতে দেয় নি। অতএব যে বস্তু নাম ভুলিয়ে রাখে তাতে আমার প্রয়োজন নেই। গৃহের ইট, কাঠ, চূণ, সুরকিতে যদি চিত্ত আসক্ত হয়ে পড়ে তাহলে গোবিন্দে চিত্ত দেবে কেমন করে? সর্প যেমন পরগৃহে থেকেই সুখ লাভ করে সাধককেও তেমনি করতে হবে। ১১-১৫

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ॥
এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ॥ ১৬
কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ॥ ১৭
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥ ১৮
কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম॥ ১৯
তামাহ ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজতীং বিশ্বতোমুখং।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্॥ ২০
যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সংতত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ

উর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সার কাছে শিক্ষা—এক নারায়ণ দেব পরমেশ্বর নিজের মায়া শক্তি দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করে কল্পান্তে আবার কালশক্তি দ্বারা সংহার করে আত্মাধার ও সকলের আশ্রয়রূপে এক অদ্বিতীয় হয়ে থাকেন। ১৬

প্রধান এবং তার উপাধিস্বরূপ পুরুষেরও আদিপুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর আত্মানুভাবরূপ কাল দ্বারা সত্ত্বাদিগুণের সমতা প্রাপ্ত হলে ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রেষ্ঠ কৈবল্যরূপে অবস্থান করেন। ১৭

কারণ সেই পরমেশ্বর নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ, আনন্দঘন ও নিরুপাধিক। ১৮

হে শত্রুনাশন (মহারাজ)! কেবল আত্মানুভবরূপ কাল দ্বারা নিজের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে ক্ষুব্ধ করে সেই মায়া দ্বারা ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্বকে প্রথমে সৃষ্টি করেন। ১৯

অহংকার দ্বারা বিশ্বতোমুখ বিশ্বের সৃষ্টিকারিণী—তাই ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াকেই সূত্রাত্মা বলা হয়। তাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত আছে এবং যার দ্বারা জীবের সংসার গতি প্রাপ্তি হয়। ২০

ঊর্ণনাভি যেমন হৃদয় থেকে ঊর্ণা বিস্তৃত করে তাতে ক্রীড়া করে আবার নিজের মধ্যে সেটিকে গ্রাস করে সেইরকম মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। ২১

শ্রীঅবধূতজীর পরবর্ত্তী গুরু হলেন ঊর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা। মাকড়সার কাছ থেকে অবধূত শিক্ষা করলেন এক নারায়ণই জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা। স্বামিপাদ বললেন—কোন কারকসামগ্রীকে অপেক্ষা না করে একা ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা হন। কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে তো ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ ছিল না। যাকে দেখে জ্ঞান হয় সেই গুরু। ভগবান নিজের মায়ার দ্বারা সৃষ্টি কাজ করেন। এই মায়ার বিশেষণ হল কালকলয়া। শ্রীজীবপাদ বললেন কাল হয়েছে কলা যার এমন মায়া। ভগবান হতে অনুক্রমে সৃষ্টি আর ব্যুৎক্রমে লয় সংঘটিত হয়। পৃথিবীর সৃষ্টি জল থেকে। পৃথিবীর মধ্যে গন্ধগুণ থাকায় এর পৃথক্ আকার, তা না হলে জলের আকারই প্রাপ্ত হত। এই অখিলাশ্রয় ভগবান এক এব অভূৎ। অদ্বিতীয় তিনি অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য। সজাতীয় হল জীব চৈতন্যস্বরূপ কিন্তু জীব অণু-চৈতন্য আর সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর হলেন বিভূচৈতন্য—তাই সজাতীয় জীব হতেও পরমেশ্বর ভিন্ন। এইজন্য পরমেশ্বরকে এক বলা হয়েছে আর অদ্বিতীয় বলা হল বিজাতীয় প্রধান (মায়া) থেকে পরমেশ্বর ভিন্ন বলে। জীব কারণার্ণবশায়ীর দেহে আছে কিন্তু কারণার্ণবশায়ী পুরুষের জ্ঞান, বিবেক অর্থাৎ তার স্বরূপ সম্বন্ধে জীবাত্মার কিছুই বোধ নেই। তিনি আত্মাধার অর্থাৎ আত্মা এব আধারো যস্য। অখিলশক্তির আধার তিনি। প্রকৃতি যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন সেখানে কোন সৃষ্টি নেই। আত্মানুভব কালের দ্বারা সমস্ত শক্তির সাম্য বিধান করে। আদি পুরুষ প্রধান

পুরুষেশ্বর। প্রধান হল প্রকৃতি আর পুরুষ হল জীব অর্থাৎ প্রকৃতি এবং জীবের যিনি ঈশ্বর। পরাবরাণাং পরম—পর ব্রহ্মা অবর অর্থাৎ মুক্তজীব তাদের যিনি পরম অর্থাৎ পরমাশ্রয় কৈবল্যসংজ্ঞিত স্বরূপানন্দরূপ তিনিই একমাত্র বিরাজমান থাকেন। 'কেবল' বলতে এখানে বেদান্তের কেবল-স্বরূপ অর্থাৎ একক নয়। 'কেবল' বলতে ধাম পরিকর লীলার সহিত বর্ত্তমান। অর্থাৎ বিজাতীয়স্পর্শশূন্য। চণ্ডীতে যেমন দেবী বলেছেন—দ্বিতীয়া কা মমাপরা? নবদুর্গা নবশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু নবদুর্গা ভিন্ন নন। একই স্বরূপ—সব থাকলেও তিনি একাকী। কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ। নিজের অনুভবানন্দে অর্থাৎ লীলানন্দে তিনি নিত্য বিরাজমান। এই পর্য্যন্ত লয় কার্য্যের কথা বলা হল। এর পরে পরমেশ্বরের সৃষ্টি কাজ বলা হবে।

অবধূতের গুরু উর্ণনাভি। উর্ণনাভি যেমন নিজের মুখ হতে লালা বার করে তাই দিয়ে জাল তৈরী করে আবার সেটিকে নিজের মধ্যে সংহার করে নেয়—অবধূত তার কাছে শিক্ষা করলেন ভগবানও তেমনি কারক সামগ্রী নিরপেক্ষ হয়ে সৃষ্টিকাজ করেন আবার সে সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে সংহৃত করে নেন। পূর্ব্বে ব্যুৎক্রমে সংহারের কথা বলা হয়েছে এখন অনুক্রমে সৃষ্টির কথা বলছেন।

ভগবান নিজে বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ —গীতা ৪।৮

যুগে যুগে তো তিনি আসেনই, কিন্তু এ ছাড়া প্রয়োজন হলেও আসেন। দেহ অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন, ব্রহ্মাণ্ড-দেহ অসুস্থ হলেও তেমনি তার চিকিৎসাবিধানের জন্য ভগবান নিজে বা তাঁর ভাগবতী শক্তি আবির্ভূতা হন। জীবের দেহ বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি ধাতু দিয়ে গঠিত। তাই এই দেহকে বলা হয় ত্রিধাতুক। আর ব্রহ্মাণ্ড দেহ সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিনটি গুণে গঠিত। এই তিন গুণের দেবতা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এর মধ্যে সত্ত্বগুণ থেকে দেবতা, রজোগুণ থেকে

অসুর আর তমোগুণ থেকে যক্ষ রাক্ষসের জন্ম। এই তিন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য দূর্ব্বারস (ব্রহ্মা) তুলসী (বিষ্ণু) ও বেলপাতার (মহেশ্বর) রস পান করলে আর রোগের ভয় থাকে না। জীবের রোগের চিকিৎসক হলেন ভগবান নিজে বা তাঁর ভাগবতী শক্তি। চণ্ডীমাহাত্ম্যে এই ভাগবতী শক্তির আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। ভগবান জগতে আবির্ভূত হয়ে পালন কাজ করেন—এটি বুঝা যায় কিন্তু তাঁর সৃষ্টি ও লয় কাজ কি করে বুঝা যাবে ? তার দৃষ্টান্ত দিলেন অবধূত মাকড়সা। সৃষ্টি, স্থিতি (অর্থাৎ খেলা) এবং সংহার নিজেই করেন। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিনটি গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন তার থেকে সৃষ্টি কাজ সম্ভব নয়। তাই সেই অদ্বিতীয় কেবল পরমাত্মার তিনটি গুণকে সংক্ষোভিত করেন। সাংখ্যকারিকায় বলা আছে—সত্ত্বরজস্তমোগুণানাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। এই প্রকৃতির সাতপ্রকার বিকৃতি। ঈশ্বর ঈক্ষণ পাওয়ার পর বিকৃতি লাভ করে। যেমন তণ্ডুল জল এবং আগুনের স্পর্শ পাওয়ার পর বিকৃতি লাভ করে। মাতাপিতার সহযোগে যেমন সন্তানের জন্ম তেমনি মহামায়া মাতা এবং কারণার্ণবশায়ী পিতার সংযোগে ব্রহ্মাণ্ড সন্তানের জন্ম। এখানে কারণার্ণবশায়ী পুরুষের সঙ্গে মহামায়ার সংযোগ হওয়া তো সম্ভব নয়। এখানে ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টিতে সংযোগ হয়। শ্রুতি বলেছেন—স ঐক্ষত। কারণার্ণবশায়ী পুরুষের শরীরেই অনন্ত কোটি জীব থাকে সূক্ষ্মরূপে বীজরূপে। কিন্তু তারা ভগবানকে পায় না। কারণ জ্ঞানে না পেলে ঠিক পাওয়া হয় না। এটি বিনা সাধনে সম্ভব নয়। বিনা সাধনে ভগবানকে স্পর্শ করলেও তাঁকে জানা যায় না। শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি আছে—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। —গীতা ৭।২৫

যোগমায়ার দ্বারা আমি নিজ স্বরূপকে আবরণ করে রাখি অর্জ্জুন, সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করি না। জিহ্বা খারাপ হলে যেমন খাদ্য ভাল লাগে না—জিহ্বাকে তৈরী করে যেমন খাদ্য আস্বাদ করতে হয়, তেমনি সাধনের দ্বারা হৃদয় তৈরী করতে হবে তবে ভগবানকে মিষ্টি লাগবে। ভূত

যেমন নন্দগ্রামের বাবাজীকে বলেছিল—"ভজন পুরা কর্ লে তব্ ভগবান্ আপসে মিল জায়েগা।" মহাজন বলেছেন—যাদের খুঁজে খুঁজে পাওয়া যায় না—তারা খুঁজে খুঁজে আপনি আসবে। দেহে জীবাণু থাকলেও যে যেমন আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেকের খবর পায় না তেমনি কারণার্ণবশায়ী পুরুষের দেহে জীব থাকলেও তারা ভগবানকে পায় না। ভগবৎ অনুভূতি বিনা সাধনে হয় না। তাই এত ভজকট। আগে ব্যাকরণ, সাহিত্য পড়িয়ে তবে যেমন শাস্ত্রগ্রন্থ হাতে দেওয়া হয়—তেমনি আগে ভজন করিয়ে তবে গোবিন্দ-গ্রন্থ হাতে দেওয়া হয়। এখানে অবধূতজী বললেন—কেবলাত্মানুভাবেন। সৃষ্টি কাজ করবার বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করবার আর কেউ নেই। তিনি নিজেই করেছেন। ভগবান বললেন 'দৈবাৎ' এখানে বললেন—কেবলাত্মানুভাবেন। কপিল এই দৈবকে বলেছেন 'কাল'। অর্থাৎ ভগবানের চেষ্টা। ভগবানের চেষ্টার নামই কাল। ভগবান ত্রিগুণাত্মিকা নিজমায়ার দ্বারা সৃষ্টিকাজ করলেন। সূত্র মানে মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব। এরই নাম প্রাণশক্তি অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি। যদুমহারাজকে অবধূত অরিন্দম বলে সম্বোধন করেছেন। অরীন্ অর্থাৎ রাগাদীন্ দময়িতুং সমর্থঃ। তা না হলে এখানে প্রাকৃতশত্রুদমনকারী মহারাজ এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। মায়া হতে প্রথম সৃষ্টি হল সূত্র। এইটিই জীবের সংসারবন্ধনের হেতু। এইটিই জীবের বন্ধনের আদি কারণ। অবধূতের বলবার উদ্দেশ্য, মহারাজ, মায়ার থেকে জীবের বন্ধনের আদি কারণ সূত্র সৃষ্টি হলেও মহারাজ, আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ আপনি তো অরিন্দম। রাজার যেমন চোর ডাকাতে ভয় থাকে না তেমনি কামাদি চোর ভগবৎ-পাদপদ্ম আশ্রয়কারী ব্যক্তির কিছু করতে পারে না। মায়া এমনই প্রবল যে তার কাছে সবাই দুর্ব্বল। কিন্তু জীব তো চিৎকণ সে কেন মায়াকে ভয় করে। কাঠ যতই বড় হোক্ সে তো অগ্নিকণাকে ভয় করে। জীব যে মায়ার কাছ থেকে ভয় পায় কারণ জীবের যে দুর্ব্বলতা আছে। ভগবৎবিমুখতাই জীবের চরম দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতার সুযোগেই

মায়া তাকে আক্রমণ করেছে। প্রসঙ্গ উচিত সম্বোধন হওয়া চাই। এখানে প্রাকৃতশত্রুদমনকারী এ অর্থ নয়। যে বদন ভরে গৌরগোবিন্দ বলে তাকে মায়া বা মায়ার চর কিছু করতে পারে না। যদুমহারাজের (অরিন্দম) এই গুণ আছে বলেই ভগবান তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই গুণবান্ যদুমহারাজকে তাই অবধূত সেবা করে গেলেন। জীববন্ধনের প্রথম কারণ সূত্র হলেও মহারাজের ভয় নেই। কারণ তিনি যে অরিন্দম।

শাস্ত্র বলেন—

তামাহু ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজতীং বিশ্বতোমুখং।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্॥

—ভাঃ ১১।৯।২০

ত্রিগুণাত্মিক মায়ার প্রথম কাজ হল মহত্তত্ত্ব। এর থেকে নানা ভূতের সৃষ্টি। মহত্তত্ত্ব হতে অহংকারতত্ত্ব। তার দ্বারেই সব সৃষ্টি। গীতায় যেমন ভগবান বলেছেন—

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। —গীতা ৭।৭

মহত্তত্ত্বে জগৎ খচিত। এতেই জীব সংসরতে। অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়সংযোগের নাম সংসার। জীবাত্মা শুদ্ধ ছিল। তার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কিছু ছিল না। পঞ্চ বিষয় ভোগ করাবার জন্য অবিদ্যা নির্মিত আবিদ্যক দেহ জীবাত্মাকে দেওয়া হল। এই দেহের মধ্যে জীবাত্মাকে পুরে দেওয়া হল। আগুনের কণাকে যেন মাটির ভাঁড়ে রাখা হল। অপূর্ব্ব মানে এখানে সুন্দর এই অর্থ নয়। এখানে অপূর্ব্ব মানে যা পূর্ব্বে হয় নি। যদি বলা যায় স্থূল দেহ ত্যাগ করলে এ সংসার নিবৃত্তি তাও বলা যাবে না। কারণ স্থূলদেহ গেলেও জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহে আসক্তি ত্যাগ করতে পারে না। আর এই আসক্তিই হল বড় আসক্তি। জীবাত্মা যখন এই সূক্ষ্মদেহের আসক্তি ত্যাগ করতে পারে তখনই তার মুক্তি। প্রহ্লাদ এই মুক্তির কথাই বলেছেন—বীজনির্হরণং যোগঃ। ধানবীজ লাউবীজ থাকলে যেমন ধান বা লাউ পাওয়ার ভাবনা থাকে না তেমনি এই আসক্তি বীজ থাকলেও জীবাত্মার আর চুরাশী লক্ষ দেহ পাওয়ার

ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি জন্ম মরণের ক্লেশ নিবারণ করতে চায় তার এই বীজ নষ্ট করবার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। যা কিছু সাধন এই বীজ নষ্ট করবার জন্য। ভগবান তিনটি যোগের কথা বলেছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

—ভাঃ ১১৷২০৷৬

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। দুধে জলে মিশিয়ে দিলে খাঁটি দুধ পাওয়ার উপায় কি ? আগুনের জ্বালে চড়ালে জল মরে গিয়ে দুধ খাঁটি হবে। তেমনি সাধনঅগ্নিতে আবিদ্যক জল মরবে। আগুনের তাপ কম হলে কিন্তু জল তাড়াতাড়ি মরবে না। তাই আগুনের তাপ বাড়াতে হবে। যত আগুনের তাপ বাড়বে ততই জল তাড়াতাড়ি মরবে। ঘন করে গৌরগোবিন্দ বলতে হবে তবে আসক্তি বীজ তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে। আসক্তিই সৃষ্টি করছে। জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহে আসক্তি বড় গাঢ়। জীবাত্মার নিজের দেহেন্দ্রিয় নেই। ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধিযুক্ত দেহ দিয়ে জীবাত্মাকে বিষয়ভোগ করতে দেওয়া হল। গোবিন্দের অংশ হয়েও জীব অবিদ্যার প্রভাবে পড়ে ভ্রান্ত হল। দেহ বিষয়ভোগের উপকারী এই মনে করায় দেহতে প্রিয়তা বুদ্ধি হল এবং দেহকে পরম প্রিয় বলে মনে করল। স্থূলদেহের আসক্তি আমরা বুঝি। কিন্তু সূক্ষ্মদেহের আসক্তি আমরা বুঝি না। কিন্তু স্থূলদেহে জীবাত্মার আসক্তি দেখে সূক্ষ্মদেহের প্রতি আসক্তি অনুমান করা যায়। ভগবান উর্ণনাভির মত সূত্রকে বিস্তার করে আবার নিজের মধ্যে সংহার করেন। এই সংহারের রূপ হল মহেশ্বরের। কণ্ঠে মহেশ্বরের আবির্ভাব না হলে কখনও লয় হয় না। ১৬-২১

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্॥ ২২
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাস্তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥ ২৩
এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা যে শিক্ষিতা মতিঃ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ

পেশস্কৃৎ অর্থাৎ কুমড়ো পোকার কাছে অবধূতজীর শিক্ষা---মানুষের স্নেহে, দ্বেষে অথবা যেখানে যেখানে বুদ্ধির সঙ্গে মন গাঢ়ভাবে আসক্ত হয় তার সেই সেই রূপ প্রাপ্তি হয়। ২২

হে মহারাজ! এমন অনেক কীট আছে যে অন্য বলবান কীট যখন তাকে ধরে তখন সে গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করে ভয়ে তার রূপ ধ্যান করতে করতে পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ না করেই তার সমানরূপ প্রাপ্ত হয়। ২৩

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এইভাবে এইসকল গুরু থেকে আমি এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করেছি। আর আমি নিজের গুরুর কাছ থেকে যা শিক্ষা করেছি তা বলছি, শুনুন মহারাজ। ২৪

এর পরে অবধূতজী পেশস্কৃৎ কীট যে তাঁর আর এক গুরু তার কথা বলছেন। দেহী অর্থাৎ জীব যেখানে যেখানে তার মনের একাগ্রতাকে স্থাপন করে স্নেহে, দ্বেষে অথবা ভয়ে তারই স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। এইভাবে তাই ভগবানকে ধ্যান করলেও তার রূপ প্রাপ্ত হয়। এর নামই সারূপ্য মুক্তি। এই শিক্ষা পেয়েছেন অবধূত পেশস্কৃৎ কীটের কাছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই মনের ধারণার কথা বলতে গিয়ে বললেন মন তো কত বিষয়ই ধ্যান করে কিন্তু তাতে সকলের স্বরূপ তো প্রাপ্ত হয় না। যা ভাববে তারই রূপ পাবে না। কিন্তু যেখানে চিত্তবৃত্তিকে নিবিষ্ট করলে জীবনে আর চিত্ত তার থেকে ফেরান যাবে না—

তারই স্বরূপকে প্রাপ্ত হবে। যেমন রাজর্ষি ভরতের মৃগধ্যান এবং মৃগদেহ প্রাপ্তি। তেলাপোকা কাঁচপোকাকে ভাবতে ভাবতে কাঁচপোকা হয়ে যায়। তেলাপোকা তার দেহ ত্যাগ না করেই কাঁচপোকার সারূপ্য লাভ করে। সাধকও তেমনি তার প্রাকৃত দেহ ত্যাগ না করেই ভগবানের ধ্যানে চিন্ময় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় দেহ লাভ করে। দেবাদিদেব শঙ্কর দেবর্ষিপাদ নারদকে বলেছেন—

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাৎ দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা॥

কৃষ্ণভক্তিসুধা পান করতে করতে সাধকের দেহ দৈহিক সম্বন্ধে সব ভুল হয়ে যায়। তখন তার এই পঞ্চভূতে গড়া—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দময়রূপতাকে লাভ করে।

অবধূতজী বলছেন—এইভাবে এই সকল গুরুর কাছে আমি শিক্ষালাভ করেছি। এর পরে নিজের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তা বলি—শুনুন মহারাজ ২২-২৪

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতুর্বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কং।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি পারক্যমিত্যবসিতো
বিচরাম্যসঙ্গঃ॥ ৫

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান পুষ্ণাতি যৎ প্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্।
স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ সদেহঃ সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্মা॥ ২৬
জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কহি তর্ষা শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং
কুতশ্চিৎ।

ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তির্বহব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং
লুনন্তি॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ

আমার নিজের দেহের কাছে বিরক্তি এবং বিবেক শিক্ষা করেছি মহারাজ, তাই তাকে গুরুপদে বরণ করেছি। এই দেহের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে আর পর পর দেখা যায় এর থেকে দুঃখই পেতে হয়। অতএব এই দেহকে শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য এই মনে করে এর দ্বারাই তত্ত্ব নির্ণয় করতে হবে এইটি বুঝে নিয়ে আমি সঙ্গহীন (নিঃসঙ্গ) হয়ে বিচরণ করি। ২৫

এই দেহ অনেক কষ্ট স্বীকার করে ধন সঞ্চয় করে। এই দেহের প্রতি প্রীতিতেই মানুষ স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্য, পশু, ভৃত্য, আত্মীয়স্বজনকে বিস্তৃত-রূপে পালন করে। কিন্তু এই দেহের যখন আয়ু শেষ হয় তখন সে দেহান্তরপ্রাপ্তি সাধন কর্ম সৃষ্টি করে নিজে ওষধি বৃক্ষের মত বিনাশ পায়। ২৬

এই শরীরকে একদিকে জিহ্বা রসের প্রতি আকর্ষণ করছে, অন্যদিকে তৃষ্ণা জলের দিকে টানছে। আবার কোনদিকে শিশ্ন, কোনদিকে ত্বক্, কোনদিকে উদর, কোনদিকে শ্রোত্র, কোনদিকে ঘ্রাণ, কোনদিকে চক্ষু, আবার কোনদিকে কর্মশক্তি আকর্ষণ করছে—যেমন এক গৃহপতিকে বহু সপত্নী আকর্ষণ করে। ২৭

অবধূতজীর এর পরবর্ত্তী গুরু হলেন নিজের দেহ। দেহটিই বিরক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্য এবং বিবেকের হেতু। অর্থাৎ এই দেহ থেকেই বিবেক এবং বৈরাগ্য শিক্ষা করা যায়। এর আগে অবধূতজী বলেছেন—এদের সকলের কাছে আমি স্বাত্মোপশিক্ষিতা বুদ্ধি লাভ করেছি। এই স্বাত্মোপশিক্ষিতা বুদ্ধি বলতে কোন্ বুদ্ধিকে বুঝায়? এখন প্রশ্ন হচ্ছে জীবের উপেয় কোন্‌টি? অর্থাৎ মানুষকে কোন্‌টি পেতে হবে?

উপেয় হল দুঃখ পরিহার ও সুখপ্রাপ্তি। কপিলদেব বলছেন—জীবের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হল দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক সুখপ্রাপ্তি। দুঃখকে মানুষ পরিহার করতে চায় আর সুখকে পেতে চায়। কিন্তু এটি পেতে গেলে সুখ কি আর দুঃখ কি দুটিকেই ভাল করে জানতে হবে। সুখ সম্বন্ধে শ্রুতি বললেন—

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

ভূমাই সুখ—অল্পে সুখ নেই।

আর দুঃখ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—সংসারের নাম হল দুঃখ। সংসার বলতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করার নাম সংসার নয় কিন্তু অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়-সংযোগঃ এব সংসারঃ। এই সুখ দুঃখ জানার জন্য বিবেকের প্রয়োজন। এই সুখ দুঃখ জেনে তাকে পাওয়ার জন্য বুদ্ধিকে যখন কাজে লাগান যাবে তারই নাম স্বাত্মোপশিক্ষিতা মতি। অপূর্ব্ব মানে সুন্দর নয়। কিন্তু যা আগে কখনও হয় নি তারই নাম অপূর্ব্ব। এই মনুষ্য দেহ আগে পাওয়া যায় নি এখন পাওয়া গিয়েছে। যেমন বাঁধনো দাঁত। এটি খুলে রাখা যায় আবার পরা যায়। তেমনি কর্মফলে এই দেহটিকে পাওয়া যায় প্রতি জন্মে দেহ পরা হয় আবার প্রতি মৃত্যুতে দেহকে খুলে রাখা হয়। এই দেহধারণই বন্ধন। তাই কপিলদেব বললেন—তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ। প্রকৃতি চব্বিশটি (চতুর্বিংশতি) তত্ত্বযুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতারের ঈক্ষণ প্রভাবে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলে কি হবে? তার কোন গ্রাহক তো ছিল না। দোকানদার দোকানে গামলাভর্ত্তি রসগোল্লা সাজিয়ে রেখেছে কিন্তু তার যদি কোন গ্রাহক না

থাকে তাহলে তার কি দাম ? এখন গ্রাহক তো অচেতন হলে চলবে না। গ্রাহককে চেতন হওয়া চাই। দুইজন তো মাত্র চেতন আছেন। এক ঈশ্বর আর এক জীব। কিন্তু ঈশ্বর তো প্রকৃতির সৃষ্ট দ্রব্য (অচিৎ দ্রব্য) স্পর্শই করবেন না। আর বাকী রইল জীব। কিন্তু সেও তো চৈতন্যের অংশ—তাই সেই বা প্রকৃতির (প্রকৃতি জাত) বস্তু কেমন করে নেবে ? কিন্তু একটি ভরসা আছে জীব চেতন হলেও অণু। মায়ার তিনটি বৃত্তি—প্রকৃতি, অবিদ্যা এবং বিদ্যা। প্রকৃতি তখন অবিদ্যাকে পাঠালেন জীবকে প্রলুব্ধ করে মায়ার দেহ গ্রহণ করাবার জন্য। অবিদ্যা প্রথমে এ কাজে রাজী হয় নি। কারণ হাজার হলেও চৈতন্যস্বরূপ জীব মায়ার দ্রব্য নেবে কেন ? কাঠ যতই বড় হোক সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে ভয় করে। কারণ দুজনের মধ্যে দাহ্যদাহক সম্পর্ক। কিন্তু প্রকৃতি অবিদ্যাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন 'জীবকে মুগ্ধ করতে তুমি পারবে কারণ জীব হল অণুচৈতন্য। জীব গোবিন্দের অংশ হলেও তার একটি দুর্ব্বলতা আছে সেই অপরাধে তুমি তাকে মুগ্ধ করতে পারবে।' এ দুর্ব্বলতা জীবের কিসের দুর্ব্বলতা ? জীব অনাদিকাল থেকে কৃষ্ণপাদপদ্মে বিমুখ। এইটিই তার অপরাধ। অবিদ্যা জীবকে নানাভাবে মুগ্ধ করে বলল—এই দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি তুমি নাও, জগতের শব্দাদি বিষয় ভোগ কর—এতে আনন্দ পাবে প্রচুর। অবিদ্যার বাক্যজালকুহকে পড়ে জীব মুগ্ধ হল। তার আত্মজ্ঞানও (নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপের অনুভূতি) লোপ পেল। তখন মুগ্ধ হয়ে জীব দেহকে আমি বলে গ্রহণ করল এবং দৈহিক বস্তুকে আমার বলে গ্রহণ করল। কপিল ভগবান বললেন এই আমার বলে মনে করাটাই বন্ধন।

ভগবান শ্রীগোবিন্দই একমাত্র সুখ, তিনিই ভূমা। অবধূতজী বলছেন—আমার এই মনুষ্যদেহ থেকে আমি এই মতি লাভ করেছি। বিরক্তি ও বিবেক তো চাই। জীবাত্মার সঙ্গে আবিদ্যক এই দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগটিই দুঃখের কারণ। এখন যে উপায়ে অবিদ্যার সংযোগ শিথিল হবে সেই উপায় করতে হবে। জীবাত্মা পুষ্ট হলে অবিদ্যার খোসা আপনিই পড়ে যাবে। মোচার ভিতরে কলা পুষ্ট হলে যেমন বাইরের

খোসা আপনি পড়ে যায়। এখন জীবাত্মাকে পুষ্ট করার উপায় কি? জীবাত্মা তো চিৎ। কাজেই চিৎকে পুষ্ট করতে হলে চিৎ দিয়েই পুষ্ট করতে হবে। ভগবান চিৎ আর ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা এঁরা হলেন চিৎ—সব সচ্চিদানন্দময়। শাস্ত্রবাক্য আছে—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামে সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

নাম করাও যা কৃষ্ণ দেখাও তাই। চোখ কৃষ্ণ না দেখলেও জিহ্বা তো কৃষ্ণ দেখছে অর্থাৎ জিহ্বায় তো কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হচ্ছে। জিহ্বাও চোখের মত একটি ইন্দ্রিয়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে আত্মাকে পুষ্ট করে তার আবিদ্যক খোসা সেই পরিমাণে শিথিল হয়। পিতার প্রদত্ত বীজে মাতৃগর্ভে যেমন সন্তান পুষ্ট হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দত্ত চিৎ বীজ সাধক মাতার হৃদয়ে তেমনি অর্পিত হয়। কর্ণপথ দিয়ে এটি অর্পিত হয়। হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে সাধকের এই দেহের ভিতরেই একটি চিন্ময় দেহ তৈরী করে। এই দেহ পুষ্ট হলে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবায় এই দেহ লাগবে। পুষ্ট হবে কেমন করে? ভজনে পুষ্ট হবে। যিনি ভজনে যেমন পরিশ্রম করবেন তাঁর ভক্তিলতায় প্রেমফল তত তাড়াতাড়ি ফলবে। জীবের দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তি উপেয় লাভের জন্য একটা মাত্র উপায় আছে—বদনভরে গৌরগোবিন্দ বলতে হবে। জীবের যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে তার মধ্যে জিহ্বা ইন্দ্রিয় সবচেয়ে পটু। অন্ন যত ভোজন করা যাবে ততই যেমন তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় তেমনি যত ভজন করা যাবে ততই ভক্তি, ভগবৎ অনুভূতি ও সংসারে বিরক্তি হবে। প্রাকৃত রুচি টেনে ছিঁড়তে গেলে কষ্ট হয় কিন্তু আপনা থেকে যদি খসে যায় তাহলে আর কষ্ট নেই। প্রাকৃতরুচি ও গোবিন্দ-রুচি দুটি বিপরীতমুখী। মহাজন বলেছেন—

হরিতাল সে কোন ছার বিকার সে মৃত্তিকার
সে কি গোরা রূপের তুলনা?

এ জগতের বস্তু প্রাকৃত প্রপঞ্চময় আর গৌর হলেন অপ্রপঞ্চ রসভূপ। যাদের নয়ন গৌররূপে তৃপ্ত হয়েছে তারা আর অন্যরূপ দেখে না। পেট ভরে

গেলে খাদ্যের স্পৃহা যেমন থাকে না। ছেলেকে পেট ভরে খাওয়ালে সে যেমন আর খাওয়ার জন্য কাঁদে না। গোস্বামিপাদগণ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যা খাওয়া চলে সেই ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা দিয়ে পেট ভরিয়ে নাও ; তখন প্রাকৃত খাদ্যের প্রতি রুচি অর্থাৎ বিষয়ভোগস্পৃহা আপনিই চলে যাবে। ইন্দ্রিয় তখন আর প্রাকৃত ভোগ চাইবে না। তখন প্রাকৃতিক বস্তু তুচ্ছ হয়ে যায়। ভগবদনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেলে আবিদ্যক দেহ খসে যাবে। এর নাম খাঁটি বৈরাগ্য। এই বোধটি যে মতি দেয় তারই নাম শিক্ষিতা মতি। জগতে সর্ব্বত্র ভয়, একমাত্র বৈরাগ্যই অভয়। বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। এই বৈরাগ্য যিনি দান করেন তিনিই গুরু। বিরাগের ভাবকে বৈরাগ্য বলে। বিরাগ মানে বিশেষ রাগ আর বিগত রাগ। প্রাকৃত বিষয়ে বিগত রাগ আর ভগবানে বিশেষ রাগ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলেছেন—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধি র্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুকে বলেছেন—বিনা সর্ব্বত্যাগং ন ভবতি ভজনং হ্যসুপতেঃ। একঃ পুরুষঃ বলতে কোন্ পুরুষকে বুঝাচ্ছে? শ্রুতিতেও তাঁর এক বলে নাম আছে।

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঃ ঈড্যঃ।

পুরাণ বলতে পুরা অপি নব বুঝায়। পুরাণ অর্থাৎ নিত্য নবকৈশোর নটবর। এই এক এবং পুরুষ কে? ইনিই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যশরীরধারী। এঁকে এক বা পুরাণপুরুষ বলে লোকে জানে না কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলে জানে। পরমকরুণ শ্রীগুরুমহারাজ ১০৮ শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের নামের তাৎপর্য্য দেখিয়েছেন—

হল শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম।
দিতে রাধাপ্রেমের প্রতিদান॥

হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—

আস্বাদিতে রাধার প্রেমমর্ম্ম প্রচারিতে নিজ নামধর্ম্ম
হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কৃপার সাগর বলেই তিনি জীবের কাছে করুণাভরে এসেছেন। জীবের পক্ষে বিরক্তি মূল্যবান কিন্তু বিরক্তিই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ বিরক্তি কিসের জন্য ? নূতন বস্ত্র পেলে পুরাণ বস্ত্র ত্যাগ করা যায়। মহাজন বলেন রাগ থাকলে তার সঙ্গে 'অনু' যোগ করে নেওয়া যায়। প্রাকৃতবিষয়ে বৈরাগ্য থাকলে কাজ তাড়াতাড়ি হবে। ভিজে কাঠে আগুন তাড়াতাড়ি ধরে না—দেরী হয় কিন্তু শুকনো কাঠে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বলে। ভক্তিঅগ্নি সংযোগ করতেই হবে। কিন্তু হৃদয় যদি প্রাকৃত রসে সিঞ্চিত থাকে তাহলে ভক্তিসংযোগ তাড়াতাড়ি হবে না আর বৈরাগ্য-রৌদ্রে যদি হৃদয় শুষ্ক থাকে তাহলে ভক্তি-অগ্নি সংযোগ তাড়াতাড়ি হবে। বৈরাগ্য ভাল কিন্তু অতি বৈরাগ্য ভাল নয়। দেহ গুরু, কারণ এটি বিবেক ও বৈরাগ্যের হেতু। বিবেক মানে যথার্থজ্ঞান। দেহের উৎপত্তি এবং বিনাশ দেখে বুঝা যায় যে এই দেহ নশ্বর। দেহ এই বিবেক দান করে। দেহের স্বরূপ কি ? 'বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনম্'— সত্ত্ব বলতে উৎপত্তি নিধন অর্থাৎ বিনাশ, যার উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে তাতে আসক্তি করা উচিত নয় কারণ তাতে আসক্তি হলেই ব্যথা। যা চিরকাল থাকবে এবং চিরকাল পাওয়া যাবে তাতেই আসক্তি করা দরকার। গলার হার যতই সুন্দর হোক্ কারুর কাছে যদি গচ্ছিত রাখা যায় তাতে যেমন তার আসক্তি হয় না কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে চাইলেই ফিরিয়ে দিতে হবে তেমনি এই দেহও যে কোন মুহূর্ত্তে চলে যেতে পারে। চাইবামাত্র দেওয়ার অঙ্গীকারে এই দেহ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এই দেহের উপরে আসক্তি হওয়া উচিত নয়। এই দেহের জন্মমরণে ক্লেশ তো আছেই— এমন কি যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণও ক্লেশ। সতত দুঃখই যার উত্তর ফল এমন উৎপত্তি এবং বিনাশশীল দেহ। অতএব এই দেহাসক্তি করা উচিত নয়। কাঁকড়াবিছার কামড়ের চেয়েও প্রাকৃতবিষয়ভোগ আরও যন্ত্রণাপ্রদ

ও দুঃখপ্রদ। যন্ত্রণাপ্রদ বস্তুতে কেউ আসক্তি করে না। দেহ শেখায় আমাতে আসক্ত হয়ো না। তাই দেহকে অবধূত গুরু বলেছেন।

এই দেহ আবার বিবেকেরও হেতু। অবধূত বললেন—এই দেহ (মনুষ্যদেহ) দ্বারাই তত্ত্বানি বিমৃশামি। চুরাশি লক্ষ স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহে একটি মাত্র মনুষ্যদেহ যা তত্ত্বকে অনুসন্ধান করে। তাই দেহ হল গুরু। দেহ বিবেকের হেতু। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বেশ মিষ্টি করে বলেছেন —দেহ তো গুরু বটেই, এই দেহের একাংশও গুরু। কারণ দু'তিন দিন যদি উদরে অন্ন দেওয়া না যায় তাহলে উদরও অন্নের প্রতি বিরক্তের মত হয়। বিরক্ত ইব বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বিরক্ত হয় না। কারণ খাদ্যের প্রতি উদরের লোভ আছে। উদরের কাছ থেকে অসংগ্রহ শিক্ষা করতে হবে। সাকল্যে বলা হল দেহ দ্বারা তত্ত্বকে জানবে। দেহ দ্বারা তত্ত্ব তো পাবেই আর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণাদি ভক্তিযোগও পাওয়া যাবে। রসিক ভক্ত যেমন সকল প্রকার রস উপভোগ করলেও কোন রসে লিপ্ত হন না, একমাত্র হরি-রসেই লিপ্ত হন---তেমনি জিহ্বা ঘৃতাদি সর্ব্বরসাস্বাদন করলেও কোনও রসের সঙ্গেই তার সম্পর্ক হয় না, একমাত্র তাম্বুলরসসিক্তই জিহ্বা হয়। কারণ তাকে অরুণা দেখা যায়। এর তাৎপর্য্য হল এই ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ দিয়ে অনেক রস আস্বাদন করা যায় বটে, কিন্তু জিহ্বা যেমন কোথাও লিপ্ত হয় না সেইরকম কোনও রসেই লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। একমাত্র হরিরসেই আসক্ত হতে হবে। এইটিই দেহের নিকট প্রার্থনা। এইপ্রকার উপকারী দেহ হলেও এই দেহকে নিজের (স্বীয়) এবং স্থির অর্থাৎ চিরকাল থাকবে এ বুদ্ধি করা চলবে না। দেহে পারক্যবুদ্ধি করতে হবে অর্থাৎ দেহটি পরের এই বুদ্ধি সর্ব্বদা করতে হবে। অর্থাৎ এই দেহে আসক্তিশূন্য হয়ে কাজ করতে হবে। এই দেহ শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য—এই বুদ্ধি করতে হবে। অতএব অবধূত বলছেন আমি এই দেহে আসক্তিশূন্য হয়ে বিচরণ করি।

তাহলে দেখা গেল এই দেহ বিবেক বৈরাগ্য ও ভক্তির হেতু। অতএব এই দেহ গুরু এবং শ্রেষ্ঠ গুরু। কারণ গুরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের

বিচার হল যিনি কৃষ্ণভক্তি দান করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। কিন্তু গুরু যখন তখন তো তাকে পরম আসক্তির সঙ্গে সেবা করা উচিত। এতে অসঙ্গ হয়ে বিচরণ করি অবধূত কেন বললেন? কিন্তু অবধূত ঠিকই বলেছেন। কারণ এতে ভজকট আছে তার উত্তরে অবধূত পরবর্ত্তী বাক্য বলছেন, এই দেহ-গুরু বিষয়ে আসক্তির সঙ্গে সেবাবুদ্ধি চলবে না। দেহ অনেক গুণের হলেও এতে আসক্তি করা চলবে না বরং পারক্যবুদ্ধি করতে হবে। অবধূত বলছেন—খাদ্য মিললে দেহকে দিই, না মিললে দিই না। অর্থাৎ দেহের সঙ্গে সম্পূর্ণ আসক্তিহীন আচরণ করি। গুরু দুই প্রকার। কেউ হেয় অংশের গুরু, কেউ বা উপাদেয় অংশের গুরু। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁর শ্রীললিতমাধব নাটকের প্রথমে শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদকে (যিনি পূর্ব্বে চতুঃসনের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন) অধুনা প্রেমভক্তি দান করায় সেই বিশ্বগুরু সনাতন আজ পূর্ণ হয়েছেন বলেছেন—

বক্তুং পারমহংসপদ্ধতিমিহ বক্তিং গতানাং হি যঃ।
সিদ্ধানাং ভুবনে বভূব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা॥
সাঙ্গং ভক্তিরসং রহস্যমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়-।
ন্নেকঃ সোহবততার বিশ্বগুরবে পূর্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলছেন—বিবেক ও বৈরাগ্য দান করার জন্য দেহ তো সকল প্রকার গুরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহলে তাকে তো পরমাসক্তির সঙ্গে সেবা করা উচিত। তাহলে অবধূত অসঙ্গ বললেন কেন? দেহগুরুর চরিত্র বিচিত্র। দেহগুরুকে যদি পরমাসক্তির দ্বারা সেবা করা যায় তাহলে তিনি বিবেক বৈরাগ্য কিছুই উপদেশ করবেন না, পরন্তু সংসাররূপ মহান্ধকূপে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু এই দেহকে সকলে পরমাসক্তির সঙ্গে সেবাই করে। অবধূতের পরবর্ত্তী বাক্য জীবের দেহসুখই ঘোষণা করছে। স্ত্রীগ্রহণ, পুত্র-উৎপাদন, অর্থ, বিত্ত, গৃহ, প্রজা, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য এ সকলের দ্বারা দেহসুখই পুষ্ট হয়। বিচার করলে দেখা যায় এতে দেহসুখ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু মানবদেহ তো এর জন্য নয়। কৃষ্ণভজনের জন্যই এই মানবদেহ। এই কৃষ্ণভজনযোগ্য দেহ

দেবতারাও বাঞ্ছা করে। মানুষই বিচারশীল। দেহকে যদি আদর করে সেবা করা যায় তাহলে সে উপকার তো করবেই না বরং আরও ডুবিয়ে দিয়ে যাবে। দেহকে আদর করা হয়েছে বলে সে উপকার করবে না বরং অন্তকালে নিজের দেহের অর্থাৎ আয়ুর জ্ঞানাদি চিত্তকে অবরুদ্ধ করে দেয়। এখানে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ অবরুদ্ধ ধন বললেন। ধন বলতে জ্ঞান বিবেক ইত্যাদি। সেগুলিকে আটকিয়ে দেয়। অন্তকালে তার দেহ বিবেক জ্ঞান প্রকাশ করতে পারে না। অন্তকালে আর জ্ঞানাদি প্রকাশের আশা নেই। অন্তকালে দেহই যে শুধু নষ্ট হয় তা নয় কিন্তু কর্মবীজ সৃষ্টি করে অন্য দেহ পাওয়ার মত ব্যবস্থা করে চলে যায়। ঔষধি বৃক্ষের মত—যেমন কলাগাছ। এতে সংসার প্রবাহ সঞ্জীবিত থাকে। তাই জীবের জন্মমরণের বিরাম হয় না। অনাদিকাল হতে এই জন্মমরণ চলেছে। কাজেই অবধূতের বাক্যে পাওয়া গেল দেহগুরুকে আসক্তি দিয়ে সেবা করতে নেই। বিভিন্ন গুরুর বিভিন্ন প্রকার সেবার ধারা। যেমন গ্রন্থের আরাধনা হল গ্রন্থ অনুশীলন ও আস্বাদন। শুধু ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করলেই গ্রন্থসেবা হয় না। তেমনি অনাসক্তি দ্বারা দেহের আরাধনা করতে হবে। প্রহ্লাদ বলেছেন—বীজনির্হরণং যোগঃ। কেবল প্রাণধারণমাত্র ভোজন দেহকে দিতে হবে। তাও আবার আসক্তিহীন অবস্থায় দিতে হবে। কারণ আসক্তিপূর্ব্বক দিলে তাতে রস পেয়ে যাবে। চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—এইটিই হল দেহগুরুর গুরুশুশ্রূষা। দেহগুরুকে যদি আসক্তিপূর্ব্বক সেবা করা যায় তাহলে তার কি ফল হয়—অবধূতজী পরবর্ত্তী বাক্যে বলছেন। একটু অদলবদল করে অনুরূপ বাক্য প্রহ্লাদ ভগবান নরসিংহদেবের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলেছেন। দেহাসক্ত পুরুষকে জিহ্বা রসের দিকে টানবে, পিপাসা জলের দিকে টানবে। আসক্তিবশে সেবা করলে এই পরিণাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে আছে—

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে—

জিহ্বাকে এত রসাল খাদ্য তো দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত জিহ্বা তাতে বীতস্পৃহ হয় নি। তখন জীবের অবস্থা কেমন হয় যেমন এক

গৃহস্বামীকে (সে যদি যোগী না হয়ে ভোগী হয়) তার বিভিন্ন পত্নী বিভিন্ন দিকে টানে—তাহলে তার যেমন দুর্দ্দশা, এখানে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের টানে জীবাত্মার অবস্থাও সেইরূপ হয়। কথা আছে দশেন্দ্রিয়ে করে পাপ জীবের গলায় দড়ি।

এই মনুষ্যদেহই একমাত্র অপবর্গের সাধক। মায়ার হাত হতে অব্যাহতি অর্থাৎ মুক্তি সকলকেই পেতে হবে। মুক্তির পরে স্বচ্ছন্দবিহার নিয়ে বিচার হয়েছে। যেমন কারামুক্তির পর যে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে কিন্তু কারামুক্তি সকলের প্রয়োজন। বৈষ্ণব বড় চতুর। সে বলে—প্রভু গো! আমি মুক্তি চাই না, তোমার পাদপদ্মে সাক্ষাৎ সেবা চাই। মুক্তি চাই না মানে মুক্তি চাওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। সাক্ষাৎ সেবা পেলে মুক্তি পাওয়া আপনিই হয়ে যায়। কারণ মায়ামুক্তি না হলে সেবার অধিকার হয় না। যেমন যে দশম শ্রেণীতে পড়ে তার পক্ষে সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর জ্ঞান অবশ্য থাকতেই হবে। এই মায়া আক্রমণের ফলে মহাজন বলেছেন—

নানাযোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

জীব এই দুরবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। অথচ তার প্রতিকার নেই। যতক্ষণ মায়ার কারাগারে জীব পড়ে আছে ততক্ষণই তার চাবুক। মহামায়ার এই কারাগারে জীবকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে। কারুর শ্রমহীন কারাদণ্ড নেই। কিন্তু কারুর নেই একথা বললে ভুল হবে। কারাগারের মালিকের বন্ধু যদি কারাগারে বেড়াতে আসে তাহলে যেমন তাকে দণ্ড ভোগ করতে হয় না তেমনি গোবিন্দের বন্ধু (ভক্তগণ) যদি এখানে বেড়াতে আসেন তাহলে তাঁকে আর মায়ার দণ্ড ভোগ করতে হয় না। অপবর্গের সাধক হল এই মানবদেহ। অপবর্গ শব্দের অর্থ হল অপ বৃশ্চ্যতে অর্থাৎ অপবর্গ মানে ছেদন। চুরাশি লক্ষ দেহের মধ্যে এই একটাই দেহ আছে যেটি মনুষ্যদেহ যা দিয়ে এই অপবর্গ সাধন করা যায়। কাজেই এই দেহ দিয়ে নরক সাধনের কাজ করা উচিত নয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের এইটিই আশ্রয়। ২৫-২৭

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥ ২৮
লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভাবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ
স্যাৎ ॥ ২৯

বঙ্গানুবাদ

প্রভু (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা) নিজ শক্তি মায়া দ্বারা নবদ্বারবিশিষ্ট (মুখমণ্ডলে সাতটি ও অধোদেশে দুটি) নানাবিধ পুরী অর্থাৎ মানবদেহ, বৃক্ষ, উরগ (সর্প), পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সৃষ্টি করে তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তারপর আত্মাকে বুঝতে পারে এমন বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষ দেহ অর্থাৎ মানুষ দেহ তৈরী করে সন্তুষ্ট হলেন। ২৮

ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন এই পুরুষার্থের প্রাপক অথচ অনিত্য দুর্লভ মানুষ দেহ পায় তখন যাতে আবার পশুযোনিতে যেতে না হয় এবং সর্ব্বতোভাবে মুক্তি লাভ হয়, তার জন্য তাকে তাড়াতাড়ি চেষ্টা করতে হবে ॥ ২৯

শ্রীঅবধূতজী মানুষদেহ সৃষ্টি সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ধিষণা বলছেন প্রশ্ন হচ্ছে জীবকে দেহ দেওয়ার উদ্দেশ্য কি ? পরমেশ্বর ভালই জানেন যে তাঁকে ভুলেই জীবের এই দুর্গতি। কাজেই জীবের এই দেহে এমন কিছু দিতে হবে যাতে আমার কাছে আবার তারা আসতে পারে। যত দেহ বিধাতা সৃষ্টি করলেন কোনটিই ভগবানকে জানবার উপযুক্ত নয়। একমাত্র মনুষ্যদেহই জীব লাভ করেছে যাতে গোবিন্দ বলে বন্ধন মোচন করতে পারে। তাই এই দেহ যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর অত্যন্ত আনন্দ হল। মনে হল আমার এতদিনের শ্রম সার্থক হয়েছে। মনুষ্যদেহ পাওয়ার পর আর ভাবনা নেই। এই দেহে প্রজ্ঞা খরচ করলেই ভগবানকে বুঝা যাবে।

সাধক রামপ্রসাদ বড় খেদ করে বলেছেন—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা—

আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রাকৃত কামনার চাষ হয়েছে। গৌরগোবিন্দের প্রেমের চাষ হয় নি। তাই প্রার্থনা এই মনুষ্যদেহ পাওয়ার পর আর যেন অপব্যয় না করা হয়। এই সূত্রে অবধূতজী বলছেন—এই মানুষদেহ পাওয়ার পর জীবের কর্ত্তব্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য দুটি আছে। গীতাবাক্যে ভগবান বলেছেন গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র আমিই সৃষ্টি করেছি অর্জুন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যোগীন্দ্র সেইটিই বিস্তৃতভাবে বললেন—ভগবান হতেই প্রতিটি বর্ণের প্রতিটি আশ্রমের জন্ম। ভগবানের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং চরণ থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। এইজন্য প্রত্যেকেরই ভগবানকে ভজনা করা উচিত। যোগীন্দ্র বলেছেন—যারা ভগবানের পাদপদ্ম ভজে না তারা ভ্রষ্ট হয়। ভগবানের সৃষ্ট চারটি জাতির (বর্ণের) নিজ নিজ ধর্ম পালনের নির্দ্দেশও শাস্ত্রে দেওয়া আছে। কিন্তু কথা আছে—স্বধর্ম করলেও রৌরবে পড়ি মজে। মানুষ জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি ঋণ নিয়ে জন্মায়—দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, নৃঋণ, ভূতঋণ। আমাদের এই ঋণ কিন্তু শোধ হচ্ছে না। বুদ্ধি তো আমাদের আছে কিন্তু তাকে পাকিয়ে নিতে হবে। সাপের গালে কেউ চুমু খায় না কিন্তু ছেলেকেই আদর করে। কিন্তু ছেলেও যে সাপের মতই অনিষ্টকর এই বুদ্ধিটিই পাকা হয় না। আমাদের অনিষ্টে ইষ্টবুদ্ধি হয়েছে। সৎ হলেন ব্রহ্ম বা ভগবান অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু আর অসৎ হল ভগবান ছাড়া অন্য সব বস্তু। এই সৎ অসতের যে বিবেক তারই নাম পাকা নির্ণয়। ব্রহ্মকে বলা হয়েছে ওঁ তৎ সৎ। ইনি ষড়্‌ভাব-বিকারবর্জিত। ছটি ভাববিকার হল – জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি। কিন্তু ব্রহ্মকে তো অস্তি বলা হয় —তবে সেটি কি বিকারের মধ্য পড়ে? না, তা পড়ে না। কারণ জন্মান্তরাস্তিতা

লক্ষণভাগো বিকারঃ। জন্মের পরে যে অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বের নামই অস্তি বিকার। বিকারী বস্তু মাত্রই অসৎ। শাস্ত্র পড়ে বা উপদেশ শুনে এটি কাঁচা নির্ণয় আছে। তাকে পাকা নির্ণয় করতে হবে। পাকা নির্ণয় যে আমাদের হয় নি কেমন করে বুঝা যাবে? পাকা নির্ণয় হলে অসৎ ত্যাগ করে সৎ গ্রহণ করতাম। আমাদের যে জ্ঞান সেটি পরোক্ষ। অপরোক্ষ জ্ঞান না হলে কোন কাজ হবে না। অন্ন অত্যন্ত সুস্বাদু—এ কথা মুখে বললে তো পেট ভরবে না। উদরে দিলে তবে পেট ভরবে। তেমনি ভজন নিজে করতে হবে। তা না হলে কাজ হবে না। সৎ এবং অসতের পাকা নির্ণয়ের নামই বিবেক। এই বিবেক কেবল মনুষ্যদেহেই হয়। মনুষ্যদেহই বিবেক ও বৈরাগ্যের হেতু। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাই টীকায় বললেন অপবর্গসাধক এই দেহ যেন নরক সাধনে লাগিও না। বিষয়ভোগ তো অন্য সকল দেহেই আছে। মহাজন বলেছেন—

কর ইন্দ্রিয় প্রীতি যথা শূকরে।

আরও বলা আছে নীতিবাক্যে—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভি সমানাঃ ঃ

জীব কল্যাণ চায় কিন্তু নিজের কল্যাণ খুঁজে উঠতে পারছে না। জলে ডোবা লোকের মত। জলে ডোবা লোকের যেমন উঠবার চেষ্টাটাই ডুববার কারণ তেমনি আমরাও দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করতে গিয়ে দুঃখই বাড়াচ্ছি। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে দেবর্ষিপাদ নারদ প্রাচীনবর্হিস্ রাজার কাছে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, মহারাজ জীবের দুর্গতি বড় বেশী। জীব বড় ক্লিষ্ট।

ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্।
চরন্ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা॥ —ভাঃ ৪।২৯।৩০

কুকুর যেমন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে দরজায় দরজায় ঘোরে কিন্তু অদৃষ্টে তার যতটুকু পাওনা আছে ততটুকুই পায়—কোথাও একমুঠো অন্ন আবার কোথাও লাঠির আঘাত।

শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ এই তিনরকম কর্মের ফলে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনরকম গুণের ফলে জীবের ত্রিবিধ গতি। গীতাবাক্যে ভগবান্ বললেন—-

> ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
> জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ গীতা ১৪।১৮

সত্ত্বগুণে অবস্থিত ব্যক্তি দেবলোকে গমন করেন। রজোগুণী (অর্থাৎ লোভ বশতঃ কাম্য নিষিদ্ধাদি কর্মে নিযুক্ত) ব্যক্তিগণ দুঃখপরিপূর্ণ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং জঘন্যগুণবৃত্তিতে (নিদ্রা অলস্যাদিতে) স্থিত তামসিক ব্যক্তিগণ পশুপক্ষী হীন জন্ম লাভ করে।

দেবর্ষিপাদ নারদ বললেন,—মহারাজ! জীবের অবস্থাও সেইরকম। কামনাবশে মানুষও ঘুরছে। একবার স্বর্গে যাচ্ছে পুণ্যবলে আবার পাপের ফলে অধোগতি—নরকে গমন।

> তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্।
> উপর্য্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্॥
> —ভাঃ ৪।২৯।৩১

মানুষ স্বর্গ নরক যেখানেই যাক্ তার অদৃষ্টে যতটুকু পাওনা থাকে ততটুকুই পায় প্রিয় বা অপ্রিয়। কুকুর ক্ষুধাগ্রস্ত আর মানুষ বাসনাগ্রস্ত। কথা কিন্তু একই। জীবের বাসনাই হল ক্ষুধা। এই বাসনাবশেই জীবের ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি।

> কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
> দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এর কি কোন প্রতিকার নেই? মানুষ যা প্রতিকারের ব্যবস্থা করে সেটিকে ঠিক প্রতিকার বলা চলে না—কারণ একটা দুঃখে প্রতিকার করতে গিয়ে আর একটি দুঃখ এসে উপস্থিত হয়।

ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। আধি (মানসিক যন্ত্রণা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ষড়রিপুর দংশন, এ ছাড়া দম্ভ, দর্প, অভিমান, হিংসা, বিদ্বেষ) এবং ব্যাধি শারীরিক রোগভোগ এই

দুটি নিয়ে হল আধ্যাত্মিক তাপ। আধিভৌতিক—ভূত বলতে প্রাণীকে বুঝায়। মানুষ তো বটেই, মানুষ ছাড়াও আর যত প্রাণীর কাছে আমরা দুঃখ পাই তার নাম আধিভৌতিক দুঃখ। আর দেবতার দেওয়া দুঃখ যেমন ঝড়, বজ্রপাত, বৃষ্টি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, একে বলা হয় আধিদৈবিক দুঃখ। সময় সময় মনে হয় কামাদি রিপু বুঝি দমিত হয়েছে কিন্তু তা হয় না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন—দদ্রুবৎ পুনরুৎপদ্যতে। দাদের ঘায়ের মত কামনারোগ আবার দেখা দিতে পারে। এখন প্রাচীনবর্হিস্ রাজার দেবর্ষিপাদ নারদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে চিকিৎসায় যদি রোগনিবারণী শক্তিই না থাকে তাহলে তাকে চিকিৎসা বলা হল কেন? এটি আপাততঃ বলা হল। কারণ বস্তুত এটি চিকিৎসা নয়। বস্তুত এটি প্রতিকার নয় কিন্তু প্রতিকারের মত তৃপ্তি মনে হয়। যেমন মাথার ভার কাঁধে নামিয়ে তৃপ্তি মনে হয়। বস্তুত এটি তৃপ্তি নয়। কারণ ভার তো নামে না তবে জায়গার বদল হয় মাত্র। বিষয় থাকলেই যে বন্ধন আর বিষয় না থাকলেই যে মুক্তি এমন কোন কথা নেই। তাহলে পথের ভিখারী মুক্ত পুরুষ হত।

অর্থেঽহ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতি র্ন নিবর্ত্ততে।

অর্থ অর্থাৎ বিষয় না থাকলেও কিন্তু সংসার ছাড়ে না। কারণ স্বপ্নের মিথ্যা বাঘও সত্যের মতই ব্যথা ও ভীতি দিয়ে যায়। এখন কথা হচ্ছে সত্যকার প্রতিকার কি? দেবর্ষিপাদ নারদ বললেন—ভগবান বাসুদেবে সুদৃঢ় ভক্তিযোগই হল একমাত্র প্রতিকার। এটিই সংসারবৃক্ষ ছেদনের একমাত্র উপায়। সংসারবৃক্ষকে তো ছেদন করতে হবে। সংসার বলতে স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করার নাম সংসার নয়। বিষয়তৃষ্ণার নামই সংসার। বিষয়ভোগতৃষ্ণাসূত্রে সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে জীবাত্মা যুক্ত হয়ে আছে। জলপান করবার জন্য যেমন ঘটি দরকার, তেমনি বিষয় ভোগ করবার জন্য ইন্দ্রিয় দেহ জীবাত্মা গ্রহণ করল। অবিদ্যা জীবকে এগুলি গছিয়ে দিল। কামনাবাসনার একটা তরঙ্গ মানুষের জীবনে পার হওয়া যায় না। এই দুস্তর ভবসাগরকে কর্মমার্গের দ্বারা পার হওয়ার চেষ্টাকে কুকুরের লেজ

ধরে সাগর পার হওয়ার চেষ্টার মত বলা হয়েছে। কর্মমার্গ অবলম্বন করে সংসারসাগর পার হওয়া যায় না।

যাগযজ্ঞাদিকে নামে মাত্র নৌকা বলা হয়েছে। ছেলেদের তৈরী কাগজের নৌকা দিয়ে যেমন নদী পার হওয়া যায় না, সেটি নামে নৌকা। তেমনি যজ্ঞাদি কর্মমার্গ দিয়ে দুস্তর ভবার্ণব পার হওয়া যায় না। কেমন করে যাওয়া যাবে? কারণ কর্ম হল কর্ম আর ভবসাগর পার হওয়া মানে নৈষ্কর্ম।

কর্মময় নৌকায় নৈষ্কর্মের দিকে যাওয়া যায় না। জ্ঞানের দ্বারা যে ব্রহ্মানুভূতি, যোগের দ্বারা যে পরমাত্মানুভূতি তা খুবই কষ্টকর। তাই সেটিও উপদেশ করলেন না। আদি ব্রহ্মজ্ঞানী চতুঃসন শুদ্ধা ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির উপদেশ করলেন। আদি ব্রহ্মজ্ঞানীদের ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেছে। তাদের ভগবদ্দাস হতে বাসনা হয়েছে। ভগবানের চরণকমলে ভক্তি মহারাণী বিলাসপরায়ণা। ভগবানের চরণকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মৃদুতা, কোমলতা, সৌগন্ধ, রক্তিমাভা পদ্মের মত চরণেও আছে। প্রভু রামচন্দ্রের কমল হতেও কোমল চরণ বনে বনে বিচরণ করেছে কিন্তু তাতে কোমলতার কিছু হানি হয় নি। পাদপদ্মের সৌগন্ধ হল গুণাবলী। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও এ পাদপদ্মের বর্ণনা করেছেন।

ভগবান যেন বলছেন—ব্রহ্মন্, আমার পাদপদ্ম তো বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের সরোবরে বিকশিত হয় তার সৌগন্ধ এ মর-জগতে কে নিয়ে আসবে? গন্ধ তো বহন করে গন্ধবহ। গন্ধবহ বায়ুই পাদপদ্মের সৌরভ মর্ত্ত্যের ভূমিতে এনে দেবে। এ গন্ধবহ হল শ্রুতি। ভগবানের চরণারবিন্দই হল ভক্তিমহারাণীর বিলাসস্থান। ভগবানের পাদপদ্মে যারা ভক্তিকে বহন করে তারা যত সহজে ভবসাগর উত্তীর্ণ হয় এত সহজে ব্রহ্মে (রিক্তে) যারা মতি দিয়েছে তারা পারে না। যতিগণ অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীও তেমন পারে না। এইটিই আদি ব্রহ্মজ্ঞানীদের মন্তব্য। কাজেই ভগবানের চরণারবিন্দ ত্যাগ করে যা কিছুই করা যাক্ না কেন তা ঠিক নয়। বাসুদেবে ভক্তিযোগ বিধান করলে আর সব

ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে বাসুদেবের সঙ্গে তো দেখাশোনা নেই। অতএব তাতে ভক্তিযোগ করা যাবে কেমন করে? শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করলেন—ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাই শ্রীগুরুদেবে ভক্তি করলে সংসারবন্ধন অনায়াসে ছিন্ন হবে।

সংসৃতিস্তদ্‌ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ।

—ভাঃ ৪।২৯।৩৬

ভক্তিকে কর্মবন্ধনিকৃন্তনী বলা হয়েছে। এ ভক্তি কোথায় বর্ত্তমান। অচ্যুতকথাকে আশ্রয় করে এই ভক্তি বর্ত্তমান থাকে। এ অচ্যুতকথা কোথায় পাওয়া যায়? দেবর্ষিপাদ নারদ বলেছেন—সাধুমুখোচ্চারিত অচ্যুতকথা নিরন্তর শুনলে অবিতৃপ্তভাবে এবং গাঢ় কানের দ্বারা শুনলে তাকে অশন (ক্ষুধা), তৃট্ (তৃষ্ণা), ভয় শোক মোহ কিছু স্পর্শ করে না। অবিতৃপ্তভাবে অর্থাৎ এ ক্ষুধার তৃপ্তি কখনও আসবে না। যত খাওয়া যাবে ততই ক্ষুধা বৃদ্ধি হবে। গাঢ় কানের অর্থ কি? যার কানে কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কোন বিষয়বার্ত্তা প্রবেশ করে না। সংসারদুঃখ বলতে এই পাঁচটিকেই বুঝায়—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়. শোক, মোহ। এ সবগুলিই মায়ার বিকার। দেবর্ষিপাদ নারদ এই পাঁচটির নাম করে সমগ্র মায়াকে বুঝালেন। মায়া নাম করে বললেন না। দেবর্ষিপাদের এই ব্যবস্থা মানুষদেহধারী জীবই একমাত্র গ্রহণ করতে পারে। চুরাশি লক্ষ জন্মে আর কোন দেহ নেই যা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম। সংসারসাগর পার হবার এই একটাই দেহ। বৈকুণ্ঠে যাবার সিঁড়ি হল এই মানবদেহ। অতএব অবধূতজীর উপদেশ এই দেহ দিয়ে যেন আমরা নরকে যাবার সিঁড়ি তৈরী না করি। এ দেহের দোষ—এটি নশ্বর কিন্তু আর একটি গুণও আছে—এটি অর্থদ অর্থাৎ পরমার্থের দাতা—পরমার্থ দান করে। মনুষ্যদেহ পরশমণির মত। অন্য যে কোন মণি মূল্যবান বটে কিন্তু সে মূল্যবান মণি হাতেই থাকে কিন্তু পরশমণি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সোনা প্রসব করে। তাই অবধূতের উপদেশ, যতক্ষণ দেহ-পরশমণি পাওয়া গেছে ততক্ষণ তা দিয়ে সোনা প্রসব

করিয়ে নিতে হবে। "যতক্ষণ প্রাণ দেহে থাক হা গুরু গৌরাঙ্গ বলে ডাক।" বয়স হলে হরিভজন করলেই হবে—এ কথা যদি কেউ বলে তার উত্তরে অবধূত বললেন—'তূর্ণং যতেত।' এই দেহ পাওয়া গেছে ঠিক কিন্তু কতক্ষণ আছে ঠিক নেই। তাই তাড়াতাড়ি হরিভজন সেরে নিতে হবে। বাল্যে যৌবনেই হরিভজন করে নিতে হবে। বিষয়ভোগ অন্য সব দেহে পাওয়া যাবে কিন্তু হরিভজন মনুষ্য দেহ ছাড়া অন্য দেহে হবে না।

অবধূতের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশসার এই বাক্য—আর একটি উপদেশসার বাক্য আছে ভগবানের নিজের—যেটি উদ্ধবজীকে বলেছেন। একটি ভগবানের, অপরটি ভক্তের। কাজেই এটি যে খাঁটি বস্তু তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রকৃত কথা হল একটি ছেলেকে যদি একেবারেই দশম শ্রেণীতে উঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে দশম শ্রেণীতে পড়ে বটে কিন্তু বিদ্যা তার সপ্তম শ্রেণীরও নয়। প্রথমেই উঁচুতে উঠিয়ে দিলে কেউ বড় হতে পারে না। কারণ তার সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। ভিত দৃঢ় না হলে যেমন উচ্চ সৌধ দাঁড়াতে পারে না তেমনি এই উপদেশসার ভিত না তৈরী হলে গৌর গোবিন্দের ভজনসৌধ দাঁড়াতে পারে না। আমরা তো উপদেশ বুঝি না তাই দালান দিয়ে লাভ নেই। অবধূত বললেন এই দেহটি মিথ্যা কারণ মায়াগুণ দিয়ে তৈরী। মায়া সৃষ্টি করে। যেমন ধ্রুব যখন যুদ্ধ করছিলেন তখন যক্ষের মায়া কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেছিল। ধ্রুব শ্রীহরিকে স্মরণ করলেন—কারণ হরিস্মৃতিই সর্ব্ববিপদ দূর করে। 'হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্‌বিমোক্ষণম্।' মায়াকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'যথা ভাসো যথা তমঃ।' চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ভগবান ব্রহ্মাকে এই উপদেশ করলেন। মায়া অন্ধকারের কাজ করে। আবরণশক্তি দিয়ে সত্যবস্তুকে ঢেকে রাখে আর বিক্ষেপশক্তি দিয়ে মিথ্যাবস্তুকে দেখায়। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে একটি সত্যই পরিবেশিত হয়েছে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" যথা ভাসঃ যোগমায়া পক্ষে আর

যথা তমঃ মহামায়া পক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেছেন—ভাস হল সত্ত্বগুণ মহামায়ার বিদ্যাবৃত্তি আর তম মানে রজঃ ও তমঃ মহামায়ার প্রকৃতি ও অবিদ্যাবৃত্তি। এই সত্ত্বগুণের বিদ্যাবৃত্তি জ্ঞানদায়িনী এবং পরমামুক্তির হেতু। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা আছে ‘সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।’ বিদ্যাবৃত্তি হতে জ্ঞানের জন্ম। মায়ার যে আবরণ কাজ সেটি হল অস্তিকে নাস্তি করার মত। মায়ার কাজও তাই। সত্যবস্তু যে ভগবান তাকে দেখতে দেয় না। তাই ভগবান বললেন—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাং।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥

—ভাঃ ১১।২৯।২২

জীবদেহ মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্মশীল আর ভগবান হলেন অমৃত। জীবদেহ হল মিথ্যা অর্থাৎ নশ্বর আর ভগবান হলেন সত্যস্বরূপ। সত্যস্বরূপের লক্ষণ হল ত্রিকালাবাধিত্বম্। ত্রিকালে যার ব্যভিচার হয় না অর্থাৎ বিনাশ পায় না তাকে বলা হয় সত্য। দেহ হল ব্যভিচারধর্মী। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়দশা, বৃদ্ধ অবস্থা—এই নানা অবস্থার বিপরিণাম—এর কোনটিই সত্য নয়। আচার্য্য বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের প্রথমেই মঙ্গলাচরণ করলেন—সত্যং পরং ধীমহি। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে এই সত্যস্বরূপেরই প্রণাম বন্দনা করেছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বলেছেন—‘সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দঃ তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ।’ ‘সত্যং পরং ধীমহি’—এই বাক্যে বেদব্যাস গোবিন্দ নাম করলেন না। কারণ এর আগেই টাটকা বেদান্ত বলে এসেছেন—কাজেই সত্যস্বরূপ দিয়ে তাকেই বুঝালেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যিনি সত্যবস্তুর ধ্যান করেন তিনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। ব্রহ্মা বলেছেন—‘ন ভারতী মেহঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে’—আমার বাক্য কখনও মিথ্যা বলে না। আমার ইন্দ্রিয় কখনও অসৎপথে ধাবিত হয় না। মর্ত্ত্য এবং মিথ্যা এই দেহ দ্বারা যদি সত্যস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ ভগবানকে রোজগার করে নিতে পারা যায়

তাহলে তার মত বুদ্ধিমান আর কে আছে? একটি কাণাকড়ি দিয়ে যে ব্যক্তি মোহর চিন্তামণি রোজগার করে নিতে পারে তারই তো বুদ্ধিমত্তা। তাই ভগবান এই কথা বললেন। এগুলি হল ভিত্তিশ্লোক। উপদেশসার বাণী। কিন্তু এতে আমাদের আঠা হয় নি। এখানে অবধূত বললেন—তূর্ণং যতেত। কেন? তাড়াতাড়ি চেষ্টা করতে হবে কেন? দেরী করলে কি ক্ষতি? দেরী করলে ক্ষতি আছে কারণ দেহ হল অনিত্য। পরমকাল দেহকে আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন চাইবামাত্র ফিরিয়ে দেবার অঙ্গীকারে। কাজেই এ দেহের কোন স্থিরতা নেই। প্রহ্লাদজী বললেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ। —ভাঃ ৭।৬।১

কুমার কাল অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়স থেকেই হরিভজন আরম্ভ করতে হবে। বিষয়ভোগে মনোনিবেশ করলে আর হরিভজন হয় না। মহারাজ নিমি বলেছেন—

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ —ভাঃ ১১।২।২৯

মানুষদেহ পাওয়ার পর সেটিকে কাজে লাগাতে হবে। চুরাশি লক্ষ দেহে যে কাজ হয় নি এই মনুষ্যদেহে সেই কাজ করতে হবে। এই মনুষ্যদেহের দ্বারা সাধনার বলে গৌরগোবিন্দ পাওয়া যায়। এই গৌরগোবিন্দ লাভই-মনুষ্যদেহের বিচক্ষণতা। শাস্ত্র বড় রূঢ়। শাস্ত্রের খাঁটি চেহারা এইটাই। বিষয়ভোগ তো সব দেহেই আছে। কিন্তু গৌরগোবিন্দ পাওয়ার জন্য মনুষ্যদেহে বিচার করতে হবে। বিচার করা হলে মনকে বুঝাতে হবে। জগতে কত রকমের বিচার আছে কিন্তু গৌরগোবিন্দ পাওয়ার জন্য মনুষ্যদেহে বিচার করতে হবে। শাশ্বতসুখধামে কিন্তু একমাত্র মানুষই যেতে পারে। সেখানে যাওয়ার আর কোন দেহের সামর্থ্য নেই। বিচার যদি কিছু করতে হয় তো এই বিচারই করতে হবে। মনকে না বুঝান পর্যন্ত কোন কাজ হবে না। পরিপূর্ণ বিষয়ভোগ করে তার অবসরে হরিনাম করলে তার দ্বারা কোন কাজ হবে না। আমরা বিষয় ভোগ করে যখন

উচ্ছিষ্ট দেহনৈবেদ্য ভগবানকে নিবেদন করতে যাই তখন তিনি হাসেন। তিনি বলেন—অনাঘ্রাত পুষ্প, অনাস্বাদিত ফল গোবিন্দের ভোগে লাগে আর তুই উচ্ছিষ্ট দেহ দান করতে এসেছিস্। তবে ভগবান তো অত্যন্ত কৃপালু। তাই তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন না। বলেন—শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা কর পুতনার দেওয়া বিষ যখন গ্রহণ করেছি তখন তো কাউকে ফেরাতে পারি না। উচ্ছিষ্ট দেহ দিচ্ছিস্ তাই দে। প্রহ্লাদ বললেন,—বিষয়ভোগের পর আর হরিভজন হয়ে উঠবে না। কারণ চুরাশি লক্ষ দেহের বিষয়ভোগের সংস্কার মানবদেহে আসে কাজেই তার হাত হতে এড়ান যায় না। এ সংস্কার ছাড়া যায় না কিছুতেই। মনুষ্যদেহের কাজ হল পুরানো এই চুরাশি লক্ষ দেহের সংস্কার ভুলে নূতন সংস্কার গৌরগোবিন্দ বলা অভ্যাস করতে হবে। এটি মনুষ্যদেহেরই নূতন সংস্কার। এ সংস্কার তৈরী করতে একমাত্র মানুষই সক্ষম। তার জন্যই সাধু গুরু বৈষ্ণব শাস্ত্রের উপদেশ প্রয়োজন। মানুষ এই গৌরগোবিন্দ বলা রূপ নূতন সংস্কার করতে পারে বলে মানুষকে দেবতারা পর্য্যন্ত ভয় করেন; ধ্রুব পাঁচ বছরের বালক। তার তপস্যার বিঘ্ন ঘটাবার জন্য ইন্দ্র অনেক চেষ্টা করেছেন, অপ্সরা পাঠিয়েছেন কিন্তু পরাজিত হয়েছেন। মানুষকে দেবতারাও ভয় করে কারণ মায়ার কুহকে পড়ে সৃষ্টি যে ধারায় চলেছে তার ব্যতিক্রম একমাত্র মানুষই করতে পারে। জীবের অনাদি জন্মমরণের ক্লেশে মহামায়ার কিঙ্করত্ব এইটিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানুষই তার জীবনে মহৎকৃপার জোগাড় করে এই অনাদি জন্মমৃত্যুর হাত হতে রেহাই পেতে পারে। চুরাশি লক্ষ দেহের বিষয়ভোগের সংস্কার জীবকে নিরন্তর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চুরাশি লক্ষ দেহের স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের সংস্কার মানুষদেহ পাবার পর ওগুলো ছাড়তে হবে—তবেই ভজনের সংস্কার গৌরগোবিন্দ বলার সংস্কার মানুষদেহে ফুটবে। মানবদেহ পাবার পরও পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার তাড়া দেয়। চুরাশি লক্ষ দেহের বিষয়ভোগের কুফল রস মানুষদেহে বসে গেলে আর হরিতে মন দিতে পারা যাবে না। প্রহ্লাদ

বলেছেন—

কথং প্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়াঃ সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ্চ মন্ত্রান্।
সুহৃৎসু চ স্নেহসিতঃ শিশূনাং কলাক্ষরাণামনুরক্তচিত্তঃ ॥
—ভাঃ ৭।৬।১১

স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনের মিষ্টি কথায় মন মজে গেলে মন আর ভগবানে দেওয়া যাবে না।

কেউ হাটে গিয়ে প্রধান যা চাল তাই না নিয়ে যদি অন্য সব কিনে বাড়ী ফেরে তাহলে তার যেমন হাট করাই বৃথা তেমনি এই মহামায়ার হাটে আমাদের বাজার করে ফিরতে হবে। সত্যিকার পেটভরার জিনিষ কিনতে হবে। সত্যিকার পেটভরার জিনিষ হল একমাত্র হরিভজন। তাই আগে হরিভজন সেরে নিতে হবে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হরিভজন করতে হবে। ১০৮ শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের বাণী—

যে ভিখারী ভিক্ষায় বের হয় সন্ধ্যাকালে
সে ভিখারীর কি ভিক্ষা মেলে ?

কিন্তু এই পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারে সন্ধ্যাকালে ভিক্ষায় বের হলেও লাভ আছে। পতিত আমরা সবাই কিন্তু বোধ নেই তাই পতিতপাবনের কৃপা হয় না। পতিত বলে যখনই বোধ হবে তখনই দয়া হবে। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের বাণী—

মুখে পতিত পতিত সবাই বলে
কুরঙ্গ মাতঙ্গে চলে—

পতিতকে উদ্ধার করেন বলেই তাঁর নাম পতিতপাবন। পতিতপাবনের দৃষ্টি থাকে নীচের দিকে। অভিমানের মাচায় বসে থাকলে তাঁর দেখা মিলবে না। তাই মহাজন বললেন—

পতিতপাবন নাম শুনেছ তাতে তোমার ভরসা কিসে।
তুমি যে ভাই অভিমানের মঞ্চোপরি আছ বসে ॥

হরিভজন করবার উপদেশ তাই শাস্ত্র সর্ব্বাগ্রে দিলেন। শাস্ত্র কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। প্রতারণার বাক্য বলেন না। জীবনের একটি

নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নেই—

> নিঃশ্বাসে ন হি বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি।
> আবাল্যাদেব জপ্তব্যং হরের্নামৈব কেবলম্ ॥

নিঃশ্বাস তো বায়ু। বায়ুর স্বভাব চঞ্চল।

> চঞ্চলং হি মন কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
> তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ —গীতা ৬।৩৪

চঞ্চল বালককে যেমন বিশ্বাস করে ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না তেমনি নিঃশ্বাস বায়ুর ওপর নির্ভর করে পরকাল নষ্ট করার কাজ করা ঠিক নয়। যতক্ষণ প্রাণ দেহে আছে ততক্ষণ গৌরগোবিন্দ বলতে হবে। অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহ পরমার্থের দাতা—অর্থদ। পরশমণির মত। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে স্বর্ণ প্রসব করে। অবধূত বললেন নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য মানুষকে চেষ্টা করতে হবে। নিঃশ্রেয়স পদে প্রেমভক্তিকে ধরা হয়েছে। বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ। বিষয়ভোগ তো সর্ব্বদেহে আছে। চুরাশি লক্ষ দেহে বিষয়ভোগ হবে। নিঃশ্বাস হল পরমায়ুর অংশ। কাজেই পরমায়ুর প্রতিটি অংশ পরমার্থের জন্য খরচ করতে হবে। শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ সূত-মুনিকে বলেছেন, 'সূত, আমাদের এমন কথা বল যাতে কৃষ্ণকথাই আছে, অন্য কথা নেই।' কারণ কৃষ্ণকথা না শুনে অন্য কথা শুনে যদি জীবন যায় তাহলে আয়ুর অসদ্ব্যয় হবে। তাই আয়ুর প্রতিটি অংশ শ্রীহরির কথায় খরচ হওয়া উচিত। পরমার্থ উপার্জ্জনেই এই দেহকে লাগান উচিত। ভক্তপ্রবর অবধূতজীর উপদেশসার এই বাক্য।

যদুমহারাজের কাছে অবধূত চব্বিশজন গুরুর প্রসঙ্গ করেছেন। যদুমহারাজ যতগুলি প্রশ্ন করেছেন তার মধ্যে উত্তম প্রশ্ন হল—

> জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা
> ন তপ্যসেঽগ্নিনা যুক্তো গঙ্গাম্ভস্থ ইব দ্বিপঃ ॥
>
> —ভাঃ ১১।৭।২৯

সংসার অরণ্যে কামলোভের অগ্নি নিরন্তর জ্বলছে। এ দহনের বিরাম নেই। দহ্যমান্—বর্ত্তমানে শানচ্ প্রত্যয় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দহন নিরন্তর

চলছে। যদুমহারাজ বলছেন—'এ সংসার অরণ্যে কামলোভের দাবানলে যারা প্রজ্জলিত হয় তাদের চেহারা তো আমি জানি। কিন্তু তার মধ্যে বাস করেও আপনাকে তো সন্তপ্ত দেখছি না। গঙ্গায় অবগাহন করে হস্তী যেমন সুস্থ থাকে আপনাকেও তো তেমনি দেখাচ্ছে। আপনি কোন্ জ্ঞানগঙ্গায় অবগাহন করেছেন? যাতে আপনার চিত্ত এমন শান্ত আছে —এ জ্ঞান আপনি কোথা হতে পেলেন?' তার উত্তরে অবধূত বলছেন— 'আমার এই জ্ঞানগঙ্গার গোমুখী হল চব্বিশটি। চব্বিশজন গুরুর কাছে আমি যে শিক্ষালাভ করেছি তার ফলেই আমি দহ্যমান সংসারেও সুস্থ থাকতে পেরেছি। চব্বিশজন গুরুর কাছে অল্প অল্প জ্ঞান আহরণ করে আমার ঝুলি ভরেছি। এ কানে মন্ত্র দেওয়া গুরু নয়। বুদ্ধ্যুপাশ্রিত গুরু সকলেই। এদের মধ্যে শেষ গুরু হলেন নিজের দেহ। দেহ বিবেক ও বৈরাগ্য শিক্ষা দেয়। নানা অবস্থায় পড়ে রোগে শোকে যন্ত্রণায় দেহই দেহের আসক্তি ত্যাগে শিক্ষা দেয়। তত্ত্বজ্ঞান আর কিছুতে হয় না। অথচ তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। শ্রুতি বললেন—

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

তাঁকে জানলেই অতিমৃত্যু অর্থাৎ মুক্তিকে লাভ করা যায়—এ ছাড়া মুক্তিলাভের অন্য কোন পথ নেই।

প্রতিটি জীবই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি চাইছে। ঘরের বিজলী বাতির বিভিন্ন বোতাম টিপে যেমন বিভিন্ন আলো জ্বালান হয় আমাদের দুঃখের তেমনি কত বোতাম আছে। প্রতিটি জীবেরই দুঃখ আছে। তার মধ্যে মানুষ আমরা স্ফুটবাক্, কাজেই দুঃখের কথা বলতে পারি। এটি হল উপেয়। এর জন্য উপায় খুঁজতে হবে। উদরপূরণের তৃপ্তি ও ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যেমন একটাই উপায়, দুটি নয়—সেটি হল অন্নগ্রহণ তেমনি শুধু আনন্দভোজন করলেই দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি হবে। সূর্য্য উদয়ে যেমন অন্ধকারনাশ ও বস্তুর প্রকাশ দুইই হয় তেমনি আনন্দের ভোজনে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও সুখানুভূতি দুইই হবে। আনন্দের ভোজন মানে আনন্দের অনুভূতি।

তত্ত্ব হলেন ভগবান, সেই ভগবানকে জানতে হবে। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মাও তত্ত্ব। কারণ সূত মুনি বলেছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ —ভাঃ ১।২।১১

কিন্তু ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তত্ত্ব অসম্পূর্ণ। অন্ধ ব্যক্তি যেমন হাতি দেখে তার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের পরিচয় দেয় কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না। তাদের পরিচয় মিথ্যা নয় তবে আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। ব্রহ্ম পরমাত্মা তত্ত্ব সম্বন্ধেও একই কথা। তাঁদের তত্ত্বও মিথ্যা নয় তবে সম্পূর্ণ নয়, অসম্পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তত্ত্বের চরম পরম সীমা। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক হয় তার পরিবার॥

এখানে ব্রহ্মজ্ঞানাদি—'আদি' পদের দ্বারা পরমাত্মাজ্ঞানকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ কৃষ্ণজ্ঞানের অন্তর্গত হল ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান। যার ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে তার ব্রহ্মজ্ঞান পরমাত্মজ্ঞান হবেই। কিন্তু যার ব্রহ্ম-পরমাত্মজ্ঞান হয়েছে তার যে ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে তা বলা যায় না। পরমানন্দ ভোজন করতে হবে—যে আনন্দ গুণময়ী মায়ার জগতে তৈরী হয় না। সত্ত্বগুণ হতে জাত যে আনন্দ তা হল এ জগতের উৎকৃষ্ট আনন্দ। সচ্চিদানন্দ আনন্দই হল পরমানন্দ। এ আনন্দ মায়ার জগতে তৈরী হয় না। এখন কথা হচ্ছে এ অপ্রাকৃত আনন্দ মায়ার জগতে কেমন করে আসবে? মায়ের স্বাভাবিক বৃত্তি যেমন সন্তানকে কখনও প্রতারণা করেন না—শ্রুতিমাতাও তেমনি জীব সন্তানকে কোন প্রতারণাবাক্য বলেন না। বেদমাতা বলেছেন, পরমানন্দ পেতে হবে। পংক্তিতে যদি অত্যন্ত ক্ষুধা নিয়ে বসা যায় তাহলে কোন দয়ালু ব্যক্তি যেমন তার ক্ষুধার আগ্রহ দেখে খাদ্য পরিবেশন করেন এখানেও তেমনি পরমানন্দ ভোজনের ক্ষুধা নিয়ে পংক্তিতে বসতে হবে তাহলে কোন মহাজন দয়াপরবশ হয়ে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ভোজন

সামগ্রী অতি সত্বর এনে দেবেন ক্ষুধার আগ্রহ দেখে। এইরকম পরমানন্দের পরিবেশন চিরকাল চলছে। দয়ালু ব্যক্তিই দান করতে পারেন—অর্থাৎ যিনি নিজে জীবনে দয়া পেয়েছেন তিনিই অপরকে দয়া করতে পারেন।

দুইপ্রকার সিদ্ধপুরুষ আছেন—(১) সাধনসিদ্ধ ও (২) কৃপাসিদ্ধ। সাধনসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সাধনলব্ধ অল্প মূলধন অকাতরে বিতরণ করতে পারেন না। কারণ তাঁর পরিশ্রমের রোজগার দিতে পারেন না। কিন্তু কৃপাসিদ্ধ—কৃপায় প্রচুর পেয়েছেন তাই তিনি দিতে পারেন। কথা আছে মধু পান না করা পর্য্যন্ত ভ্রমর গুনগুন করে কিন্তু মধুপান করবার পর সে চুপ করে যায়। যতক্ষণ তত্ত্ব উপলব্ধি হয় নি ততক্ষণ 'শাস্ত্রবিদাং কলকলঃ।' সাধকের সাধন প্রচেষ্টা ততক্ষণ যতক্ষণ ভগবৎপাদপদ্মমধু পান না করা হয়। কিন্তু এটি একদেশী বাক্য হল। কারণ তাহলে কি বুঝতে হবে যাঁরা গুনগুন করেন তাঁরা কি পাদপদ্মমধু পান করেন নি? তাহলে নারদ, ব্যাস, শুক এঁরা পাদপদ্মমধুপায়ীদের মধ্যে থেকে বাদ পড়ে যান কারণ তাঁরা তো গুনগুন করেন। অথচ এঁরা মধুপান করেন নি তাও তো বলা চলে না। তাঁরা পাদপদ্মমধুপানে বিভোর হয়ে আছেন। মধুপানে বিভোর যিনি তাঁর অবস্থা মূকাস্বাদনবৎ। আস্বাদনে ভরপূর হয়ে চুপ করে যান। তখন ভাবে বুঝান, ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। ভগবানের পাদপদ্মমধুপায়ী ভৃঙ্গ বড় একটা এ জগতে লোকসমাজে আসেন না। তাঁরা বোবা হয়ে যান। কারণ তখন তাঁর এমন ভাষা নেই যা দিয়ে বুঝান যেতে পারে। যেমন সমুদ্র কেমন ভাষা দিয়ে বুঝান যায় না। শাস্ত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছেন—

মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে
পরমানন্দমাধবম্॥

আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ

বললেন—

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

কৃষ্ণ মূককে বাচাল করেছেন—এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রায় পাওয়া যায় না কিন্তু গৌরসুন্দর শিবানন্দ সেনের সাত বছরের মূক বালক পুরীদাসের মুখে কথা ফুটিয়েছেন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এই পুরীদাসই কবি কর্ণপুর গোস্বামিপাদ। তাঁর রচিত শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, শ্রীআনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক বিখ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পুরীদাসের মুখে পুরে দিয়ে কিছুক্ষণ চুষতে দিলেন, পরে সরিয়ে নিলেন। বেশীক্ষণ দিলেন না কেন—বললেন পেট ভরে গিয়েছে আর বেশী হলে রাখতে পারবে না। আদেশ করলেন—'কৃষ্ণ বল।' পুরীদাস কিন্তু কৃষ্ণ বলে না। মহাপ্রভু যেন লজ্জিত হলেন। চিন্তা হল স্থাবর জঙ্গমকে যিনি কৃষ্ণ বলিয়েছেন তিনি এই মানুষের ছেলেকে কৃষ্ণ বলাতে পারলেন না—এতেই লজ্জা। স্বরূপদামোদরজী তখন বুঝিয়ে দিলেন কৃষ্ণ নামটি গুরুমুখে মন্ত্রের মত গ্রহণ করায় সে উচ্চারণ করছে না। মহাপ্রভু বললেন—'তা হতে পারে কিন্তু কৃষ্ণ না বলুক কিছু তো বলবে।' স্বরূপজী বললেন—'হ্যাঁ কিছু তো বলবে নিশ্চয়ই।' পুরীদাস কৃষ্ণ না বলে অন্যভাবে কৃষ্ণগুণ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

কৃষ্ণ না বলে হরি বললেন। কথা একই। কৃষ্ণকথাই গোপীদের কানের ভূষণ, কৃষ্ণরূপদর্শনই তাদের নয়নের অঞ্জন। চোখকে সাজাতে হবে তো। কৃষ্ণ দর্শন দিয়ে নয়ন সাজাতে হবে। আর কিছু দিয়ে তো গোপীদের নয়ন সাজে না। গৌর মূককে বাচাল করেছেন। কৃষ্ণ কিন্তু তা করেন নি। পুরীদাসের বাক্য শ্রোতার কানের ভূষণ তাই তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছে কর্ণপুর। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে বাক্য দান

করেছেন। তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃই চৈতন্যচরিতমহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করলেন আর কৃষ্ণলীলার গ্রন্থ লিখলেন আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ। ১০৮ শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের বাণী—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূককে বাচাল করার প্রসঙ্গে আরও কিছু ইঙ্গিত করেছেন। যারা আনন্দ পায় তারা বোবা হয়ে যায়। মহাপ্রভুর কৃপা বলবতী হয়ে সেই বোবার দলের মুখেও কথা ফুটিয়েছেন তাই ঠাকুর পরমহংসদেব কথাটি আর একটু ঘুরিয়ে বললেন, এমন অনেক ভ্রমর আছে যারা মধুপান করেও গুনগুন করে।

ছয়গোস্বামী গৌর প্রিয় পরিকর ব্রজের কৃষ্ণলীলার প্রত্যক্ষদর্শী মঞ্জরীগণ। গৌরগণোদ্দেশদীপিকাগ্রন্থে কবি কর্ণপুর এই কথাই বলেছেন—এরাই তারা, তারাই এরা। স্বরূপদামোদরজী ব্রজের ললিতাজী এবং বিশাখা সখী হলেন শ্রীপাদ রামানন্দ রায়। কুঞ্জে রাধাগোবিন্দের রহোলীলার সাক্ষী মঞ্জরীগণ। রহোলীলায় প্রবিষ্ট রাধামাধবের কাছ হতে সখীরা বিদায় নিয়ে চলে যায় তখন মঞ্জরীর দল আসে। দূরে গেল সখীগণ কুঞ্জে মঞ্জরী এল। সখীরাও সব লীলার সাক্ষী নন, মঞ্জরীগণই সাক্ষী। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান থেকে আরম্ভ করে সব ভগবানেই ভগবত্তা আছে কিন্তু ক্ষীরোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, কারণার্ণবশায়ী, বৈকুণ্ঠনাথ, গোলোকাধীশ শ্রীগোবিন্দ তার মধ্যে আবার রাধাপ্রেয়ান্ শ্রীগোবিন্দের ভগবত্তার চরম নিগূঢ় রূপের উপলব্ধি করেন একমাত্র মঞ্জরীগণ। কিন্তু তাঁরা বোবার দল। ভাষা দিয়ে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন না। ব্রহ্মোপলব্ধি হলেই যদি মূক হয়ে যায় তাহলে এ আস্বাদে মূক হবে এ আর বেশী কথা কি? রাধাগোবিন্দের এ লীলার অনুভূতি সখীগণেরও বেদ্য নয়। মহাপ্রভুর কৃপা এই বোবার দলকে বাচাল করেছে। এটি মহাপ্রভুর অনর্পিত করুণার প্রকাশ। বোবার দলকে (মঞ্জরীগণকে) বাচাল করে ছয়গোস্বামী করে প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের দিয়ে রাধাগোবিন্দের লীলার তিন লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। তাঁদের দ্বারে এ

গ্রন্থরাজি যদি প্রকাশ না হত তাহলে কে বা জানত? ভগবানের এই নাম, রূপ, গুণ, লীলা আস্বাদনই হল পরমানন্দের ভোজন। তাহলে দেখা গেল ছয়গোস্বামী নিজেরা ভগবানের পাদপদ্মমধু যথেষ্ট পান করেও গুনগুন করেছেন। এটি মহাপ্রভুর অনর্পিত করুণায় সম্ভব হয়েছে। মহাপ্রভু বুঝেছিলেন এরা না বললে খাঁটি লীলাকথা কেউ জানবে না। মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপায় এই বোবার দল কথা বললেন। তাঁরই কৃপায় এঁরা লীলা পরিবেশনের সামর্থ্য পেয়েছেন। চিত্ত নিরাশ হয়ে পড়ে এই কথা ভেবে প্রকৃতির রাজ্যে থেকে গোলোকের পরমানন্দ কেমন করে পাব? ক্ষুধা নিয়ে পংক্তিতে বসতে পারলে বিশেষ কৃপায় আনন্দ পরিবেশন আপনিই হবে। ভগবানের আদেশে মহাজন এসে পরমানন্দ পরিবেশন করে যান। খাদ্যের অভাব নেই কিন্তু অভাব হল আমাদের ক্ষুধার। আমাদের লোভের অভাব। পরমানন্দ ভোজন যত করা যাবে ততই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি হবে।

দেহ সম্বন্ধে অবধূতজী বললেন—দেহ হলেন গুরু। কারণ নশ্বরতা দোষ দেখিয়ে দেয়। দেহের একটি দোষ—এটি হল নশ্বর। তাই দেহ পাওয়া মাত্র এটিকে কাজে লাগাতে হবে। মহাজনবাক্য আছে—

“যা গেছে তা গেছে ভাই।
যা আছে সামাল তাই॥
এখনও ফিরে বোস—কে তোরে হারায়”

পিছনে যতদিন নিষ্ফল চলে গিয়েছে যাক্। আজ এই ক্ষণ থেকেই গৌরগোবিন্দ বলার অভ্যাস করতে হবে। আর একটি মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয় করা চলবে না। আজ থেকে বললেও কেউ হারাতে পারবে না। ২৮-২৯

এবং সংজাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ ॥ ৩০
ন হ্যেকস্মাদ্‌গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলং।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ ॥

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ।
বন্দিতঃ স্বর্চ্চিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্ ॥ ৩২
অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পুর্ব্বেষাং নঃ সপূর্ব্বজঃ।
সর্ব্বসঙ্গবিনির্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে ভগবতুদ্ধবসংবাদে অবধূতগীতং নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ

এইভাবে অবধূতজী বহু গুরুর কাছে শিক্ষার কথা উল্লেখ করে যদুমহারাজের পূর্ব্বের প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বলছেন—যদুমহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি সমর্থ, পণ্ডিত ও নিপুণ—সেই বিষয়ে ব্রাহ্মণ অবধূত বলছেন—মহারাজ! এইভাবে বহু গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়ে বৈরাগ্যলাভ করে বিজ্ঞানালোকবিশিষ্ট আত্মাতে অবস্থান করে মুক্ত ও অহংকারশূন্য হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছি। ৩০

হে রাজন্! যদি প্রশ্ন করেন বহু গুরু আশ্রয় করলেন কেন? কারণ শ্বেতকেতু, ভৃগু প্রভৃতি কেউই বহু গুরু আশ্রয় করেন নি—তার উত্তরে একটি কারণ বলি শুনুন মহারাজ, একজন গুরুর কাছে জ্ঞান গ্রহণ করলে সেটি সুস্থির হয় না। কারণ শাস্ত্রে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়রূপে নিরূপিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা তাঁকে নানাভাবে নির্ণয় করেছেন। ৩১

শ্রীভগবান বললেন—গভীরবুদ্ধি ব্রাহ্মণ যদুরাজকে এইভাবে বলবার

পর রাজা তাঁকে বিশেষভাবে অর্চ্চনা ও বন্দনা করলেন। তারপর ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে চলে গেলেন। ৩২

হে উদ্ধব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যদুমহারাজ এই অবধূতবাক্য শ্রবণ করে সর্ব্বসঙ্গ থেকে নিজকে মুক্ত করে সমচিত্ত হয়েছিলেন। ৩৩

ইতি একাদশে নবম অধ্যায়॥

শ্রীঅবধূতজী যদুমহারাজকে বলছেন—বহু গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করে মহারাজ আমি জীবনে বৈরাগ্যলাভ করেছি এবং তার ফলে মুক্তসঙ্গ ও অহংকারশূন্য হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করি। বিজ্ঞান মানেই অপরোক্ষ অনুভূতি। তাতেই আলোকদৃষ্টি করতে হবে। কেমন গুরু করতে হবে প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র মহারাজ নিমিকে বলেছেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

—ভাঃ ১১।৩।২১

শ্রীগুরুদেবকে শান্তচিত্ত হতে হবে—কারণ শান্ত না হলে শিষ্যের অপরাধ ক্ষমা করতে পারবেন না। শান্তচিত্ত কি করে হওয়া যায়? তত্ত্বজ্ঞ হলে শান্তিস্বভাব হবে। তাই যোগীন্দ্র বললেন—শব্দব্রহ্মণি (শাস্ত্রে) নিষ্ণাত (কুশল) অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ এবং পরব্রহ্মণি (ভগবানে) নিষ্ণাত অর্থাৎ ভগবদনুভূতিসম্পন্ন গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করবে। কারণ শাস্ত্রজ্ঞ না হলে শিষ্যের মনের সংশয় শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা নিরসন করতে পারবেন না আর ভগবদনুভূতি না থাকলে শিষ্যকে কৃপা করলেও সে কৃপা ফলবতী হবে না। তবে যিনি ভগবদনুভূতিসম্পন্ন তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞ হবেন এটি সুনিশ্চিত। কারণ ভগবদনুভূতি থাকলে তাঁর আচরণ বা কথাবার্ত্তা কখনোই শাস্ত্রবহির্ভূত হতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞ বা ভগবদনুভূতি যে তাঁর আছে সেটি বুঝবার উপায় কি? তার উত্তরে বলা যায় শাস্ত্রজ্ঞ কি না এটি কথা কইলেই বুঝা যাবে আর

ভগবদনুভূতি আছে কি না এটি বুঝা যাবে যদি দেখা যায় তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের বশীভূত নন।

যদুমহারাজ অবধূতজীকে প্রশ্ন করেছেন—একজন গুরুই তো করা উচিত। তবে আপনি বহু গুরু করলেন কেন? কারণ শ্বেতকেতু, ভৃগু প্রভৃতি কেউই তো বহু গুরু করেন নি। তার উত্তরে অবধূতজী বলছেন—মন্ত্রদাতা অর্থাৎ দীক্ষাদাতা গুরু আমার একজনই। কিন্তু এই চব্বিশজন গুরুই আমাকে কিছু না কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। তার মধ্যে কোনটি অনুকূলে কোনটি প্রতিকূলে। যাঁর কাছে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তাঁকেই গুরুপদে বরণ করা চলে। তাই এঁরা প্রত্যেকেই আমার গুরু। এই চব্বিশজন গুরুর মধ্যে কেউ কেউ হেয় অংশে গুরু কেউ বা উপাদেয় অংশে গুরু। বৈরাগ্যশিক্ষা যিনি দেন তিনিই গুরুপদবাচ্য। কারণ বৈরাগ্যই একমাত্র অভয় বস্তু আর জগতে যা কিছু আছে তার থেকেই ভয়ের সম্ভাবনা। হেয় এবং উপাদেয় অংশে কে কোন্ পক্ষে গুরু টীকাকার শ্রীদীপিকাদীপন বলেছেন। কপোত প্রভৃতি আটজন গুরুর কথা যে বলা হল সকলেই হেয় অংশে গুরু। কপোতের কাছে শিক্ষা সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। মীনের কাছে শিক্ষা আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। হরিণের কাছে শিক্ষা শব্দের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। কারণ শব্দাসক্তির্নাশহেতুঃ। কুমারীর কঙ্কণের মত সঙ্গ ত্যাজ্য। এটি জ্ঞানবাদীর পক্ষে সাধনপথে একাকী বিচরণ করতে হবে। গজ শিক্ষা দিয়েছে স্পর্শাসক্তি বিনাশের কারণ। তাই স্পর্শাসক্তি ত্যাগ করতে হবে। সর্পের কাছে শিক্ষা জনসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে এবং গৃহারম্ভ দুঃখের কারণ এটি পাকাপাকিভাবে বুঝতে হবে। পতঙ্গের কাছে শিক্ষা রূপাসক্তির্নাশহেতুঃ। তাই রূপাসক্তি ত্যাগ করতে হবে। কুরর পক্ষী যেমন মুখের মাংসখণ্ড ত্যাগ করার পর শান্তি পেয়েছিল তেমনি মানুষের পক্ষেও ধনসম্পদ ত্যাগ করতে পারলেই শান্তি। যতক্ষণ ধনাদিতে আমার আমার বোধ করে ত্যাগ করতে পারা না যায় ততক্ষণই অশান্তি। তাই ভগবান বললেন, 'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।'

এরপরে মধুকৃৎ প্রভৃতি তিনজন গুরু হেয় ও উপাদেয় দুই অংশেই। তাদের কাছে কিছু হেয় শিক্ষা কিছু উপাদেয় শিক্ষা। যেমন মধুকরের কাছে মাধুকরী বৃত্তিটি নিতে হবে—অর্থাৎ সারসংগ্রহ করতে হবে। তাই মধুকর এই হিসাবে উপাদেয় অংশে গুরু। আবার মধুকরেরই সজাতীয় মক্ষিকার কাছে সংগ্রহটি যে ত্যাজ্য—এটি শিক্ষা করতে হবে। কারণ শুধু সংগ্রহ করলে পরকেও দেওয়া যায় না আবার নিজের ভোগেও লাগে না মক্ষিকার মত। তার সঞ্চিত মধু সে নিজেও ভোগ করতে পারে না, অপরকেও দিতে পারে না, তাই মক্ষিকার কাছে সঞ্চয় না করাটি শিখতে হবে। সুতরাং মক্ষিকা হেয় অংশে গুরু। পরবর্তী গুরু পিঙ্গলার উদ্যম অর্থাৎ চেষ্টা ছাড়া যে দেহনির্ব্বাহক ভোগ এটি উপাদেয় অর্থাৎ এটি নিতে হবে আর পিঙ্গলার যে আশাময়ী পূর্ব্বাবস্থা এটিকে ত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ এটি হেয়। আশা অংশে হেয় এবং নৈরাশ্য অংশে উপাদেয়। তাই পিঙ্গলা মন্তব্য করেছেন—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

অবধূতজী যে পৃথিবীকে গুরুপদে বরণ করেছেন পৃথিবীর কাছে সহনশীলতা গুণ শিক্ষা সবটাই উপাদেয়। এর কোনটি হেয় নয়। পৃথিবী-গুরুর মধ্যে আবার দুটি ভাগ—পর্ব্বত এবং বৃক্ষ। এইভাবে শ্রীদীপিকা-দীপনকার হেয় এবং উপাদেয় ভাগ করেছেন।

অবধূতজীর বাক্য—দীক্ষাগুরু একজনই হবেন কিন্তু জ্ঞানকে দৃঢ় করবার জন্য শিক্ষাগুরু অনেক হতে পারেন। শিক্ষাগুরুও নিজ দীক্ষা-মন্ত্র অনুযায়ী হওয়া চাই।

শ্রীগোবিন্দ উদ্ধবজীর কাছে বলছেন—এইভাবে অবধূতের বাক্য শেষ হওয়ায় যদুমহারাজের দ্বারা সেবিত ও বন্দিত হয়ে তিনি যেমন স্বেচ্ছায় এসেছিলেন তেমনি স্বেচ্ছায় আবার চলে গেলেন। অবধূতের বাক্য শ্রবণ করে যদুমহারাজ (ভগবানের পূর্ব্বপুরুষ) সর্ব্বসঙ্গবিনির্মুক্ত হয়ে সমচিত্ত ও শান্ত হলেন। এ জগতের যত রমণীয় বস্তুই হোক সবই ত্রিগুণে রচিত। যেমন ফেরীওয়ালা হাঁকে—'যা নেবে তাই ছ'আনা' এও সেইরকম। সবই

গুণময়। অতএব কোনটি ভোগ্য নয়, সবই ত্যাজ্য। ত্যাজ্যবুদ্ধিতে জগতের যাবতীয় বস্তুকে ত্যাগ করে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মই গ্রাহ্যবুদ্ধিতে গ্রহণ করতে হবে। কারণ গৌরগোবিন্দপাদপদ্মই একমাত্র ভোগ্য ও চরম আস্বাদ্য। ৩০-৩৩

ইতি শ্রীএকাদশে নবম অধ্যায়ে টীকাসম্মত ব্যাখ্যা।

সংযোজন

'অবধূত-সংবাদে'র বিষয়বস্তু হল বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ। শিক্ষা যে শুধু মানুষই দিতে পারে তা নয়—প্রকৃতির মধ্যেও শিক্ষণীয় আছে। পশুপক্ষী কৃমি কীট স্থাবর জঙ্গম গুল্ম লতা সকলেই এই শিক্ষাদানের অধিকারী। জগতে শিক্ষা সব জায়গায় ছড়ান আছে—নিতে পারাটাই বুদ্ধিমত্তা। গ্রহণ করতে পারলেই লাভ। বিশ্বকবি বলেছেন—

কত শিক্ষা পৃথিবীর খসে পড়ে জীর্ণ চীর
জীবনের সনে।
সংসারের লজ্জাভয় নিমেষেতে দগ্ধ হয়
চিতা-হুতাশনে।

অবধূতজী এই শিক্ষার চিত্রটিই জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। এটি আদর্শ চিত্র এবং এ চিত্র প্রকাশে জগতের জীবের প্রতি তাঁর অযাচিত করুণাই প্রকাশ পেয়েছে। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে যদি একজনও এই শিক্ষাবলীর যে কোন একটি শিক্ষা নিজের জীবনে গ্রহণ করে কাজে লাগাতে পারে তাহলেও তার জীবন সার্থক। এঁরা সকলেই অবধূতজীর শিক্ষাদাতা গুরু। অবধূতজী (দত্তাত্রেয় ঋষি) পশু পক্ষী সাগর পর্ব্বত সর্প কীট বলে কাউকে অবজ্ঞা বা হেয় জ্ঞান করেন নি—তার গুণটুকু দেখে সেইটি গ্রহণ করে নিজ জীবনে কাজে লাগিয়েছেন। এর ফলে এই তাপদগ্ধ জগতে তাপশূন্য হয়ে পরমানন্দে বিচরণ করেছেন। মানুষের জীবনে এই অশান্তির মাঝে শান্তির উপায় নিরানন্দের মাঝে আনন্দ লাভের পথের নির্দ্দেশ দিয়েছেন—তাই তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করি।

চব্বিশ গুরুর কার কাছে কি শিক্ষা এক দৃষ্টিতে—

সপ্তম অধ্যায় ॥

১। পৃথিবী—ক্ষমা গুণ—এইটিই অচলব্রত।

পৃথিবীর অংশ পর্ব্বত ও বৃক্ষ শিক্ষা দিয়েছে পরোপকারের

চেষ্টা, পরার্থে নির্জন বাস, পরাধীনতা।

২। বায়ু—প্রাণবায়ু ও বাহ্যবায়ু
প্রাণবায়ু—ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় পরিত্যাগ।
বাহ্যবায়ু—অনাসক্তি।

৩। আকাশ—অসঙ্গ অব্যবচ্ছেদ্যত্ব ভাবনা।

৪। জল—স্বচ্ছতা, স্বভাবত স্নিগ্ধ ও মধুর।

৫। অগ্নি—তেজস্বী, তপস্যায় প্রদীপ্ত, অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ।

৬। চন্দ্র—ষড়্‌ভাববিকার দেহেরই, আত্মার নয়।

৭। সূর্য্য —ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে প্রার্থীকে দান।

৮। কপোত—কোথাও কারও সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতিতে আসক্তি করবে না।

অষ্টম অধ্যায় ॥

১। অজগর—যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ।

২। সমুদ্র—বাইরে প্রসন্ন ও অন্তরে গম্ভীর, অনতিক্রমণীয়, অপরিচ্ছেদ্য ও অক্ষোভ্য।

৩। পতঙ্গ—রূপাসক্তি বিনাশের কারণ।

৪। মধুকর—মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন ও সার সংগ্রহ।

৫। গজ—স্পর্শাসক্তি হলে বিনাশ পাবে।

৬। মধুহা (মধুমক্ষিকা)—পরদিবসের জন্য সঞ্চয় করবে না।

৭। হরিণ—শব্দাসক্তি বিনাশের হেতু।

৮। মীন—রসে আসক্তি হলে অবশ্য বিনাশ।

৯। পিঙ্গলা—আশা করলেই দুঃখ, নৈরাশ্যে পরম সুখ।

নবম অধ্যায়।

১। কুরর পক্ষী—ত্যাগেই শান্তি।

২। বালক—নিরভিমান—মান অপমান সমজ্ঞান।

৩। কুমারী—সাধনপথে একাকী বিচরণ (জ্ঞানবাদীর পক্ষে)।

৪। শরকার—মনঃসংযম—একাগ্রচিত্ত।

৫। সর্প—অল্পভাষী, প্রমাদশূন্য একান্তবাসী।

৬। ঊর্ণনাভি—ভগবানই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা।

৭। পেশস্কৃৎ কীট—স্নেহে, দ্বেষে বা ভয়ে তৎস্বরূপতা প্রাপ্তি।

এ ছাড়া অবধূতজী দেহগুরুর কাছে বিবেক ও বৈরাগ্য শিক্ষা করেছেন—ইনি চব্বিশ জন গুরু হতে ভিন্ন।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

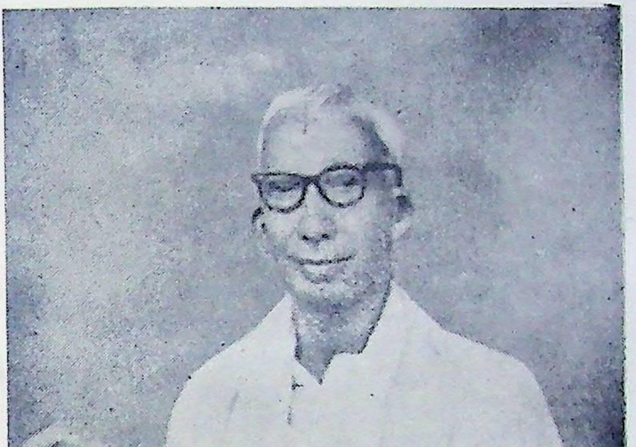

পিতা ৺রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের কথা

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের সাধন ভজন জীবনে যাই করা যাক্ তার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হল নিজের দেহটি। মহাজন বলেছেন—'নরতনু ভজনের মূল।' এই মানুষদেহের দোষও আছে অনেক আবার গুণও আছে। দেহ অনিত্য ও মরণধর্মশীল, এটি তার দোষ—মানুষদেহ চিরদিন থাকবে না আর মৃত্যু এর পেছনে লেগে আছে। কিন্তু তবু এর গুণ আছে কারণ এই দেহ ইন্দ্রিয় দিয়েই তো ভজন করা যায়। মানুষদেহই ভজন করতে পারে অন্য কোন দেহে ভগবদ্ভজন হয় না। এই মনুষ্যদেহ ভগবান কৃপা করে জীবকে এই ভজনযোগ্য দেহ দিয়েছেন। আমি ভজন করতে পারি না বটে কিন্তু ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তো ভজন করেন। সুতরাং এই মানুষদেহের দাম আছে।

জাগতিক দৃষ্টিতে কিন্তু আমরা দেখি পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে সন্তানের জন্ম হয়। কাজেই পিতা জন্মদাতা এবং মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে নিজের রক্তরসে পুষ্টিদান করেন এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর পালনের ভারও তাঁর। তাই পিতা এবং মাতাই সন্তানের প্রথম গুরু। গুরু যিনি তাঁর প্রতি আসক্তি বা প্রীতিকে মায়ার আসক্তি বলা চলে না।

এতক্ষণ ভূমিকা করলেও কথাটা খুলে না বললে বুঝা যাবে না। আমি আমার জন্মদাতা পিতার কথা বলছি। বাবাই আমার মা বাবা দুইই। কারণ এত শিশুকালে মাকে হারিয়েছি যে তাঁর কথা কিছুই মনে নেই—স্মৃতিপথে আনতে পারি না। তাই বাবাই একাধারে বাবা ও মা। বাবাও আজ প্রায় চার বছর হতে চলল আমাকে ছেড়ে নিত্যধামে চলে গেছেন।

ছোট্ট মাতৃহারা শিশুকে বাবা পরম যত্ন ও আদরে বুকে তুলে নিয়ে ছিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সে কর্ত্তব্যপালনে তাঁর এতটুকু ত্রুটি ঘটে নি কোনদিন। বলা বাহুল্য আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান যাকে বলে 'সবে ধন নীলমণি।' চোখের আড়াল করতে পারতেন না

আমাকে। তবে সরকারী চাকরির জন্য বিদেশে তাঁকে যেতে হত। তখন নিশ্চিন্ত হতেন আমার ভার আমার ঠাকুমা, ঠাকুরদাদা, পিসিমা, জ্যেঠামশাই, জ্যেঠিমার ওপর দিয়ে। তাঁদেরও আমার প্রতি স্নেহের তুলনা ছিল না।

বাবা যখনই ছুটিতে বাড়ী আসতেন পিতাপুত্রীর সেই মধুমিলনের আনন্দ স্মরণ করে এখনও পুলক জাগে আর মনে মনে ভাবি সেই ফেলে আসা দিনগুলি আবার যদি ফিরে আসত। ছুটিতে এসে বাবা আমার পড়াশুনার খবর বড় একটা নিতেন না। শুধু আদর, বেড়ান আর খাওয়ান। শুধু আমি বলে নয় বাড়ীর সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা নিজের ছেলেমেয়েদের মতই ব্যবহার করতেন। তাই বাবা বাড়ীতে এলে সকলেরই আনন্দের সীমা থাকত না। আদরে আদরে আমাকে ভরিয়ে দিতেন। পাড়ার লোকেরা আমাকে বলত 'আদরের ডেলা।' অনেক বড় পর্য্যন্ত বাবা আমাকে কোলে নিয়ে বেড়িয়েছেন। তাই লোকে বলত 'কোলে চড়া মেয়ে।' কত আদরমাখা নামে যে ডাকতেন এখন ভাবতেও মন প্রাণ ভরে ওঠে। বাবার অন্তর হতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সেই ডাক—মামণি। দুধুমা !! মধুবচন !!! এখন অন্তর গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে আর সেই নামে ডাকার কেউ নেই। কিন্তু এ ধারণা আমার হয়ত সত্য নয়। কারণ তিনি নিত্যধাম থেকে আজও সেইভাবে আমাকে ডাকেন। কারণ বাপের মেয়ের সম্বন্ধ তো মিথ্যা নয়। বাবাকে আমি বলতাম—"বাবা, তুমি আমার একার বাবা।" বাবাও বলতেন, "হ্যাঁ মা, তুমিও আমার একার মা।" এই মায়ের ছেলের কথায় দিনের পর দিন রাতের পর রাত বছরের পর বছর কেটেছে কিন্তু পুরানো হয় নি। বাবা বেশীর ভাগ সময়ই আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। আমি কিন্তু কখনও বাবাকে 'আপনি' বলিনি—বরাবর 'তুমি'ই বলেছি। যদি কখনও বাবা আমাকে 'তুমি' বলতেন তখন আমার অভিমান হত, ভাবতাম বাবা বুঝি আমার ওপর রেগে গেছেন—কিন্তু না, তিনি কখনও আমার ওপর রাগ করেন নি—কখনও বকেন নি—বরং অভিমানভরে আমিই কত সময়

তাঁকে ছেলের মত করে বকেছি।

বাবা আমার বড় আনন্দপ্রিয় ছিলেন। সকলকে নিয়ে আনন্দ করাই ছিল তাঁর স্বভাব। কারও মুখভার তিনি দেখতে পারতেন না। চাকুরি-জীবনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে গুরু দায়িত্ব বহন করেও কাজের অবসরে আমাদের নিয়ে দেশভ্রমণে যেতেন—সুদূর দার্জিলিং, শিলং, গৌহাটী, পাটনা এসব খুব অল্প বয়সেই বেড়িয়েছি।

যখন বড় হলাম—ছাত্রীজীবন শেষ করে কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করলাম তখন বাবা চাকুরি হতে অবসর নিয়েছেন। তখন প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে শ্রীধাম পুরী ও পূজার ছুটিতে নিয়মিত শ্রীধাম বৃন্দাবন যাওয়া হত। কখনও কখনও হরিদ্বার, জয়পুর, দিল্লীও যেতাম। তীর্থভ্রমণে বাবার খুবই অনুরাগ ছিল—তীর্থভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ জীবনে অনেক করেছিলেন—আমি তখন খুবই ছোট—সঙ্গে যাবার সৌভাগ্য হয় নি। বাবার সঙ্গে যখনই তীর্থে গিয়েছি দেখেছি প্রকৃতির দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। হিমালয়েব গাম্ভীর্য্যে, সুনীল সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। করজোড়ে স্তুতি করতেন। হিমালয়ের তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ দেখে মনের আনন্দে আবৃত্তি করতেন—

নীল আকাশে বুলিয়ে তুলি
তুষার সাদা শিখরগুলি
কে আঁকিল মেঘ সাগরের পারে—
বালক ভানুর আলোর কণা
রঙ্ ফলানির কি আল্পনা
দিগ্ বধূরে সাজায় মোতির হারে॥

এক কথায় বাবা ছিলেন প্রকৃতির দুলাল।

বাবার চারিত্রিক গুণ ছিল অনেক। মনে প্রাণে স্বদেশী ছিলেন। উচ্চপদে থেকেও কখনও বিদেশী পোষাক ব্যবহার করেন নি। খাঁটি ইংরাজদের সঙ্গে কাজ করেছেন সবসময় ধুতি পাঞ্জাবী পরে। আজীবন নিরামিষভোজী ছিলেন। তখন ব্রিটিশ শাসন দেশে, বাবা খদ্দরের টুপী

মাথায় দিয়ে সরকারী কাজ করতেন। অত্যন্ত উদারপ্রাণ, আত্মবিশ্বাসী, সরল, সত্যবাদী, কর্ত্তব্যে একনিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ, সাদাসিধে এই মানুষটির সঙ্গে যিনি একবার আলাপ করেছেন তিনিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। কথা বলবার ভঙ্গি ছিল তাঁর অপূর্ব্ব, ইংরাজী বাংলা দুই ভাষার ওপরেই ছিল অসাধারণ দখল—অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পরিণত বয়সেও এই স্বভাব তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিল, কখনও ক্লান্ত হতে তাঁকে দেখি নি। দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না—বসবার সময় সোজা হয়ে বসে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতেন—পরম-যোগীর মত দীপ্তিভরা মুখমণ্ডল—খাঁটি ব্রহ্মচর্য্যের প্রকাশ। সকল বিষয়ে তাঁর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য যা সকলকে অভিভূত করত। অনেকে তাঁর কাছে কথা শুনতে আসতেন। পাঁচ মিনিটের জন্য যদি কেউ তাঁর কাছে আসব বলে মনে করতেন আসার পর কিন্তু দু'ঘণ্টার আগে উঠতে পারতেন না। কথায় তাঁর যেন যাদু ছিল। শিশুর সঙ্গে শিশুর মত ব্যবহার, বৃদ্ধের সঙ্গে বৃদ্ধের মত—আশ্চর্য্য এই মানুষটি। যে দেখেছে তাঁর প্রশংসা না করে পারে নি। তবে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী—সংশোধনের দৃষ্টিতেই দোষের কথা উল্লেখ করতেন কিন্তু তা তার আড়ালে নয়, সামনাসামনি। বাবার ভিতরে একরকম বাইরে একরকম ছিল না—মনে কথায় ও কাজে এক।

জীবনে কখনও কোন নেশার জিনিস স্পর্শ করেন নি—এমন কি চা, পান পর্য্যন্ত নয়। ফাউণ্টেন পেন, ঘড়ি, আংটি কখনও ব্যবহার করেন নি—দোয়াতকলমে লিখতেন—হাতের লেখা ছিল মুক্তার মত। আমাকে যখন চিঠি লিখতেন কুড়ি পাতা পঁচিশ পাতা তাতে কত শিক্ষাপূর্ণ উপদেশ—সে এক অমূল্য সম্পদ কিন্তু অল্প বয়সে তার মূল্য বুঝি নি। আমার মা যখন মারা যান তখন বাবার বয়স তিরিশেরও নীচে আর বাবা যখন দেহত্যাগ করেন তখন বয়স হয়েছিল আশী। এই দীর্ঘদিন একনিষ্ঠভাবে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছিলেন। নিজের পিতামাতার ওপর তাঁর ভক্তি এবং কর্ত্তব্যবোধ ছিল অপরিসীম এবং পিতামাতার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদে তিনি জীবনযুদ্ধে সর্ব্বদা জয়ী হয়েছেন।

বাবার পুণ্যকথা আমার কাছে অফুরন্ত। এ বলে শেষ হবে না। তবে সামান্য একটু প্রকাশের লোভ সামলাতে পারলাম না কেন তার কারণ বলি। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন ভাগবতীয় সংবাদে আবার এ সংসারের কথা কেন ? এ যেন অপ্রাসঙ্গিক—যেন মানায় না। কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। কারণ মানুষের জীবনে পিতামাতাই প্রথম গুরু। শাস্ত্রের উপদেশ, দীক্ষাদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ তো আমরা পরে পাই, কিন্তু মানুষের প্রথম জীবন গড়ে ওড়ে পিতামাতার শিক্ষায়।

অবধূতজী যেমন যার কাছে যা শিক্ষা করেছেন তাকেই গুরু বলে মেনেছেন—এঁরা সবাই কিন্তু তাঁর শিক্ষাদাতা গুরু। দীক্ষাদাতা গুরু তাঁর একজনই। তেমনি আমার জীবনে স্নেহময় পিতার উপদেশ অনেক ভাবে অনেক রকমে পেয়েছি এবং তাতেই আমার জীবন গড়ে উঠেছে। অবশ্য সব উপদেশ যে তাঁর গ্রহণ করতে পেরেছি তা নয় তবে চেষ্টা করেছি। এমন কি তাড়াতাড়ি হাঁটতে গেলে যদি কখনও পায়ের শব্দ হত বাবা বলতেন—মেয়েদের হাঁটতে গেলে পায়ের শব্দ হওয়া ভাল নয়।

বাবা বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। নিজে গান গাইতেন না কিন্তু গানের সমঝদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। পরিণত বয়সেও গ্রন্থ না দেখে মুখস্থ আবৃত্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা তাঁর বড় প্রিয় ছিল—একটি ‘এবার ফিরাও মোরে’ আর অন্যটি ‘মৃত্যুর পরে’।

এ প্রসঙ্গে কথা শেষ করতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু তখনই বাবার আমাকে শেষ উপদেশবাণীর কথা মনে পড়ে গেল। চলে যাবার আগের দিন অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বর ১৯৭৮—বেলা যখন প্রায় বারোটা, আমি কাছেই বসে ছিলাম—বললেন, ‘মা, এই কথা কটা মনে রেখো’—বলে তিনটি উক্তি বললেন। কি জানি কেন, আমি শুধু না শুনে তখনই কাগজ কলম এনে লিখে রাখলাম। বোধহয় জীবনে তাঁর উপদেশামৃত আর পাব না তাই। উক্তি তিনটি এখানে উল্লেখ করলাম—

(1) There is nothing either good or bad in this world., but our thinking makes it so.

(2) Beware of entrance to a quarrel but being in bear it that the opposer may beware of thee.

(3) The longer I think on the subject the farther I seem from making it out.

এই তিনটি বলবার পরে আমি যখন বললাম—'বাবা, আরও বল।' তখন উত্তরে বললেন—'মা, আর তো মনে আসছে না।' আমার মনে হয় তখন বোধহয় কিছু অসুস্থতা বোধ করছিলেন।

একথা তো ফুরোবে না—মেয়ের মুখে বাপের কথা প্রশংসার মত শোনাচ্ছে—এ তো মানায় না। কিন্তু না, এ প্রশংসা নয়—বাড়িয়ে বললে প্রশংসা করা হয়—আমি যা বলেছি এতটুকু বাড়িয়ে তো নয়ই বরং যা তাঁর আসল রূপ সবটা প্রকাশ করতে পারি নি। কারণ যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভালভাবে মিশেছেন তাঁরা আমার কথার যাথার্থ বুঝতে পারবেন। আমি এখানে শুধু একজন আদর্শ পিতার ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে আর আজ জীবনের প্রায় প্রৌঢ়দশায় এসে পেঁাছেছি—সারাজীবনের ছবিটা চোখের সামনে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভেসে ওঠে। আমি বাবার আর বাবা আমার এর বেশী কিছু বলতে পারি না—কিছু ভাবতে পারি না। বাবা আমাকে 'মাধব' বলে ডাকতেন কিন্তু বয়স যতই এগিয়ে যাচ্ছিল তখন 'মাধব' না বলে শুধু 'মা' নামেই ডাকতেন। তাই বোধহয় 'মা' ডাকেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অতি অনায়াসে সামান্য কয়েকটি দিন মাত্র রোগভোগের পর মায়ের কোলে (আমার কোলে) মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সজ্ঞানে কথা বলতে বলতে। ডাক্তারবাবুর নির্দ্দেশমত তখন বাবাকে চামচ করে দুধ খাওয়াচ্ছিলাম। মা যেমন ছেলেকে দুধ খাওয়ায়। দিনটি ছিল ৬ পৌষ ১৩৮৫, ইংরাজী ২২ ডিসেম্বর ১৯৭৮ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা। স্থান শ্রীধাম

নবদ্বীপ। শ্রীধামে সমাজবাড়ীতে তখন সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে উঠেছে—খোল করতালে শ্রীনামকীর্ত্তনের রোল উঠেছে, এমন সময় গৌরগঙ্গাধাম এক করে মায়ের কোলে মাথা রেখে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করে সদানন্দময় মহাপুরুষ মহাযোগীর মত স্বচ্ছন্দে মৃত্যুকে জয় করে নিত্যধামে আনন্দলোকে মহাপ্রয়াণ করলেন।

আজ বাবাকে হারিয়ে আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। কারণ ইহলোকে বাবাই ছিলেন আমার একমাত্র বন্ধু, সঙ্গী, বাপ্, মা, ভাই, বোন সব। তাঁকে ছাড়া নিজেকে কখনও ভাবতে পারতাম না। প্রাণের যত কথা সবই বাবার সঙ্গে। আজ আমি একা—বড় একা। বাবার পুণ্যস্মৃতিমন্দিরে আমি একা পূজারিণী। আশেপাশে অনেকেই অবশ্য আছে বিশেষ করে একটি ছোট মেয়ে যার কথা এখানে একটু উল্লেখ না করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে, সে হল 'তুলসী'—শ্রীধামেই তাদের বাড়ী। তার বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই আছে। কিন্তু বয়স যখন তার সাত আট বছর তখন তার মা আমাদের (আমার ও বাবার) সেবার জন্য আমাদের কাছে দেয়। সে আজ প্রায় দশ এগার বছর আগেকার কথা। বাবা যতদিন প্রকট ছিলেন বাবার সেবা করেছে—নিজের দাদু মনে করে। এখনও সেবা করছে—তার অনেক গুণের মধ্যে একটা বড় গুণ যা আমি কখনও ভুলতে পারব না সে হল বাবা চলে যাবার পর যখন নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিল সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও সে আমাকে ছেড়ে কোথাও যায় নি। দিনরাত আমার কাছে কাছে থাকে। বাবা তাকে খুবই স্নেহ করতেন। 'তুলসী' আছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে তো দরকারী কথা ছাড়া অন্য কথা বলতে পারি না —তাই মনে হয় কেউ নেই। অন্তর যেন শূন্য।

এখানে বাড়ীতে আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজের সেবার পাশে চিত্রপটে বাবার সেবাও আছেন। ঠাকুরদের যেমন সাজাই বাবাকেও তেমনি সাজাই। ধূপ, দীপ, পূজার নৈবেদ্য, প্রসাদ দিই, তাঁকে খাওয়াই, মালা পরাই, চন্দনের অনুলেপন দিই—রাত্রে বাতাস দিয়ে মশারী ফেলে

খাটে শুইয়ে দিই। সবই করি কিন্তু সাক্ষাতে না পেলে যেন মন ভরে না।

কতদিনে আমার সেদিন হবে তাঁর কোলে ফিরে যেতে পারব। একথা তো আমার একান্ত নিজস্ব অন্তরের। কারুর কাছে মুখ ফুটে বলার নয়। কারণ এ ব্যথা তো কেউ বুঝবে না। তাই কবিগুরুর কথায় মনে হয়--

> "স্মৃতি-ভারে আমি পড়ে আছি
> ভারমুক্ত সে এখানে নাই"—

'মামণি'

সংক্ষিপ্ত জীবনী

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার জিরাট বলাগড় পিতৃভূমি। পিতা ৺দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ৺নীরদবরণী দেবী। বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নিকষ কুলীন এই বংশের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বলাগড়ে দ্বাদশ শিবমন্দির। তার ভগ্নাবশেষ আজও সে ঐতিহ্যের সাক্ষী দিচ্ছে। পিতামহী ৺যোগমায়া ঠাকুরাণীর নাম ও খ্যাতি আজও বলাগড় গ্রামে সুপরিচিত—গ্রামবাসীর কাছে আজও শোনা যায় তাঁর নাম। তখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন এই যোগমায়া ঠাকুরাণী—জুতো পায়ে দিতেন, ছাতা মাথায় দিতেন। এঁদের বাড়ী বলাগড়ে 'বাবুর বাড়ী' নামে খ্যাত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরই বংশের—একই পরিবার এঁরা। পিতা ৺দেবেন্দ্রনাথ মহাতেজস্বী, ব্রহ্মণ্যতেজমূর্ত্তিমান, নিষ্ঠাবান্, ধর্মপ্রাণ, মাতাও বহু সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন।

মাতুলালয় শ্রীধাম শান্তিপুর—মাতামহ দেওয়ান বাহাদুর ৺নসীরাম মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখনকার বাংলাদেশের সাতটি নীলকুঠীর দেওয়ান—প্রবল প্রতাপ তাঁর—নীলকুঠীর সাহেবদের বিশেষ প্রিয়পাত্র—বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে বহু ছাগবলি—এমনকি মোষবলি পর্য্যন্ত হত। মাতুলালয়েই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সেটি বাংলার ১৩০৪ কিংবা ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাস। পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। বড়দাদা ৺বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে নামের সার্থকতা লাভ করেছিলেন—অমন বিনয়ী মানুষ প্রায় দেখা যায় না। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কয়েকটি নাবালক সন্তানকে ছোটভাই রবীন্দ্রনাথের ওপর ভার দিয়ে চিরদিনের মত বিদায় নিলেন। রবীন্দ্রনাথ আজীবন সে কর্ত্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। মা বাবাকে হারানোর ব্যথা বা অভাব কখনও তাদের জানতে দেন নি। মেজদাদা বাংলার তথা ভারতের সাহিত্য ও কাব্য-জগতে বিশেষ পরিচিত। সুসাহিত্যিক ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—একসময় 'বঙ্গবাসী', ও 'হিতবাদীর' সম্পাদনা করেছেন। 'কহ্লার',

'ক্ষীরের নাড়ু' কাব্যগ্রন্থ ও বহু স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এককথায় সুসাহিত্যিক ও সুশিক্ষক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় কলকাতায়—পরে উচ্চশিক্ষাও লাভ করেন সেখানে। মাঝে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর চরণপ্রান্তে থেকে শিক্ষালাভেরও সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। তিনিও মেজদাদার মত সাহিত্য রচনায় বিশেষ পটু ছিলেন—তবে কবিতার চেয়ে গদ্যসাহিত্যেই অনুরাগ ছিল বেশী। লেখায় হাত ছিল মিষ্টি—ছোট গল্প, উপন্যাস, সুচিন্তিত প্রবন্ধ তাঁর ছাপা হত ভারতী, ভারতবর্ষ, বসুমতী বিভিন্ন পত্রিকায়। এ বিষয়ে উৎসাহিত করতের তাঁর মাসতুতো দাদারা প্রফেসর ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গবাসী কলেজ), কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংসার বিষয়ে উদাসীন। সংসারে প্রবেশ করবেন না—সাধু হবেন এই ছিল তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। কিন্তু পিতা মাতার আদেশ উপেক্ষা করতে না পেরে নিজেদেরই এক আত্মীয়ার কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিবাহিত জীবন মাত্র আট বছরের। তার মধ্যে একটি মাত্র কন্যাসন্তান হয়। নিজে অল্প বয়সে সংসারমুক্ত হলেও সংসারের গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন সারাজীবন। পিতামাতা যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁদের প্রতি একান্ত কর্ত্তব্যপালন করেছেন—দাদাদের ও বিধবা বোনের ছেলেমেয়েদের ভার বহন করেছেন। নিজের কন্যার মতই সমান আদরযত্নে তাদের মানুষ করে তুলেছেন। এখন তারা সকলেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

চাকুরি জীবনে সরকারী বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে বিশেষ সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। এক একটি জেলার ভার নিয়ে বাংলা আসামের বহু জায়গায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই গুরু দায়িত্ব বহনের জন্য সাহিত্য রচনা তাঁর জীবনে বেশীদূর আর অগ্রসর হতে পারে নি। চাকুরি করলেও চাকুরির মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। তাই অবসরে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সাহিত্যচর্চ্চা, কবিতা আবৃত্তিতে নির্মল আনন্দ নিজে উপভোগ

করতেন এবং করাতেন। সদানন্দময় মধুরভাষী এই মানুষটিকে সকলেই ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত।

চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে দীর্ঘ কুড়ি বছর কলকাতায় স্থিতি। প্রথম জীবনে যে সাধুসঙ্গ (বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী, ভোলানন্দ গিরিজী, রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সন্ন্যাসী, শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি) করেছিলেন, তাঁদেরই কৃপা প্রভাবে, উত্তরজীবনে তীর্থভ্রমণ, ধর্ম অনুশীলন করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিল বিভিন্নবিষয়ক গ্রন্থরাজি। এক কথায় তাঁকে 'গ্রন্থকীট' বললেও অত্যুক্তি হয় না। পড়াশুনার সময় তিনি খাওয়া নাওয়া ভুলে যেতেন। অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ছিল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত চোখের জ্যোতি প্রদীপ্ত ছিল, কণ্ঠস্বরে এতটুকু জড়তা ছিল না। স্পষ্টভাবে কথার উচ্চারণ অথচ তাতে মাধুরীর অভাব ছিল না।

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে কলকাতা ছেড়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন তীর্থে নির্জ্জনে বাস করবার জন্য। শহর থেকে দূরে কোলাহল এড়িয়ে তাঁর শান্ত মন বোধ হয় এইরকমই একটি পরিবেশ চাইছিল। একটি কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে পিতা ৺দেবেন্দ্রনাথ কাজের জন্য বলাগড়ের বাস উঠিয়ে পরে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান শহর বহরমপুরে বাড়ী করে সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উদাসী মন বহরমপুরের বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে সাধারণ সংসারী মানুষের মত থাকতে চায় নি—তাই শ্রীধাম নবদ্বীপে গুরুধামে নিজেরই একটু আশ্রয় তৈরী করে সাধু জীবন শান্তিময় জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। আট বছর নয় মাস এই শান্তিনীড়ে বাস করে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করলেন। মহাযোগীর মত স্বচ্ছন্দে মরণকে আলিঙ্গন করলেন যেন মনে হল বিশ্বকবির সেই শাশ্বত বাণী—

"মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

তাঁর শ্রীমুখে বহুবার শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে—দৃপ্তকণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন—